প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ১৯৬০

প্রকাশক
উপমা সেনগুপ্ত
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর
প্রতাপরঞ্জন রায়
১৭, রামধন মিত্র লেন
রামকৃষ্ণ প্রেস
কলিকাতা-৪

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সম্প্রতি নানা মানুষ নানা ভাবে লিখছেন। তাঁর কাব্য, সাহিত্য, কর্মজীবন, সমস্তকিছু নিয়ে বিরাট বিস্তৃত আলোচনা চলেইছে। তিনি যেন এক অফুরান উৎস যেখান থেকে বহু মানুষ, এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাবিত মানুষ, চিন্তার ও মননের খোরাক পেতে পারে। এমন কি তিনি তাঁর লেখায় কি কি ফুলের নাম করেছেন তা নিয়েও গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

আমিও তো আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তাঁর সম্বন্ধে লিখে আসছি, এখন তাই আর কলম ধরতে ভরসা পাই না। বিশেষ করে বহু জ্ঞানীগুণী যে ভাবে তাঁর লেখার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন, অনেক সমাজ-তত্ত্ব, দর্শনতত্ত্ব ইত্যাদি লেখা হয়েছে, আমার পক্ষে কোনদিনই তা সম্ভব হয়নি। 'শাজাহান' কবিতায় তিনি যে কথা লিখেছেন—'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ' রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কলম ধরতে গেলে এই কথাটিই আমার মনে পড়ে। তাঁর বিশাল রচনাসম্ভার, অপার কাব্যমাধুর্য, সমস্ত ছাপিয়ে তাঁর জীবনখানি আমার মনের সামনে এসে দাঁড়ায়।

আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখন আমার বয়স মাত্র নয় বছর। বলাই বাহুল্য, তখনও আমি রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করে বিশেষজ্ঞ হইনি। যদিও আমাদের বাড়িতে সর্বদা রবীন্দ্রকাব্য পড়া ও আলোচনা হত এবং চার বছর বয়স থেকেই আমার মা আমাকে 'কথা ও কাহিনীর' কবিতা-গুলি মুখস্থ করাতেন। তার প্রভাব আমার বালিকা মনে কীরকম হয়েছিল তা জানি না।

শুধু মনে পড়ে এক-একটা কবিতার এক-একটা জায়গা কীরকম মনকে ব্যাকুল করে দিত। 'কথা ও কাহিনীর' 'পণ রক্ষা' কবিতায় সেই যেখানটায় আছে—

'বেলা যায় যায়, ধূ ধূ করে মাঠ, দূরে দূরে চরে ধেনু, অতি দূর হতে সকরুণ রবে বাজে রাখালের বেণু'—

—এই খানটা যখন মা পড়তেন তখন এইটুকু বর্ণনার মধ্যে ঐ কাহিনীর আসন্ন বিষণ্ণতার আভাস পেয়ে মন উদাস হয়ে যেত, চোখে জল আসত। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম—সেই অল্প বয়সে কয়েকটা কথার মধ্যে দিয়ে কী করে মনের মধ্যে এরকম আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে। পরে, যখন রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখলাম, তখনও যেন এই কাব্যের অনুভূতি আমার মনের মধ্যে ফিরে এল। একজন মানুষের উপস্থিতি যে এরকম কাব্যের মত সুন্দর হতে পারে এবং দর্শকের মনকে কোনো এক অদৃশ্য বীণার মত বাজিয়ে তুলতে পারে তা আজও ভাবলে আশ্চর্য হই।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দিকের দীর্ঘ পনের বছর অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবে তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং তখন শেষের দিকে প্রায়-সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য পড়া আমার হয়ে গিয়েছিল। এবং রবীন্দ্র-কাব্যের একটা বড়ো অংশ মুখস্থও হয়ে গিয়েছিল। সেজন্যই তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম রবীন্দ্রনাথ মানুষটি তাঁর রচনার চেয়ে পৃথক নন। তিনি যা লেখেন, যা বলেন, যা প্রচার করেন—তাঁর জীবন ও কর্ম তার থেকে পৃথক নয়।

অল্প বয়সে আমার বেশ কিছু জ্ঞানী গুণী মানুষকে দেখার সুযোগ হয়, সে জন্য আমার মনে হয়েছে যে অনেকেই যা বলেন ঠিক তা করেন না। এক-একজন মনীষীর ব্যবহার দেখে আশ্চর্য হয়েছি। আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা ইত্যাদির সঙ্গে সকলেরই যে একটি দরদী পরমতসহিষ্ণু উদার মন থাকবেই এমন কোন কথা নেই।

রবীন্দ্রনাথ বিত্তবান পরিবারে মানুষ হলেও সাম্য ভাবনা তার স্বভা-বের অন্তর্গত ছিল। অনেকে মনে করেন সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে জমিদারের ছেলে পরোপোজীবী হবার গ্লানিটা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু আসলে তা নয়। তাঁর মনের মধ্যে অসম ব্যবস্থার ক্রুটিটা বরাবরই অন্যায় মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান ঘটনা তাঁর শিলাইদহ ও পতিসরের জমিদারিতে বাস। ওই সময় বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষদের জীবনের হতাশা, দুর্দশা তাঁকে ভাবিয়েছিল। সে সময়ের লেখা

তাঁর জামাইয়ের কাছে একটি পত্রে পরিষ্কার করে লিখেছিলেন—'যে চাষীদের অন্নে তোমরা বিলাতে লেখাপড়া শিখতে গিয়েছো ফিরে এসে সেই চাষীদের অন্নের গ্রাস যদি বাড়াতে না পারো তবে সেটা অপরাধ হবে।' বস্তুত ছেলে এবং জামাই তুজনকেই আধুনিক চাষবাস ইত্যাদি শিক্ষা করতে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন।

সমস্ত 'ছিন্ন পত্রাবলী' জুড়ে এই নিরন্ন চাষীদের বেদনার সঙ্গে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি মিশে গেছে। অন্যান্য অনেক লেখকের মত সে বিষয় শুধু লিখেই ক্ষান্ত হননি প্রতিকারের তুর্দমনীয় ইচ্ছা তাঁকে নানা অসম্ভব কাজে প্রবৃত্ত করেছে। হয়ত সব সফল হয়নি কিন্তু সেই চেষ্টার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা। যেমন তিনি লিখেছেন—'ধন্য করো দাসে সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।'

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা মনে ছিল অনেকদিন ধরেই। শুধু শিক্ষা ব্যবস্থা নয়, তারই সঙ্গে বিলাসিতা বর্জনের ও সরল জীবনের প্রতিষ্ঠা। তাঁর আহার ছিল পরিমিত এবং বিরাট বড়ো বাড়ি তিনি পছন্দ করতেন না বরং অল্প পরিসর স্থানেই তাঁর থাকতে আরাম লাগত। তু-একজন লেখকের স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের আহারের যে বিরাট বর্ণনা পড়েছি তাতে আমি অবাক হয়েছি। এসব তাঁরা পান কোথায়? বন-ফুলের বইতে লেখা হয়েছে যে সকালবেলায় অর্থাৎ প্রাতরাশে ছোলা, মুগ ইত্যাদির সঙ্গে একবাটি ক্রীম, সিঙ্গাড়া, কচুরি ইত্যাদি ভোজন করতেন। এতো অসম্ভব কথা! তাছাড়া সিঙ্গাড়া, কচুরি সকালবেলার খাদ্যই নয়। অনেকেই দেখি তাঁরা কী দেখেছেন তা বেমালুম ভুলে গিয়ে ইচ্ছা মত নানা কথা লেখেন সেই জন্যই মনে হয় যদিও আমি ব্যক্তি মানুষ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছি তবুও হয়ত এখনও আরও কিছু লেখা দর-কার কারণ আমার কলম অচিরেই থেমে যাবে তখন সে অতুলনীয় ব্যক্তি সত্তার পরিচয় লেখবার মানুষ কমই বেঁচে থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে শুধু চোখে দেখা নয়, দেখার সঙ্গে কিছু বোঝা মিলিয়ে নিতে হবে। তিনি কেন কোন কাজ করছেন সেটা বুঝতে হলে তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে একটা সহানু-

ভূতি পূর্ণ দৃষ্টি থাকা চাই।

আমার মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র দশ বারো বছর পরে একটি আফ্রিকান পরিবার শান্তিনিকেতন বেড়িয়ে আমাদের পাহাড়ের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের কী শেষ বয়সে একটু মাথার গোলমাল হয়েছিল ?

আশ্চর্য হয়ে বললাম—কেন, এ ধারণা আপনার কেন জন্মাল ? তাঁর লেখা শেষ কবিতাটিও তার কবিতাবলীর মধ্যে একটি উজ্জ্বল রত্ন। চিত্তের অস্থিরতা থাকলে তা কি লেখা সম্ভব ?

তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—তা নয়, আমি তো তাঁর সব কবিতা ভালো মতো পড়িনি, শেষ কবিতাটি তো নয়ই। তবে আমাকে যিনি শান্তিনিকেতন দেখাচ্ছিলেন, তিনি একটার পর একটা বাড়ি দেখিয়ে বলছিলেন রবীন্দ্রনাথ কোন এক জায়গায় স্থির থাকতে পারতেন না। এই একটা বাড়ি হল, পছন্দ হল না। করো আর একটা বাড়ি। আবার দুদিন পরেই সে বাড়ির কোন ত্রুটি দেখতে পেলেন তার পরেই করো আর একটা বাড়ি। এমনি করে একটা খেয়ালীপনা যেন একটা পাগলামীর মতো মনে হয়েছিল আমার—

তাকে আর কি বলব ! আমার মনে হচ্ছিল যারা রবীন্দ্রনাথের কথা বলবে তারা যদি তাঁকে বুঝতে না পারে তবে তো সেটা নূতন মানুষের কানে অদ্ভুত ঠেকবেই।

সমস্ত সচল সজীব বস্তুর মধ্যে একটা অস্থিরতা আছে, সে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। প্রাণী তো বটেই এমনকি গাছপালাও তার দীর্ঘ শাখারূপ বাহুগুলিকে চারিদিকে আন্দোলিত করে চঞ্চল হতে চায়। একজন কবির সজীব মন তেমনি সর্বদাই ভাবে—'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনোখানে—'।

বাড়ি বদলের প্রসঙ্গে এসে আমার আর একটি কথা অকপটে লিখতে ইচ্ছা করছে। এটা ঠিকই যে, রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তন পছন্দ করতেন। বাড়ি বদল যদি নাও হয় ঘর বদল, নয়ত এক ঘরের মধ্যেই আসবাবপত্রের স্থান বদল করা তার ভালো লাগত। এটা একটা জিনিস কিন্তু উত্তরা-

ম্নণের হাতার মধ্যে যে তিনি বার বার ছোট ছোট বাড়ি বানিয়েছেন তার পিছনে অন্য কথাও ছিল। সকলেই জানেন কবি জোড়াসাঁকোর প্রাসাদোপম বাড়ি ছেড়ে ধু-ধু প্রান্তরের মধ্যে বসবাস করা স্থির করলেন, কারণ কলকাতার 'পাষাণ দেবতার মন্দিরে' তিনি পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি চাইতেন 'পরিবেশ যেন সরল সংযত পরিমিত পরিচ্ছন্ন হয়—ড্রইং-রুম না, ডাইনিং রুম না, তক্তাপোষ এবং ঢালা বিছানা, শান্তি এবং সন্তোষ—কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতা না, বিরোধ না, স্পর্দ্ধা না—এই হলেই জীবন নিজেকে সফল করবার অবকাশ পায়—'

অন্তরের শান্তির জন্য যে অনাড়ম্বর জীবনের প্রয়োজন সে কথা ভারতীয় শাস্ত্রে বারবার করে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই কথাটাই যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনচর্চার মধ্যে ফিরিয়ে আনছিলেন। তাই তার শান্তি-নিকেতনে বসবাস করার ইচ্ছা যখন তাঁকে কলকাতা থেকে প্রবলভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেল, সে সময় শান্তিনিকেতন খুব একটা আরামপ্রদ স্থান ছিল না। কিন্তু প্রকৃতির সাহচর্য অন্য সব অভাবকে দূর করে দিয়ে-ছিল।—'আজ শান্তিনিকেতনে এসে শান্তি সাগরে নিমগ্ন হয়েছি।··· আমি একলা অনন্ত আকাশ বাতাস এবং আলোকের ছায়া পরিবেষ্টিত হয়ে যেন আদি জননীর কোলে স্তন্য পান করছি।'

এই যদি ছিল তার শান্তিনিকেতন তবে আজ সেখানে ইট কাঠের সমারোহ দেখে নিশ্চয়ই মনে হয় যে, পরিবর্তনের ধর্মকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও না। তবে সেই পরিবর্তনের দায় যদি রবীন্দ্রনাথের ঘাড়ে চাপানো যায় তাহলে ভুল হবে। রবীন্দ্রনাথ যখন নিজে সংসার করতেন তখন তিনি যে বাড়িগুলোতে বাস করেছেন সেগুলো ছোটো ছোটো এবং একেবারে স্বল্পবিত্ত মানুষদের বাড়ির তুল্য। 'দেহলী ভারি সুন্দর কিন্তু তাতে জাঁকজমক নেই। আমি তাঁকে মাটির বাড়িতে থাকতে দেখেছি তার পরে এলেন কোনার্কে।' কোনার্ক তখন ছোট্ট দু-তিনখানি খড়ের বাড়ি, খুব নীচু ছাদ এবং স্বল্পপরিসর। বস্তুত ছাদ ছোট হবার দরুণ গরমকালে বেশ কষ্টকর কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিক গরমে কষ্ট পেতেন না। প্রকৃতির সঙ্গে এবং ছয় ঋতুর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে

নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছিল তাঁর রসোপভোগ। কোনার্কেরই পাশে তখন অল্প অল্প করে উদয়ন গৃহ তৈরী হচ্ছিল। এই বিশাল প্রাসাদ একদিনে তৈরী হয়নি। অজন্তা থেকে রূপসজ্জা নিয়ে সম্পূর্ণ দেশীয় স্থাপত্যের অনুকরণে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের সাহায্যে রথীন্দ্রনাথ এই আশ্চর্য বাড়িটি তৈরী করেছেন। এর প্রত্যেকটি কোনায় তাঁর চিন্তা ও শিল্পদৃষ্টির পরিচয় আছে। এরকম একটি বিস্ময়কর স্থাপত্য তৈরী করতে পারা কম কথা নয়। আজকাল বড় বড় শহরে বহু লক্ষ টাকা খরচ করে যে সমস্ত বাড়ি তৈরী হচ্ছে আমার চোখে তাঁর কোনটা রথীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয় নয়; আমি এই সৃষ্টির প্রশংসা করি কিন্তু তবু আমাকে বলতে হবে এটি রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপ্রসূত নয়। তিনি প্রাসাদ ছেড়ে চলে এসেছিলেন আর একটি প্রাসাদে বাস করবার জন্য নয়। এসেছিলেন মাটির কাছাকাছি প্রকৃতির মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের মতো সরল জীবন যাপন করতে। কোন ব্যয়বাহুল্য তার পছন্দ হতো না। এ উদয়ন গৃহ সম্পূর্ণ তৈরী হবার আগেই তাঁর পূরবীর 'প্রসিদ্ধ' কবিতাটি লেখা হয়েছিল—

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এককোণে
রহিব আপন মনে,—
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা—

এই কবিতায় উচ্চারিত আশাগুলির অনেককিছুই তাঁর জীবনে পূর্ণ হয়নি। ধনের টানাটানি ছিল বটে মানহানিও মাঝে মাঝে হয়েছে এবং একটুকু বাসাকে একটুকু রাখার জন্য তাঁকে অবিরত চেষ্টা করতে হয়েছে। কিন্তু অন্যের ইচ্ছার সঙ্গে বিরোধ করে তা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। উত্তরায়ণের বাড়ি যে কত সুন্দর তা তিনি ভালই জানতেন কিন্তু তাঁর মনে হত এ বাড়ি তার আশ্রমের আদর্শের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। সেই জন্যেই ঐ বাড়িতে না থেকে অন্য কোন ছোট ছোট বাড়িতে থাকতে চাইতেন। মাটির বাড়িতে থাকা তার চিরকালের শখ তারই পরিপূরণের

জন্য তৈরী হল—শ্যামলী।

শুধু বাড়ি নয়, খাওয়াদাওয়াটাও খুব সাধারণ করতে চাইতেন তিনি। যখন তাঁর নিজের সংসার ছিল তখন আমরা দেখিনি কিন্তু তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া হেমলতা দেবী লিখেছেন—বিলাসিতা বর্জন ও উপকরণ বর্জন ছিল তাঁর মুখের বুলি, যদিও উদয়ন বাসভবনে যে সব রূপসজ্জা আসবাবপত্র ব্যবহার হত তা সৌন্দর্যের মূল্যেই মূল্যবান। আজকালকার এমনকি তখনকার ধনী গৃহের আসবাবের সঙ্গে তা তুলনীয় নয় তবু রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ঐ উদয়ন বাড়ি কারও নিজস্ব গৃহ হওয়ায় তাঁর আশ্রমের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেছে। অতি স্পষ্ট ভাষায় এ কথা তিনি অনেককেই বলেছেন, আমাকে তো বটেই। কিন্তু যদি কেউ বলে, তাহলে করতে দিলেন কেন? তিনি বলতেন, 'ঐ রাজবাড়ি আমার আদর্শকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে'—তাই যদি হবে তবে গুঁড়োতে দিলেন কেন? এর উত্তরও তাঁর নিজের বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে কারণ উনি বিশ্বাস করতেন কারও উপর জোর করে নিজের ইচ্ছা চাপান অন্যায়। একটি লাইনে এই কথাটা খুব স্পষ্ট করে বলেছেন—I am also a worshipper of idea but in my worship of idea I am not a worshipper of goddess Kali (আমি আদর্শের পূজারী কিন্তু সে পূজায় আমি কালী ভক্ত নই) অন্যের ইচ্ছাকে বলি দিতে তিনি রাজী নন বরং নিজের ইচ্ছা যায় যাক সেই হতাশা কবিতায় গানে বিকশিত হোক।

অন্যের ইচ্ছাকে মূল্য দেবার কথা নানা জায়গায় নানাভাবে প্রকাশ করেছেন, যদিও সেই সব ব্যক্তিদের চিন্তার দৈন্য তাঁর অজানা ছিল না। তবুও নিজের ইচ্ছাকে জোর করে কারো উপর চাপাবেন না, একথা যেমন বলেছেন তেমনি করেছেন। কষ্ট এবং ক্ষতি সহ্য করেও রবীন্দ্রনাথের জীবনে কথা ও কাজের এই সামঞ্জস্য বারবারই দেখা গেছে। প্রত্যেকবার কোন একটি পারিবারিক ব্যয়বাহুল্যের সামনে তাকে কষ্ট পেতে দেখেছি। উদীচীর সামনে গোলাপ বাগান মনোহরা বটে কিন্তু লাইব্রেরীর সামনে হলে বেশি খুশি হতেন। যা আমার তা সকলের হোক। নাতনীর বিবাহের সময় ব্যয়বাহুল্যের কথা চিন্তা করে তিনি

অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এসব কথা বলবার লোক আজ বেশি নেই তবু দু-একজন আছেন তার মধ্যে শান্তিদেব ঘোষ অন্যতম। শুধু বয়স হলেই তো হয় না। যাদের কাছে মনের কথা বলতে পারতেন তাদের সংখ্যা কম কিন্তু তাঁরাও মুখ খোলেননি! আজ তাই দেখি ৭ই পৌষ প্রার্থনার পরে সমবেত জনতা উদয়ন গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে 'আগুনের পরশমণি' গান করে। তখন আমার কী কষ্ট হয় ওরা তা জানে না। এই প্রাসাদ তার অনুমোদিত নয়, যারা অনেকদিন শান্তিনিকেতনে আছেন তারাও জানেন না। কে বলবে? বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

খুব বেশি অসুখের সময় তাঁকে এক রকম জোর করে উত্তরায়ণে আনা হয়েছে। আশা ছিল ওই উদীচীতে আবার ফিরে যাবেন তা হয়নি। তিনি সকলকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন অনাড়ম্বর সরল জীবন-যাপনের জন্য অথচ নিজে প্রাসাদে বাস করছিলেন এই রকম চিন্তা কারও মনে আসতে পারে কিন্তু তা সর্বৈব ভুল হবে। কিন্তু আমার একটি ক্ষীণ প্রতিবাদ কে বা মানবে কিন্তু 'আশা' কবিতার মতো আর একটি কবিতা আমার একটি সত্যবাদী সাক্ষী।

আশ্রমের মোড় ঘুরতেই বাঁ হাতে একটি মাটির ঘর আছে। যার নাম 'তালধ্বজ'। একটি তাল গাছকে বেষ্ঠন করে ঐ ঘরের খড়ের চাল। তাল গাছটি সোজা দাঁড়িয়ে তার পাতার ধ্বজায় মহাকবির একটি বিশেষ ইচ্ছাকে বাতাসে আন্দোলিত করছে।

'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতা আছে কুটিরবাসী নাম, এই কবিতাটির ভূমিকায় কবি লিখছেন—এটি যেন মৌচাকের মত নিভৃত বাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় বলেই মনে করি। সেই সঙ্গে এও মনে হয় বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকারীভেদ আছে। যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না। এই কবিতায় তিনি ঐ কুটিরবাসীকে সম্বোধন করে যা বলেছেন তাতে তার নিজের অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বেদনা প্রকাশ পেয়েছে।······

তোমার বাসাখানি
আঁটিয়া মুঠি

চাহে না আঁকড়িতে

কালের ঝুঁটি।

... ...

কীর্ত্তিজালে ঘেরা আমি তো ভাবি—

তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবী ;

হারায়ে ফেলেছি সে

ঘূর্ণিবায়ে,

অনেক কাজে, আর

অনেক দায়ে ॥

আমার জীবন আমার সময়

আমার আজকের বক্তব্যের বিষয়বস্তু নির্দেশ করা হয়েছে 'আমার জীবন আমার সময়'। যেহেতু এখনও আমার জীবন বর্তমান সেহেতু আমার সময়ও শেষ হয়নি। চলমান ধারা থেকে এক অঞ্জলি জল তুলে যেমন বলা যায় না যে, এইটাই সেই নদী, তেমনি প্রবহমান জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলা যায় না যে, এই আমার জীবন বা এই আমার জীবনের রূপ ও বিকাশ। তবু একটা যুগ বিভাগ করে কোনো নির্দিষ্ট যুগের মধ্যে নিজেকে দেখা যায়—দেখা যায় দেশের পারিপার্শ্বিককে এমন কি বিশ্ব-ব্যাপারকেও।

আজকে আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অর্থাৎ স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত সময়ের কথা স্মরণ করব। এই যুগকে অন্যভাবেও চিহ্নিত করা যায়। বলা যায় রবীন্দ্রযুগ। আবার বলা যায় নারী জাগরণের যুগ। ওদিকে এ সময়টা ব্রাহ্ম সমাজের যুগ। প্রত্যেকটিই পরস্পর সংযুক্ত। আমাদের চোখের সামনেই অবশ্য ধীরে ধীরে সেই চলমান জীবন্ত চিন্তাধারার স্রোতকে মজে যেতেও দেখলাম। ব্রাহ্মসমাজ যে বৈপ্লবিক কর্মসূচী নিয়ে শুরু হয়েছিলো তাকে ক্রমে ক্রমে নূতন পথে নূতন অর্থে যুগোচিত প্রাণ-ধর্মে এগিয়ে নিতে পারল না তাই তা শুকিয়ে গেল। এই সমস্ত প্রক্রি-য়াটা আমি চোখের সামনে দেখেছিলাম। আমরা যখন চট্টগ্রামে ছিলাম তখন আমাদের বাড়ির সামনে ছিল ব্রাহ্মসমাজ গৃহ এবং আশেপাশে কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবার আর ব্রাহ্মদেরই উৎসাহে স্থাপিত খাস্তগীর গার্লস স্কুল—চট্টগ্রামের একমাত্র উল্লেখযোগ্য অতি চমৎকার বালিকা বিদ্যালয়। অবশ্য ক'জন মেয়েই বা সেখানে যেত! ব্রাহ্মসমাজের বাইরে যে বিপুল জনসমাজ ছিল তারা ছিল মুসলমান বা বৌদ্ধ (চট্টগ্রামে বৌদ্ধ অনেক ছিল), তারা বেশি স্কুলে যেত না। মেয়েদের জন্য উৎসব আনন্দের কোন ব্যবস্থাই তখন দেখিনি। পূজাও বড়লোকদের বাড়িতে ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। ধনীরা বা কেউ নূতন ধনী হলে বলতেন 'এবার মাকে আনব'।

এবং পাড়াপ্রতিবেশীর বাড়ির পূজা দেখতে ম্যানচেষ্টারের মিলের নূতন কাপড় পরে যাওয়া দেখতে ছাড়া মেয়েদের আর কিই বা উৎসব ছিল? বিয়ে, পৈতে প্রভৃতিতে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাওয়া হত বটে কিন্তু আত্মীয়স্বজনের গণ্ডী ছাড়িয়ে আর কারু মুখ বেশি দেখতে পেতেন না অসূর্যম্পশ্যারা। অর্থাৎ আত্মীয় ও অনাত্মীয়র ভিতর ও বাহিরের গণ্ডী ছিল বড়ই দুর্লঙ্ঘ্য। পুরুষদের বাইরের জগৎ ছিল। যে সব বাড়ির পুরুষরা ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলতে যেতেন তাদের মেয়েরাও স্কুলে তেমন যেতেন না বা বাইরে বেরোতেন না। চিত্তবিনোদনের জন্য ছিল বহুরূপী, সার্কাস, হরবোলার মেলা বা যাত্রা। যাত্রা শুনতে যেসব মেয়েরা যেতেন তাঁরা বসতেন চিকের ভিতরে।

একদিকে এই অবস্থায় অগণ্য মানুষ আছেন এবং সুখেই আছেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের ডাক দিচ্ছেন মুক্তির ক্ষেত্রে। মেয়েদের কোনো বহির্জগত ছিল না বলে যে কাজ কম ছিল তা নয়। মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণীরাও উদয়াস্ত খাটতেন সবই রান্নাঘরের ব্যাপার—'রাঁধার পরে খাওয়া এবং খাওয়ার পরে রাঁধা'র চাকা ঘুরতেই থাকত। আজ-কালকার মেয়েদের মনে হতে পারে এত কী রাঁধতেন তাঁরা? তা নানা রকম রাঁধতেন তাঁরা নিশ্চয়ই, কিন্তু যারা এঁটো সমস্যা জানেন তাঁরা বুঝবেন কতখানি সময় নষ্ট হত সেই নিতান্ত অনর্থক আচারে। তাছাড়া, সে যুগে পরিবারে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না—কে কখন খাবে কে কখন আসবে তার স্থিরতা নেই। গৃহিণীকে থাকতে হত সদা শঙ্কিত। পাছে ত্রুটি হয়। আমার পিতা ১৯২৩ সালে বিলেত থেকে ফিরে বললেন, সেখানে ঠিক ১টার সময় সবাই মধ্যাহ্ন ভোজন করে। ফলে কারখানায়, অফিসে, বাড়িতে যে যেখানে আছে ঠিক এক সময়ে খেতে বসেছে! কী আশ্চর্য! এসব ডিসিপ্লিনের আমরা ধার ধারতাম না। মুসলমানদের আজান পড়ত একটা নির্দিষ্ট সময়ে এবং পাঁচ ওয়াখ্‌ত নামাজের দ্বারা দিনটা বিভক্ত ছিল। আমরা ছিলাম স্বাধীন। পূজা অর্চনার সময়ও খুব ঠিক থাকতে দেখিনি। পুরুষরা কোনো শৃঙ্খলার বন্ধনে বাঁধা নয়, শৃঙ্খলার প্রয়োগ ছিল শুধু মেয়েদের উপর। সেটা শৃঙ্খলা না বলে শৃঙ্খলও বলা

চলে। নির্দিষ্ট আচার বিচারের এতটুকু এদিকওদিক হলে নিন্দার বিষে তাদের জর্জরিত হতে হত। এবং মেয়েদের উপর অত্যাচারে অগ্রণী ছিলেন মেয়েরাই। এই পটভূমির উপর ব্রাহ্মসমাজ যেন আতশ কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মি ফেললেন। বিচিত্র তার প্রভা।

আমাদের বাড়ির সামনের ব্রাহ্মসমাজ গৃহে সপ্তাহে একদিন ব্রহ্মো-পাসনা হত। সেখানে স্ত্রীপুরুষ সবাই যোগ দিতেন। মেয়েরা অনাবৃত মুখে একপাশে বসতেন, সেদিকে চিকের বালাই ছিল না। এইখানে মেয়েরা গান করবার, আবৃত্তি করবার সুযোগ পেতেন। আমারও রঙ্গমঞ্চে প্রথম সুযোগ এসেছিল এখানে এবং খাস্তগীর গার্লস স্কুলে। আমি স্কুলে যেতাম না। বাড়িতে বাবার কাছেই পড়তাম। সেটা আমার শেখবার পক্ষে এবং বিদ্যার জগৎটা চেনবার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। অল্প বয়স থেকে স্কুলের চাপ সহ্য করতে হয়নি। সেই কারণে ডিসিপ্লিনের অভাব আমার অবশ্যই ছিল। তবু খাস্তগীর গার্লস স্কুলে উৎসবের সময় কবিতা আবৃত্তি করবার সুযোগ আমি পেতাম—আজও তা চাঁটগার প্রাচীন বাসিন্দাদের মনে আছে। এখন বুঝতে পারি স্কুলের বাইরের কাউকে কেন এই সুযোগ দেওয়া হত। অর্থাৎ তখনকার দিনের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আজকের মত বাঁধাবাঁধি ছিল না। রহমৎগঞ্জের ব্রাহ্ম মন্দিরের পিছনে পুরোহিত বা আচার্যের কোয়ার্টার্স ছিল—সেখানে যে ছোট্ট ছিমছাম বাড়িটিতে আচার্য ও তাঁর পত্নী থাকতেন—তার পরিপাট্য বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবারেও দেখা যেত না। জানলার পর্দাটি টান করে টাঙ্গান, বিছানা নিখুঁত করে ঢাকা, দু-একটি শৌখিন জিনিস এবং তাঁদের কথাবার্তা আমাকে আকর্ষণ করত। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল তাঁদের দুটি ছেলে। নিঃসন্তান এই দম্পতি দার্জিলিং বা আসাম থেকে একটি পাহাড়ী শিশুকে এনে মানুষ করেছিলেন তারপর তাদের নিজেদের একটি সন্তান জন্মায় এবং সে শিশুটিকেও দেখতে একে-বারে পাহাড়ী। এরা যে সহোদর নয় তা বোঝা যেত না। সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করত। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভাল লাগত এই ভিন্ন জাতের ভিন্ন মানুষের সঙ্গে সৌভ্রাত্র্য বন্ধনের মাধুর্য। যখন স্পষ্ট করে জ্ঞানোন্মেষ হয়নি তখন থেকেই এই ধরনের ভাব ও চিন্তা আমার ভালো লেগেছে

এবং ক্রমে আমার অবচেতনে তা দৃঢ়মূল হয়েছে। একটু বড় হয়ে যখন ভারততীর্থ পড়লাম তখন স্পষ্ট বুঝলাম 'মহামানবের সাগরতীরে' কথার অর্থ কি।

আমাদের ছোটবেলায় এত নানারকম বই ছিল না। সুকুমার রায় অবশ্যই সে সময় লিখেছেন। প্রবাসীর 'ছেলেদের পাততাড়ি' ও 'সন্দেশ' ছাড়া কোথাও তা দেখিনি বা বই হয়ে আমাদের হাতে আসেনি। সে সময়ে ১০/১২ বছর বয়সের মধ্যে 'কথা ও কাহিনী' আমাদের মুখস্ত হয়ে যেত। সে যুগে 'কথা ও কাহিনী' পড়েনি এরকম অল্প বয়সের ছেলেমেয়ে কমই ছিল। এখন দেখি রবীন্দ্র-জয়ন্তী-করিয়ে মাতব্বরেরাও 'অভিসার' কবিতাটা পর্যন্ত পড়েননি। 'কথা ও কাহিনী' এবং 'শিশু'র কবিতা মুখস্ত করা একটি অবশ্য কর্তব্য ছিল আমাদের। নাচ গান শেখান হত না কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তির রেওয়াজটা হয়েছিল। এখনকার বাংলা শিক্ষার মান অনেক কমে গেছে সম্ভবত বলিষ্ঠ ইংরাজী ভাষার ধাক্কায় তা ভূপাতিত। এখন দেখি ক্লাস সেভেন এইটের ছেলেমেয়েরাও 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' কবিতাটির শব্দার্থ ভালো করে জানে না। 'অনাথ পিণ্ডদ কহিল অম্বুদ-নিনাদে'—একেবারেই ডিকশনারীর গর্জন বলে মনে হবে বিশেষ করে যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে তাদের কাছে।

আমাদের অল্পবয়সে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জীবন্ত উপস্থিতি। তাঁর কবিতা ভাবনা চিন্তা কার্যাবলী, তার স্তুতি নিন্দা সমস্তই সর্বদা আলোচ্য। যাঁরা তাঁকে চোখেও দেখেনি তাঁরাও তাঁর সম্বন্ধে সজাগ। আমাদের বাড়িতে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ যেন আপন-জন। তাঁর রচনার সৌরভে আমার পিতামাতার যৌবনকাল ছিল সুর-ভিত, তাঁদের হাস্যে লাস্যে বিরহে মিলনে জীবন সঙ্গীতে ঝংকৃত হত তাঁর কবিতা। অন্য কোন দেশে অন্য কোন সমাজে একজন কবি এরকম ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন বলে শুনিনি।

এই পরিবেশে আমরা বড় হয়ে উঠলাম। যখন থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেছি তখন থেকেই আমাদের সামনে আদর্শ একজনই। তাঁরই রসে রসিত, তাঁরই ভাবে ভাবিত হওয়ায় আমাদের রচনার যে কোন

প্রকার ক্ষতি হতে পারে একথা আমাদের মনেও হত না। আমাদের সময়ে মেয়েরা লিখতে শুরু করেছেন গদ্য পদ্য দুই-ই। আমি যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা কোনায় এসে দাঁড়িয়েছি তখন সেখানে মেয়েদের মধ্যে উজ্জ্বল উপস্থিতি কামিনী রায়। তখনও বেঁচে আছেন মানকুমারী বসু। তাছাড়া প্রিয়ংবদা দেবী, প্রফুল্লময়ী দেবী। প্রিয়ংবদা দেবীর ছোট ছোট কবিতাগুলো এত মাধুর্য ভরা যে তার কয়েকটি অমিয় চক্রবর্তীর ভুলে লেখনের মধ্যে চলে গিয়েছিল। তবে কামিনী রায় ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতি-সম্পন্না। তাঁর 'আলোছায়া' বই অনেককে নাড়া দিয়েছে। অনেকে বলছে এই কবিতা তাঁর নিজের জীবনের দুঃখ দাহ থেকে, বিরহতাপ থেকে উত্থিত। যদি সত্যিই তা হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে তিনি অসম সাহসের কাজ করেছিলেন। কারণ সে সময়ে স্ত্রী বা পুরুষ সহজে নিজের অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দিতে বা প্রচার করতে চাইতেন না তুলনায় বলা যায় প্রতিভাশালী গদ্য লেখিকা অনুরূপা দেবীর কথা। তিনি কতক-গুলো আদর্শকে ধরে রেখে নায়ক নায়িকার জীবনকে তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। আদর্শগুলি শাস্ত্রানুগ, জীবনানুগ নয়। মনে হয় আজও আমরা এ বিপদ কাটিয়ে উঠিনি। কোন রচনা সাহিত্য হয়েছে কিনা, রসোত্তীর্ণ হয়েছে কি না কাব্য বিচারের সেটাই একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত কিন্তু তা হয় না। যদি হতো তাহলে লেখক লেখিকা সকলেই অনেক নির্ভয়ে সহজভাবে সত্যোপলব্ধিকে রূপ দিতে পারতেন। আমাদের যৌবনকালে ক্রমে সাহিত্যক্ষেত্রে দুরকম দুর্লক্ষণ দেখা গিয়েছিলে। এক গতানুগতিক আদর্শ প্রবণতা অন্যদিকে সকল বন্ধন ছেঁড়ার উদ্দাম জোয়ার।

কল্লোল যুগের অনেক লেখক পরের দিকে প্রতিভাদ্দীপক রচনা লিখে খ্যাতিমান হলেও প্রথম দিকে তাঁদের রচনার মধ্যে উৎকট ও উদ্ভট রসের প্রাবল্য যে দেখা দেয়নি তা বলব না, যেমন 'বেদে' উপ-ন্যাসের একটি লাইন—'বুড়ো বাপটা পৃথিবীকে মুখ ভ্যাংচাইয়া চলিয়া গেল।' পিতৃবিয়োগের এরকম বর্ণনা তখনকার পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃর যুগে বড়ই কর্ণকটু হয়েছিল।

তখন না বুঝলেও ক্রমে আমি বুঝতে পারছিলাম আধুনিক লেখকরা কি বলতে চাইছেন। ভাষা ও ভাবকে ভেঙ্গেচুরে দিতে চাইছেন। বাংলা ভাষার মূল জমি সংস্কৃত, সে সময়ে আমাদের সাধারণ কথার মধ্যেও প্রচুর সংস্কৃত কথা, উদ্ধৃতি ও উপমা ব্যবহার করা হত, এখন যেমন ইংরাজী কথা, ইংরেজী উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়, এখন সংস্কৃত দূরে চলে গেছে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীরা যখন বাংলা ভাষাকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে সরিয়ে এনে নূতন রূপ দিতে চাইছিলেন তা প্রথম দিকে আমাদের কানে ছিল না, কারণ এই লেখকরা অনেকেই সংস্কৃত জানতেন না। বাংলাকে সজীব নূতন ও সমৃদ্ধতর করার জন্য তাঁরা উৎসে পৌছতে পারেননি। তাই প্রাকৃত জনের প্রাকৃত ভাষাই প্রবেশ করেছিল সেই পরিবর্তনের মুখে। একদিক থেকে তার সার্থকতা আছে। বিশেষত যে রাজনৈতিক পরিবর্তন চিন্তার ক্ষেত্রে আসন্ন হয়েছিলো ভাষার এই বিবর্তন তার অবশ্যই উপযোগী ছিল। কিন্তু আমাদের তা ভাল লাগেনি। অনেকেই ভ্রূকুটি করেছিলেন এবং তাঁর পূর্ণ সুযোগ নিলেন সজনীকান্ত দাস তার শনিবারের চিঠিতে। অন্যরা কীভাবে নিতেন জানি না কিন্তু আমার কাছে তা ভয়াবহ ছিল।

শনিবারের চিঠি প্রতিটি সংখ্যা বেরোবার আগে আমাদের হৃদকম্প হত কাকে কিভাবে গালাগাল করবে ভেবে। শনিবারের চিঠি হয়েছিল সকলের মাস্টারমশাই। রবীন্দ্রনাথও রেহাই পেতেন না। এ ধরনের গালিগালাজের পত্রিকা পূর্বেও ছিল। সজনীকান্তের দুই যুগ আগে তারই মত সুরেশ সমাজপতিও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একজন নিষ্ঠুর সমালোচক। বোধহয় গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে এরই রচনা 'পায়রা কবির বকবকানী নগদ মূল্য এক টাকা' এই সব পদ্য আমাদের ছোটবেলায় খুব শুনতাম। সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতা সম্বন্ধে এদেশের মানুষ চিরকালই সজাগ। দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে চিত্রাঙ্গদা অশ্লীল ঠেকেছিল এবং প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে তিনি এজন্য রবীন্দ্রনাথকে চাব্‌কাবেন এরকম উক্তিও করেছিলেন! কাজেই কল্লোল যুগের কবিদের যে অশ্লীলতা দোষের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে সে আর বিচিত্র কী? এখনও এদেশে দৃষ্টিভঙ্গির এ দুর্বলতা যায়নি।

রচনায় প্রেম, প্রণয় ও সেক্স আছে *কিনা এটা বিচার্য নয়, বিচার্য সেটা সাহিত্য হয়েছে কি না! ঘটনাবলী যাই হোক তার ভিতর দিয়ে কোনো* সত্যে বা বক্তব্যে উত্তরণ ঘটছে কি না, সাহিত্য বিচারে সেটাই মূল কথা। নায়িকা কতখানি পতিব্রতা বা নায়ক কি রকম আদর্শ পরায়ণ তা দিয়ে সাহিত্য বিচার হয় না, একথা মুখে সবাই স্বীকার করলেও সাহিত্য বিচারে সেই মান্ধাতার আমলের মাপকাঠি এখনও চলে আসছে। শুধু তাই নয়, নায়ক নায়িকার দোষগুণ তাদের সৃষ্টিকর্তার উপরও আরোপ করা হয়। তাই সমাজের চাপে লেখকরাও সহজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখতে পারেন না, বিশেষত লেখিকারা। অবশ্য বাণী রায় তাঁর লেখায় অনেক-খানি সবলতা দেখিয়েছেন। অন্যদেশের লেখক বা লেখিকা সমান স্বাধীনতা ভোগ করেন। চিন্তার ক্ষেত্রে সমাজের চাপ তাদের অবাধ প্রসারতাকে ক্ষুণ্ণ করে না। আমাদের সময়ে এই চাপ লেখকের অজ্ঞাত-সারেই তার মনকে বাধাগ্রস্ত করতই। তিনি যতবড় লেখকই হোন্ এর থেকে মুক্তি পেতেন না। আজ কালের প্রবাহে আমরা একটু একটু করে সত্যের দিগন্তের দিকে এগিয়েছি। যে কারণে 'ঘরে বাইরে' বইতে রবীন্দ্রনাথ যত মুক্ত 'চোখের বালিতে' তত মুক্ত নয়। বিধবা বিবাহ আইন হলেও তাঁর বিনোদিনী অর্থাৎ তিনি নিজে সে কাজটি সম্পন্ন করলেন না। আর শরৎচন্দ্রের নায়িকারা প্রত্যেকে প্রেম ব্যবহারে যতই আধুনিকা হোন—খাওয়া ছোঁওয়া ব্যাপারে তাঁরা আচার পরায়ণা এবং অনাহারী। থেকে পুরুষের পঞ্চব্যঞ্জন ভোজনের তদারকেই উৎসর্গিতা।

সমাজ লেখকের কলমকে ধরে থাকবেই এবং তার দিক্ নির্ণয় করবে একথাও সত্য কিন্তু আমাদের সময় এটা বড় বেশি হত। ফলে লোকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তার জীবনদর্শন, তার বিশেষ মূল্যাবোধ ও তার তপস্যার বৈশিষ্ট্য লোপ পেয়ে যেত। এমন কি লেখার ভঙ্গি বা রচনা-শৈলীর পরিবর্তনও লোকে সহজে গ্রহণ করত না। এই অচলায়তন চিন্তা জগতে ও সমাজে রবীন্দ্রনাথ যে নতুন জীবনস্রোত প্রবাহিত করলেন, বাক্ বৈদগ্ধের যে নতুন ভঙ্গিমা, শুধু জগৎ নয় শুধু লৌকিক নয়—অলোকধামের যে বিচিত্র নূতন অনুভব তাঁর গানে গানে সঞ্চারিত

হল সেই রবীন্দ্র বিশ্বে আমাদের জ্ঞানোন্মেষ হয়েছিল। এই নিরানন্দ দেশে বইতে শুরু করল গানের স্রোত, মেতে উঠল নানারকম মুখরতা। আমাদের পায়ে বন্ধন ছিল কিন্তু আমাদের মন গানে গানে, সুরে সুরে বারেবারেই আকাশে ডানা মেলে উধাও হবার আস্বাদ পেল। বাইরে বেরুতে মেয়েদের চলনদার লাগত। ঘণ্টা, মিনিট গোনা অনুমতি লাগত। নিজেদের সাহস ছিল না কারু সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলবার। আমরা ছিলাম খাঁচার পাখি। কিন্তু তাঁর গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে একটা মুক্তির ডাক এসে পৌছল 'হা রে রে রে আমায় ছেড়ে দে রে যেমন ছাড়া বনের পাখী মনের আনন্দেরে'—এসব গান শুনে আমরা বুঝতে পারলাম আর সেই আনন্দের ঢেউ তরঙ্গে তরঙ্গে এসে আমাদের মনের শৃঙ্খলগুলো সব খুইয়ে দিল—মেয়েদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাই বিশেষ আত্মীয় ছিলেন। কবি তো অনেকই ছিলেন। কেউ বা 'ঐ যায় ঐ যায় বাঙালীর মেয়ে' লিখে দেশের সবচেয়ে বঞ্চিত নির্যাতিত মানুষকে ব্যঙ্গ করলেন আর তিনি ভাঁড়ার ঘরে দেওয়ালগুলো শূন্যে মিলিয়ে দিলেন তাঁর কবিতার বসন্ত বাতাসে। আমরা ঘর ছেড়ে এক পা না বাড়িয়েও নূতন দেশে পৌঁছে গেলাম।

আমার পক্ষে এ কথা বড় সত্য। আমি চোখ মেলেছি সেই দেশে যে দেশের আকাশ বাতাস রবীন্দ্রনাথের চিন্তার আলোতে উজ্জ্বল। তাই যদিও খুব অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখি এবং কবিতা লেখার জন্যই আমার পিতা আমাকে কবির কাছে নিয়ে যান, ও তাঁর লেখা ভূমিকাসহ আমার প্রথম কাব্য-গ্রন্থ উদিতা ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়, তবু আমার কোনো চেষ্টাই ছিল না রচনাশৈলীর পরিবর্তন করে তার মধ্যে নূতন নূতন চমক আনবার। রবীন্দ্রনাথের পথনির্দেশ সেভাবে গ্রহণ করবার আমার শক্তি ছিল না—আমি ছিলাম মুগ্ধ। অথচ কল্লোলযুগ শুরু হয়ে গেছে। লেখকরা কবিরা ভাঙার বিচিত্র কারিগরীতে লেগে পড়েছেন। ভাষাকে ভেঙেচুরে নূতন নূতন আকৃতি দিয়ে পাঠককে আকৃষ্ট করছেন। সেই কল্লোলযুগ থেকে এ পর্যন্ত কবিতার বিষয়বস্তু যাই হোক কবিতার স্থাপত্যে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথই

এর মূল কারণ। ওই রকম আকাশস্পর্শী কালান্তর ব্যাপী প্রতিভার পাশে স্বীয় অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জীবন সংগ্রামই এর ভিতরের অব্যক্ত কারণ। ভাবে না হোক তাঁর থেকে ভাষা ও ভঙ্গীতে অনেক দূরে সরে যাওয়া জীবন ধর্মেরই অভিব্যক্তি। উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রের মধ্যে বুদ্‌বুদের স্থায়ীত্বের আকাঙ্খার মত জীবন লিপ্সা।

আমার নিজের পক্ষে অবশ্য ব্যাপারটা ছিল বিপরীত। আমার কবিতা নয়, আমার কাব্যজীবনকে বাঁচাতে হলে অর্থাৎ কবিতার স্বকীয়তা হোক বা না হোক কবিতার আনন্দকে রক্ষা করতে হলে চিন্তায় মননে ধ্যানে জ্ঞানে তাঁর থেকে দূরে যাবার কোনো ইচ্ছা বা উপায় ছিল না। আমার মনের সমস্ত আবেগ সেই আদিত্য বর্ণ পুরুষম মহান্তম্‌কে কেন্দ্র করে আপনার কক্ষপথ তৈরী করে নিয়েছিল, কোনো প্রলোভনই তাঁকে সে পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। ছায়েবানুগতা হবার যে কি ক্রুটি থাকতে পারে বা বুদ্‌বদের সত্ত্ব পাতিত্ব সম্বন্ধে সে সময়ে কেউই আমায় সচেতন করতে পারত না।

কিন্তু কারণ যাই হোক, বর্তমানে কবিতার আঙ্গিকে যে বৈচিত্র প্রচলিত হয়েছে সেটি এ যুগের বিশেষত্ব এবং কোনো মানুষই যুগধর্মকে অস্বীকার করে বাঁচতে পারে না। তাই ক্রমে আমার কবিতার উৎস ফল্গু হল। শুধু এই নয় আরো নানা বিষয়ে আমি যুগধর্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারিনি তাই সাহিত্য জগতে আমার স্থান একেবারে কোণের পঙক্তিতে।

যাই হোক আর একবার আমার সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকের কথায় ফিরে যাই। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ উদিতার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—শুধু চিন্তা করা নয়, চিন্তা করতে রস না পেলে সেটা কাব্যের বিষয় হতে পারে না। মৈত্রেয়ীর কাব্যে তত্ত্বের আনন্দই যদি ক্রমে প্রধান হয়ে ওঠে তবে এ সম্বন্ধে তার রচনার অনন্যপূর্বতা বঙ্গসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান নিতে পারবে।

এই তত্ত্বচিন্তার কথার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমার অল্প বয়সে আমি দার্শনিক চিন্তার এক ঘনীভূত স্তরে বাস করতাম। আমার বিশ্ব-

বিশ্রুত পিতা আমার মধ্যে চিন্তার বীজ বপন করতেন। আলোচনা তর্ক-বিতর্ক যা কিছু ভাবনা-চিন্তা পঠন-পাঠন হত তার মধ্যে অনেকটাই 'পরম' অর্থাৎ (absolute) বা 'পরম সদবস্তুর' (absolute reality)র সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েই হত। এরকম বাড়ির আবহাওয়া এযুগে বসে ধারণা করতে পারি না। অন্তত আমাদের কাছাকাছি কোনো পরিবার চোখে পড়ে না যেখানে এমনটি হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের কাছে পিতার সঙ্গে যেতাম। তিনি তখন লান্সডাউন রোডে তাঁর মেয়ে সরযূবালা দেবীর বাড়িতে থাকতেন। সরযূবালা একটি বিশেষ দার্শনিক সন্দর্ভ লিখেছিলেন তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে, বইটির নাম 'বসন্ত প্রয়াণ'। এই বইয়ের জন্য তিনি বিপুল খ্যাতি লাভ করে-ছিলেন। ঐ বাড়িতে যে সমস্ত কথাবার্তা হত তার একাংশও বুঝতাম কিনা সন্দেহ কিন্তু বোঝার একটা প্রতিভাস জন্মাত। সেটা কাব্যপাঠের চেয়ে কম আনন্দজনক ছিল না। তাই সেই ভাব কাব্যের প্রেরণাও হত। নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জগতের অর্থকে আবিষ্কার না করে সে যেন এক কুয়াশাচ্ছন্ন বাতাসে ভেসে যাওয়া। সে পথ ছায়াময় অবাস্তব। কর্মের ভিতর দিয়েই জ্ঞানে পৌঁছবার পথ। তা না হলে সে অসাড় জল্পনা।

কর্মের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করবার সুযোগ এল অনেক পরে। প্রধানত কবি ভাবাপন্ন হলেও কর্ম কোনোদিনই আমার কাছে অনাদৃত ছিল না। যে কোন কাজেই আনন্দ পেয়েছি কিন্তু কর্ম ও চিন্তাকে পরস্পরের সঙ্গী করে দুই পা ফেলে এগোনো অল্প বয়সে সম্ভব হয় না বা আমার হয়নি। রংপুর অরণ্যবাস থেকে কলকাতার জনসমাজে ফিরে এসে কিছুটা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা এবং অনেকখানি রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতি-কতার ভাবনা ধীরে ধীরে আমার দৃষ্টিকে মুক্ত, আমার পথকে স্পষ্ট করল। তারপরে কর্মের পথে অনেকের সঙ্গে চিন্তার সংঘর্ষ ঘটেছে কিন্তু আমি আমার বুদ্ধি বিবেচনা মত কাজ করে চলেছি। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় আর একবার প্রমাণ পেয়েছি, মানুষের দুঃখ বেদনার পাশে দাঁড়িয়ে দুই হাত এবং হৃদয় দিয়ে তাকে স্পর্শ করার দ্বারা, নিজেকে

বিস্তৃত করার দ্বারা গভীর জীবনবোধ লাভের সার্থকতা কি।

বর্তমানে খেলাঘরে ছোট ছোট অনাথ ছেলেমেয়েদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত পথে একটি শিক্ষায়তন গড়ে তোলার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ। অনেকে মনে করেন, এইসব কাজ লেখককে তার পথ থেকে বিচ্যুত করে কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমরা যেরকম দর্শনের আলোচনা করতাম আজকের দিনে অল্পবয়সীদের মনে পলিটিকস্ কতকটা সেই জায়গা নিয়েছে। মার্কস কি বলেছেন আর বলেননি নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অস্পষ্ট সেও এক অবাস্তব রাজ্য। নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পদে পদে জীবনকে স্পর্শ করে চলাতেই চরম কাব্য আর পরম জীবন দর্শন। সেখানেই অমৃতপান—নন্যঃ পন্থা বিদ্যতে।

কর্মের দ্বারা মানুষ অন্যকে যতটা দেয় তার চেয়ে বেশি নিজেকে পায়। লেখকের একান্ত প্রয়োজন নিজেকে পাওয়ার। উপলব্ধির রঙ্গে রঙ্গীন অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে লেখক পাঠককে যদি উপহার দিতে পারে তবেই সে তার শ্রেষ্ঠ দান দেয় কিন্তু সে বড় কঠিন কাজ—সত্যের মুখের ঢাকনা খুলবে কে ? ক'জন তা পারে ? তবে কখনো যদি দমকা বাতাসে সে আবরণ উড়ে যায় লেখক দাঁড়ান তাঁর পাঠকের মুখোমুখি তখন তাঁদের মাঝখানে আর কিছু থাকে না, না লোকাচার না দেশাচার—তখন সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব। সেই চরম মুহূর্তে লেখক জীবনের সার্থকতা পাঠকের সঙ্গে যুগল সম্মিলনে, প্রত্যেক লেখক সেই শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকেন এবং যিনি যতবার সেই অনুভূতিতে পৌঁছন ততবার নূতন করে জীবনের অর্থ খুঁজে পান।

সঙ্গীত ও পূজা

ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার এক নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন হল যার প্রধান উপাচার সঙ্গীত। মনুশাসিত ভারতে এবং সম্ভবত ইসলামের প্রভাবে নৃত্যগীত তার পূর্বে একেবারেই সুনজরে দেখা হত না। যদিচ দক্ষিণ ভারতে সর্বত্রই বাদ্য সহযোগে দেবদাসীরা পূজা নিবেদন করতেন। সোমনাথের মন্দিরে এক হাজার দেবদাসী ভগবান সোমনাথের আরাধনা করতেন। মূর্তি উপাসক ভারতের অবির্ভাবের পূর্বে বৈদিক ভারতে ঋষিরা প্রকৃতির উপাসনা করতেন—বিশ্বচরাচরে গ্রহনক্ষত্রে ঋতুতে ঋতুতে পুষ্পপত্র বিকাশে সন্ধ্যা ও উষার বিচিত্র রঙ্গের খেলায় তাঁরা অভিভূত হতেন যেমন অভিভূত হয়ে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "বড় বিস্ময় মানি হেরি তোমারে"—সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্ট রূপের মধ্যে যে অপরূপভাবে প্রকাশিত হচ্ছেন তা দেখে দেখে যুগে যুগে মানুষ গানে গানে সাড়া দিয়েছে—তার বিস্ময় কথার সীমিত অর্থে ব্যক্ত হতে চায় না।

বৈদিক কবিরা কবিতা লিখেছেন, সেই ঋক্‌মন্ত্রগুলি গান করেছেন—বেদগানের ধ্বনিতে বনভূমি মর্মরিত হয়েছে। তা কান থেকে কানে মন থেকে মনে যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। পরবর্তী যুগে যখন পৌরাণিক কাহিনীগুলি এদেশের আদিম প্রচলিত কাহিনীগুলির সঙ্গে মিশে নানা মূর্তিতে রূপ নিল—তখন পূজা হয়ে গেল সঙ্কীর্ণ, মন্দিরের চৌহদ্দিতে আবদ্ধ। বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে, বিশেষ বিশেষ উপাচারে নির্দিষ্ট গণ্ডীবদ্ধ। কিন্তু সাধকের মন তো আবদ্ধ থাকে না। সে ক্রমাগত নিজের সীমা ছাড়িয়ে যেতে চায়, নিজেকে উৎসারিত করতে চায় কোনো এক অজানার দিকে, কোনো অজ্ঞাত লোকের অভিমুখে। কোনো এক অ-লোকসম্ভব ভালবাসায়, যার সম্পূর্ণ অর্থ তার নিজেরও জানা নেই। নির্দিষ্ট কতগুলি বহু উচ্চারিত মন্ত্র তখন তাকে আর সেই অসীম আনন্দের বোধ দিতে পারে না। যখন রামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীত গান করেন—গান করতে করতে যে রসে তিনি শ্যামার মূর্তিকে সঞ্জীবিত

করেন, সে চণ্ডীমণ্ডপের পাঁঠা খাওয়া শ্যামা নয়।

রবীন্দ্রনাথের একটি লাইন আছে 'আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব নাগো গান দিয়ে দ্বার খোলাবো।' লাইনটি একাধিক অর্থে সত্য। গান দিয়ে যা করা যায় হাত দিয়ে তথা যুক্তিতর্ক দিয়ে, তা করা যায় না। আমরা দেখি যখনই কোনো কঠিন কাজে আমরা ব্রতী হই গান আমাদের শক্তি দেয়—গান অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী। যে দেওয়াল মন্ত্রে ভিন্ন হয় না গানে তা চুরমার হয়ে যায়। মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে অসম সাহসে কবীর গান গেয়েছিলেন—'তুলসী পূজনে হরি মিলে তো পূজে তুলসী ঝাড়। পাথর পূজনে হরি মিলেতো মৈ পূজে পাহাড়।' উপকরণ যে অনাবশ্যক সে যুগে তা বক্তৃতা করে বলে কেউ পার পেত না। কবীর নানক দাদু সবাই তাই ছন্দেই তাঁদের কথা বললেন—ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠিন বন্ধন ছিঁড়ে জাতপাতের বেড়া ডিঙ্গিয়ে তারা যে পথে বেরিয়ে পড়লেন সে পথ গানে গানে মুখর। আর তাই বিরুদ্ধতা দূর হয়ে "লোক নাহি ধরে যবন জোলার চরণ ধূলার লাগি।"

তারপর এলেন চৈতন্যদেব। হিন্দু সমাজের অঙ্গচ্ছেদ না করে কৃষ্ণ-পূজক শ্রীচৈতন্য মানব প্রেমের এক নূতন বাণী নিয়ে এলেন, জাতের গণ্ডী গেল ভেঙ্গে, নারী পেল মুক্তি—বিধবার শূন্য জীবনে এল প্রেমের সঞ্জীবনী শক্তি—যে দেশে যে সমাজে বিধবাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত সে দেশে কণ্ঠীবদল করে পুনর্বিবাহিতা নারী মাথা উঁচু করে চলবার জোর পেল। এই যে বিপুল পরিবর্তন ঘটল কীর্তনের মন্ত্রশক্তিই তার একটি প্রধান কারণ। নদীয়ার নিমাই রাস্তা দিয়ে কীর্তন গেয়ে যেতেন শত শত লোক পথে বেরিয়ে পড়ত—তথাকথিত জাত কুল খুইয়ে যবন ব্রাহ্মণ হাতে হাত ধরে কৃষ্ণনাম কণ্ঠে নিয়ে। গান এখানে বহু যুক্তিতর্কের চেয়েও সহজে মানুষে মানুষে বিভেদ ঘুচিয়েছে—সমস্ত ধর্মেরই যা উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের পরে যে পরিবর্তনের শুরু হল সমুদ্রযাত্রার নিষেধ অগ্রাহ্য করে—যখন বাঙালীর ছেলে পশ্চিমের সভ্যতার খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নিল, ছোঁয়াছুঁয়ি 'ভাতের হাড়ির ধর্ম'

ফেলে কুসংস্কারের গণ্ডী ভেঙ্গে মানুষের হৃদয়স্থিত ধর্ম বাসনার স্বরূপ কি তা তখন আর একবার চিন্তা করবার সময় এলো।

সংঘবদ্ধভাবে সেই চেষ্টার প্রয়াসেই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। ব্রাহ্ম-সমাজ কোনো নূতন ধর্ম প্রবর্তন করেনি—প্রাচীন উপনিষদের বিশ্বভাব-নার ভিতরে অবগাহন করে নূতন যুগের সঙ্গে সঙ্গত এক উপাসনা রীতি উদ্ভাবন করেছিল। উপনিষদের ঋষিরা পৌত্তলিক ছিলেন না—যে সমস্ত জিজ্ঞাসা স্বতঃই মানুষের মনে আসে, যে অপার বিস্ময়ে এই বিশ্বচরা-চরের রূপলীলা মানুষকে অভিভূত করে, জীবন মৃত্যুর রহস্যঘন খেলায় যে অসীমের সংবাদ আনে, সৃষ্টির আনন্দে যে স্রষ্টার স্পর্শ পাওয়া যায় তারই উপর নির্ভর করে বিশ্ববিধাতার যে ভাবরূপ তাঁদের মনে রূপ নিয়েছিল যে বিধাতা অপানি পাদো। তিনি অচক্ষুঃ এবং অকর্ণঃ। তবু তিনি আছেন বলেই আমাদের গতি আছে আমরা দেখতে পাই আমরা শুনতে পাই—আমাদের জীবন আছে। প্রাণবায়ুতে প্রবিষ্ট স্রষ্টার সেই সত্তা তাঁদের উপলব্ধির মধ্যে সত্য। কোনো মন্দিরে মূর্তিতে কাঠে পাথরে তাঁকে খোঁজেননি তারা।

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত বা পূজার সঙ্গীতগুলি যখন শুনি তখন মনে হয় এও তো সেই বৈদিক ঋষিদের মত প্রকৃতির বন্দনা, কেবল এর ভাষা আলাদা!

"আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান······"

কিংবা, "আকাশে ধায় রবি তার ইন্দুতে
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে
তেমনি করে সুধা সাগর সন্ধানে
আমার জীবন ধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না?"

এমনি শত শত গানে পূজা প্রকৃতি ও প্রেম মেশামেশি করে এক অপরূপ ভাবে ভাবিত করছে মানুষের মন।

বিশ্বচরাচর যে আশ্চর্য বার্তা বহন করে আসছে তা সব মানুষের

মনকেই কোনো কোনো বিশেষ মুহূর্তে অজ্ঞাত গভীরের দিকে টানে। তার মনে প্রশ্ন জাগে এর নিয়ন্তা কে? একজন তেমনি ব্রহ্মোপাসক নির্মলচরণ বাগল লিখছেন—

ভুবন ভরিয়া জীবন জুড়িয়া কে তুমি, কে তুমি
ভুলোক দ্যুলোক পূর্ণ করিয়া কে তুমি, কে তুমি?
এ দেহ বীণায় তুলি নানা সুর কে তুমি বাজাও অতি সুমধুর
রূপে রসে রঙ্গে ভরি হৃদিপুর—কে তুমি কে তুমি?

কিংবা উপেন্দ্রকিশোর রায় রচিত—

বল দেখি ভাই এমন করে ভুবন কেবা গড়িল রে
গগন ভরে তারার মানিক ছড়ায়ে কে রাখিল রে।

ইত্যাদি অনেক ব্রহ্মসঙ্গীতই বিস্ময়াভিভূত মানুষের প্রশ্ন এবং উপ-লব্ধির আনন্দ একত্র প্রকাশ করছে। কিসের উপলব্ধি? ব্রহ্মসঙ্গীত গান করে কারু কি ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, না সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়েছে, না স্রষ্টার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে? তা নয়, কোনো দর্শন তত্ত্ব নয়, কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মের গণ্ডী বন্ধন নয়—হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়ে যে সব অধরা অ-লোক ভাবনা মানুষীসত্ত্বার একটি বিশেষ সত্য সেই সত্ত্বাকে উপলব্ধি করেছে। ব্রহ্মসঙ্গীতের ভিতর দিয়ে সেই এক আনন্দময় প্রেমময় জগতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে যেখানে প্রবেশ করলে তুচ্ছ বিভেদের গণ্ডী মিলিয়ে যায়—মানুষ তার উপলব্ধির রসায়ণে জারিত করে যে দেবতাকে পায় সে দেবতা মানুষের দেবতা—মানুষের হৃদয়েই তাঁর জন্ম। তাঁর জন্য কোনো আলাদা স্বর্গ নেই। সুরের সপ্ত-পক্ষে বাহিত হয়ে তিনি আসেন তাঁকেই সম্বোধন করে কবি গান করেন,

'আমার মিলন লাগি তুমি আসচ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্রসূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে।'

জীবনবোধের মধ্যেই এই জীবনাতীতের স্পর্শ পাওয়ায় মানুষের পূর্ণতা। ব্রহ্মসঙ্গীতের রসধারায় এই অপূর্ণ তাপিত ক্লিষ্ট মানুষ তার হৃদয় নন্দনবনেই পূর্ণের পদ পরশ লাভ করে।

পূর্ববাংলার নব জাগরণ

বর্তমানে বাংলার জাগরণ বলতে আমাদের কাছে দুটি পর্যায়ের কথা মনে হয়—এক যখন রামমোহনের যুক্তিবাদের প্রভাব ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির মনকে ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তি দিচ্ছিল, মুক্তি দিচ্ছিল অযৌক্তিক কুসংস্কার থেকে, যুক্তিহীন আচার অনুষ্ঠানের নিরর্থকতা থেকে, ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা সংঘবদ্ধভাবে ও ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখদের দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে চালিত সেই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকে মনে পড়ে।

যেহেতু হিন্দু ও মুসলমান সমাজ সামাজিক ক্ষেত্রে আপন আপন গণ্ডির মধ্যে বাস করত, তাই হিন্দু সমাজের ভিতরের এই প্রচণ্ড আলোড়ন ও সমাজ বিপ্লবের প্রভাব দুই একজনকে বাদ দিলে বেশির ভাগ মুসলমানকে স্পর্শই করল না। প্রধানত হিন্দুদের উগ্র জাতিভেদের প্রাচীর বেষ্টনের জন্যই দুই ভিন্ন ধর্মীয় সমাজ অনেকটা পৃথক ভাবেই বাস করেছে চিরকাল—তবু এক সমাজের অন্ধতা ও কুসংস্কার অন্য সমাজকে কিন্তু অনেক পরিমাণে প্রভাবিতও করেছে। অন্ধ যখন অন্ধকে হাতে ধরে নিয়ে গেছে তখন ওলা বিবি, পীরের দরগা প্রভৃতি হয়েছে হিন্দু মুসলমানের মিলন ক্ষেত্র। নবাব বাদশারা অনেকেই গণৎকার ডেকে শুভাশুভ নির্ণয় করে কাজ করেছেন। গণৎকারের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করে বসে থেকে মুসলমান রাজপুরুষ দারা শত্রুর খপ্পরে পড়েছেন এমন কাহিনীও আছে। বস্তুত যুক্তিহীন কুসংস্কার যেন গুজবের মত, মানুষ সহজেই তার আওতায় চলে যায়। কিন্তু যুক্তি বিচারের শাণিত পথে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অতি কঠিন কর্ম। বাংলার জাগরণের সেই প্রথম যুগে শুধু রামমোহন নয়, তাঁর প্রদর্শিত পথে যখন একে একে বহু সমাজবিপ্লবী নিজের নিজের ক্ষেত্রে যুদ্ধ করে চলেছেন, তাঁদের বুদ্ধিশানিত যুক্তিকুঠারে পুরুত মার্কা মনুর অনুশাসনগুলি একে একে শুকনো খোলসের মত খসে পড়ছে, তখনও মোল্লাদের ফতোয়াগুলি তেমনি আঁট হয়েই রয়েছে, তাতে কোনো

আঘাতই লাগেনি।

মুক্তির আস্বাদই মুক্তির তৃষ্ণাকে বাড়িয়ে তোলে। সামাজিক মুক্তির প্রয়াস যে মানসিকতার জন্ম দিল, তারই খোলা বাতাসে রাষ্ট্রীয় মুক্তির আকাঙ্খা তীব্র হয়ে উঠল। বাংলার জাগরণের সেই দ্বিতীয় পর্ব—সেখানে সুকঠিন মরণপণ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস একটি রক্তরেখায় চিহ্নিত।

উপরোক্ত কারণে অর্থাৎ প্রথম পর্বের সামাজিক মুক্তির চেষ্টা সফল হল না বলেই দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের সহযোগিতা আশানুরূপ হতে পারল না। বাংলা দ্বিখণ্ডিত হবার একটি দৃঢ় কারণও এই যে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এক সঙ্গে জাগরণ হল না।

কিন্তু ইতিহাসের গতির মধ্যে দশ কুড়ি বছর কিছুই নয় বাঙ্গালির সেই অসম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা হয়ে চলেছে একথা যে কেউ বর্তমানে পূর্ব বংগের শিক্ষিত মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গীর খবর রাখেন, তিনিই জানেন। দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়ে বাঙালী মুসলমান সভয়ে আবিষ্কার করেছে যে, এক ভূয়ো রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বদলে সে হারিয়ে ফেলেছে তার সংস্কৃতি, তার ঐতিহ্য, তার জীবনের সকল প্রেরণার উৎস। সেজন্য জাগরণের প্রথম সূচনাতেই সে চেষ্টা করল হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সংযোগে সমৃদ্ধ বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগকে গভীর করতে, ব্যাপক করতে—ভ্রান্তদের বোঝাতে যে ইতিহাস হারা কোনো সমাজ মূলোৎপাটিত লতার মত শুকিয়ে যেতে বাধ্য। প্রাণের সেই সঞ্জীবনী রস খুঁজতে গিয়ে সে হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দের বিষ-তিক্ততা পার হয়ে গেল।

বর্তমানে পূর্ব বঙ্গের অধিকাংশ লেখক, সাংবাদিক, প্রভৃতি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কারমুক্ত ও উদার এবং পাকিস্তানের বর্তমান শাসকবর্গের অনুদার নীতির বিরোধী, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরোধী। বাংলার জাগরণও এখন রাষ্ট্র নৈতিক স্বাধীনতা প্রয়াসী। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পার্থক্য বশতঃ, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিরোধ অনিবার্য। বহু উদারচিত্ত বাঙালী এই পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়ে ইয়োরোপে বাস করছেন। লণ্ডন প্রবাসী পাকিস্তানের বাঙালিরা সেখান থেকেই একটি পত্রিকা প্রকাশ

করেন—রেজেস্ট্রি নম্বরহীন সাইক্লোস্টাইল করা এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে অতি সুলিখিত ও সুচিন্তিত কিছু কিছু প্রবন্ধ থাকে। এমনিই একটি 'ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য' প্রবন্ধে লেখক নিঃসঙ্কোচে লিখেছেন—"একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে আমাদের পূর্বপুরুষ অধিকাংশই শোষিত ও অত্যন্ত নির্যাতিত নিপীড়িত শ্রেণীর হিন্দু ছিলেন।…ফলে আমাদের সংগে হিন্দু সংস্কৃতির একটি বাস্তব যোগা-যোগ বিদ্যমান।" এই অত্যন্ত সহজ এবং নির্ভীক এই উক্তির মধ্যে যে উদার সংস্কারমুক্ত মনের প্রকাশ তা মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও অকল্পনীয় ছিল। পূর্বে এই সত্য বাঙালী মুসলমানের কাছে প্রকাশ হলে হয়তো দেশ ভাগ হত না। পূর্ববাংলার ধর্মকেন্দ্রিক রাজ্যে বসে বাঙালি মুসলমানের এই যে সংস্কারমুক্তি একেই আমি বলি পূর্ববাংলার নব-জাগরণ। এরই প্রতীক্ষায় ছিল বাংলাদেশ। এই জাগরণ বিলম্বিত হল বলেই বাংলাদেশ বিভক্ত হল—কিন্তু উষার অভাস দেখা দিয়েছে —প্রভাতের আশ্বাস এসেছে, কোন ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি দিয়ে যেন সে প্রভাতের প্রতি আমাদের বিশ্বাস না হারাই।

পুরাতন প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গের একটি প্রবন্ধে দেখা যাবে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে অবিভক্ত ভারতের শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে বঙ্গ ভাষার চর্চা ও ভাষাকে অবিকৃত রাখার জন্য, রাজনৈতিক কারণে দ্বিজাতিতত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করবার যে প্রয়াস চলেছিল, তার বিরোধীতা করবার লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু শুধুই কি রাজনৈতিক কারণ, চিন্তা করে দেখলে এর মধ্যে কি মনস্তাত্বিক কারণ কিছুই নেই? আজ যত সহজে আধুনিক নূরুল হক অসঙ্কোচে বলতে পারছেন, "আমাদের পূর্ব পুরুষরা অত্যন্ত নির্যাতিত ও শোষিত শ্রেণীর হিন্দু ছিলেন"—ঐ সত্য তখন এমন করে বলবার মত লোক কমই ছিল—কারণ সমাজের পরিবেশই ছিল পৃথক। রামমোহন যুক্তি-বাদের আলোকের তীব্রতা এত দৃঢ় ছিল না যা ভারতের হিন্দু সমাজের মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট জাতিভেদের মনোবৃত্তিকে একেবারে নষ্ট করতে পারে—। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্বেও 'অন্ত্যজ' জাতি ছিল এবং

উচ্চবর্ণের খুব কম ব্রাহ্মই তপশীল জাতির সংগে সামাজিক বন্ধন স্বীকার করতেন। যে আবহাওয়া তখন দেশে বর্তমান তার মধ্যে 'জবলা পুত্রর' মত 'সত্যকুলজাত' যথার্থ ব্রাহ্মণ হওয়া কঠিন ছিল। যে হীনতা থেকে, অবিচার থেকে, পরিত্রাণ পাবার জন্য দলে দলে লোক হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছিল, তাদের মনে যুক্তি বিচার ও সাম্যবাদের প্রভাব তখনও এতদূর পৌঁছায়নি যে, তারা আবার সেই নির্যাতিত হিন্দুদের পূর্ব সম্পর্ক স্বীকার করবে—যে সম্পর্কে শুধুই জ্বালা ছিল, গৌরব ছিল না। তাই আকৃতি প্রকৃতি ভাষা ও আচারে কোনো সাদৃশ্য না থাকলেও ধর্মান্তরিত মুসলমান নিজেকে আরব সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত করে আত্মবিশ্বাস ও আত্ম সম্মান খুঁজত। আজ জগৎ জুড়ে সাম্যবাদের খোলা বাতাস প্রবাহিত। আজ যুগধর্মের বাণী মানুষকে মানুষরূপেই দেখতে শেখাচ্ছে, আজ নির্যাতিত শ্রেণীই সমাদৃত, আজ মহাপরাক্রম সোভিয়েত দেশের প্রধান ব্যাক্তি সগর্বে বলতে পারেন, "আমি কয়লার-খনির-কুলির ছেলে"। আজকের দিনে তাই সত্যকে স্বীকার করা অনেক সহজ হয়েছে।

ভাষার দ্বিখণ্ডী করণ শুরু হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার জন্য—দ্বিজাতিতত্ত্ব কতগুলি স্বার্থান্বেষী রাজনীতি ব্যবসায়ীর দুষ্ট বুদ্ধির ফসল। আধুনিক শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের প্রসার হল ও যুক্তিবাদের প্রয়োগে, সাম্রাজ্যবাদের আলোতে সত্য প্রকাশিত হল। দ্বিজাতিতত্ব যে মিথ্যার উপর গড়া সে মিথ্যা যখন টিঁকল না তখন বাংলাভাষা বাঙালির আন্তরিক ঐক্যকে প্রকাশ করল। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন তাই ঐক্যের আন্দোলন, ভাঙা হৃদয়কে জোড়া লাগাবার আন্দোলন, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার আন্দোলন। সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলনের মর্ম কথাটি ব্যক্ত হয়েছে। এ কেবলমাত্র পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার শরিকী বিবাদ নয় বা রুজি-রোজগারের ক্ষেত্রে সুবিধা সৃষ্টির দাবী দাওয়ার অধিকারের জন্যই নয়—বস্তুতঃ ভারতে যে সব ভাষা আন্দোলন হচ্ছে তার সংগে এর কোনো মিল নেই। পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে কোন্ ভাষায় পরীক্ষা হবে সেই সবই এর লক্ষ

নয়। পূর্ব বংগের ২১শে ফেব্রুয়ারী হচ্ছে সামগ্র বাঙালীর জীবনে এক ঐক্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। কোনো প্রাদেশিক বুদ্ধির ক্ষুদ্রতা থেকে এদাবী উচ্চারিত নয়। অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকে, বা সাংস্কৃতিক ঐক্যকে ও প্রগতিশীল ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একটি সিম্বল বা চিহ্নরূপে 'বাঙালিত্বকে' সামনে ধরে, এই আন্দোলন। তাই রাষ্ট্র ভাষারূপে বাংলা স্বীকৃতি পেলেও এ আন্দোলন আজও চলেছে। ১৯৬৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীর শহীদ দিবসে উচ্চারিত শপথগুলি লক্ষ্য করলেই একথা স্পষ্ট হবে।—'অমর একুশের শপথ শিরোনামায় প্রতিজ্ঞাগুলি হচ্ছে —

১। সর্বস্তরে বাংলাভাষার প্রচলন করিব।

২। জনগণের মূক মুখে ভাষা দিব।

৩। গণমুক্তি সংগ্রামে শরিক হইব।

৪। দারিদ্র নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়িব।

৫। রাজবন্দীদের মুক্তি আনিব।

৬। সকল গণতন্ত্রকামী একত্র থাকিব।

৭। পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম করিব।

৮। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখিব। সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ হইতে দেশকে মুক্ত রাখিব।

বারবছর পূর্বে যে ভাষা-আন্দোলন বাঙালীত্বকে অর্থাৎ বাঙালীর সংস্কৃতিগত ঐক্যকে চিহ্নরূপে ধরে এগিয়ে চলেছিল আজ তা একটি সর্বাঙ্গীন মুক্তি আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। অতএব এটুকু বোঝা কঠিন নয় যে, রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অনুসারে দ্বিধা বিভক্ত দেশের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক ঐক্যকে স্বীকার না করে, এরই ভিত্তির উপর না দাঁড়িয়ে কোনো মুক্তি আন্দোলন চলতে পারে না। বাঙলা সংস্কৃতিকে তার সমগ্র হিন্দু ঐতিহ্যসহ গ্রহণ না করলে বাঙালি মুসলমানের আশ্রয় থাকে না। সে বায়ুভূত নিরালম্ব হয়ে পড়ে।

বিখ্যাত সাংবাদিক আমেত্মর রহমান এই সেদিন যিনি পাকিস্তান বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেলেন তিনি তো বার বার বলেছেন যে, একদিন

'আমরা ভুলেছিলাম যে আমরা আগে বাঙ্গালি তারপর মুসলমান, আমরা বাঙালিত্বকে মুসলমানত্বর চেয়ে ছোট করে দেখেছিলাম, যে ভুলের সাজা আজ পাচ্ছি।—এই কথাই ভাষা আন্দোলনের মূল কথা। একথা আজ পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত বাঙালি মাত্রই উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করছে। এবং এ কথার ভিতর দিয়ে এক আশ্চর্য সত্য আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, পূর্ববাংলার শিক্ষিত মানুষের মধ্যে আজ সেই যুদ্ধই শুরু হয়েছে যে যুদ্ধ ভারত-কাশ্মীরের রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছে অর্থাৎ দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে, ভেদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের সৌভ্রাত্র্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। বস্তুত পূর্ববঙ্গের এই শুভশক্তির মধ্যে ঐ যুদ্ধের তাৎপর্য আরো গভীর। এক পশ্চাতমুখী ধর্মের জিগির তোলা স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে, ধর্ম নিরপেক্ষতার উদার চিন্তা পূর্ববংগের প্রত্যেকটি কাগজে গত কয়েক বছর ধরে যেভাবে প্রকাশ করে চলেছিল আমাদের শঙ্কা হয় যে বর্তমান সশস্ত্র যুদ্ধের দাপটে তা না দলে মুচড়ে যায়। তার চেয়ে ক্ষতি আর কিছু হতে পারে না। এই সংগে আমাদের একথাও দুঃখের সংগে স্বীকার করতে হয় যে দেশ ভাগের জন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গে হা-হুতা-শের অন্ত না থাকলেও এই সাংস্কৃতিক ঐক্যকে দৃঢ় করার জন্য পশ্চিম-বাংলার লেখক সাংবাদিক ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বলতে গেলে কিছুই চেষ্টা করেননি।

আমরা পূর্ববঙ্গের এই নব জাগরণ সম্বন্ধে কোনো সংবাদই রাখিনি। আমাদের জনসাধারণের মনে সেই প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের মুসলিম লীগের চরিত্রই সমগ্র পাকিস্তানে চিরস্থায়ী চিত্র হয়ে রয়েছে। আজ যে পূর্বপাকিস্থানের বাঙ্গালি মুসলমান, হয়ত বা পশ্চিম পাকিস্থানের বাঙ্গালির চেয়েও বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্যকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে চাইছে, সে সত্য আমাদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। ক'জন জানেন যে পূর্বপাকিস্তানে মহাসমারোহে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মোৎসব হয়, আচার্য পি সি রায়ের জন্মোৎসব হয়—বরিশালের ব্রজ-মোহন কলেজকে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রতীক 'অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতিপূত স্থান' বলে উল্লেখ করা হয়। বস্তুত বাংলার অতীতকে

হিন্দু বাংলা ও মুসলমান বাংলা রূপে দেখার অভ্যাস আজও পশ্চিমবঙ্গে যতখানি বর্তমান তা পূর্ববঙ্গে নয়।

সূর্য সেন প্রভৃতি শহীদদের পূর্ববঙ্গবাসী মুসলমানগণ পূর্বসূরী বলেই গ্রহণ করে ও নিজেদের তাদের উত্তরাধিকারী মনে করে। পূর্ব পাকিস্থানে প্রকাশিত সূর্য সেনের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে লেখা একটি প্রবন্ধের শেষ লাইনটি লক্ষণীয়—"একত্রিশ বছর আগেকার চাটগাঁ কারাগারের বারোই জানুয়ারীর প্রভাত, যেদিন সূর্য সেনের ফাঁসী হয়; স্বাধীন পাকিস্তানের প্রতিটি নর-নারীর চেতনায় চির জাগ্রত।" কারণ কি? একটি কবিতায় বলা হচ্ছে—

"হে বিপ্লবী বন্ধু বীর······
তোমাদের প্রতিশ্রুতি আমাদের রক্তে দেয় দোলা—
তোমাদের নিঃশঙ্ক মৃত্যু আমাদের উদ্বোধিত করে
বাঁচবার স্বাধীনতা, জনতার মুক্তি এনে দিতে···"

এ'রকম অজস্র উদাহরণ দিয়ে একথা প্রমাণ করা যায় যে, ভাষা আন্দোলনকে অবলম্বন করে যে জাতীয় ঐক্যের স্বপ্ন বাঙ্গালী মুসলমান দেখেছিল আজ তার প্রভাব সেই আশু-কর্তব্যকে ছাড়িয়ে বহুদূর ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। তা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনেরই একটি দৃপ্ত রূপ। বুদ্ধির মুক্তির প্রথম সর্তই এই যে—সাম্যে বিশ্বাস, মানবতায় বিশ্বাস, যুগে যুগে নানা সাময়িক কারণে, সামায়িক স্বার্থে তৈরী বেড়াগুলি ভেঙে ভেঙে সত্যের দিকে পৌছান—সে সত্য এই যে মানুষ মূলত এক জাতি; ধর্ম বর্ণ সমস্ত গণ্ডী পার হয়ে মানব সত্ত্বা একটি পরম ঐক্যে গ্রথিত। কবির কথায়—সবার উপরে মানুষ সত্য। সেই সত্যকে যে স্বীকার করেছে, জেনেছে, ভেদের বিরুদ্ধে সে তো লড়বেই—অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তো রুখে দাঁড়াবেই—এই জন্যই ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় এই বীর যুবকরা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলঃ পূর্বপাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও—পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল শক্তি রুখিয়া দাঁড়াতে চায় ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, পশ্চাতমুখী প্রতিক্রীয়াশীল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে, এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের অর্থনৈতিক ব্যবধানের বিরুদ্ধে। একটি

পত্রিকা লিখেছে "পূর্ব পাকিস্থান আজ পশ্চিম পাকিস্থানের অর্থলোলুপ স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন এই হচ্ছে বাস্তব।" পূর্ববাংলার এই যুগ চেতনার অভ্যু-দয়ের খবর পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের কাছে তেমন করে পৌছয়নি বলেই ১৯৬৪ সালের কলকাতা ও রাউরকেল্লার লজ্জাজনক ঘটনা ঘটতে পারল ও শিক্ষিত মানুষরাও তাকে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে মনে করল।

পাকিস্তান সরকারের নীতিই ভেদের নীতি, ভারত বিদ্বেষের উপরই তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এটা আশ্চর্য নয় যে, সেখানকার সরকার নিজে-দের তাঁবেদার মূর্খ ও স্বার্থান্বেষী কিছু লোক দিয়ে বরাবরই দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগাবে ও বিদ্বেষের প্রচার করবে। কিন্তু আমাদের ভারতীয় সংবিধানের নীতি ধর্ম নিরপ্রেক্ষতা ও গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে জাতিবিদ্বে-ষের কোনো ইন্ধন নেই। ভারতীয়ের পক্ষে তাই পাকিস্তান ও পাকি-স্তানের জনগণকে একই পর্যায়ভুক্ত করে দেখা উচিত ছিল না। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের এই নব অভ্যুদয়ের খবরও পশ্চিমবাংলার ওয়াকিবহাল মহলের অর্থাৎ রাজনীতিবিদ্ ও সাংবাদিকদের না জানবার কথা নয় কারণ এ সমস্ত সংবাদপত্রই কলকাতার বাজারে এসে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এ সম্বন্ধে কোনো খবরই পশ্চিমবঙ্গের পত্রপত্রি-কায় আলোচিত, সমর্থিত বা অভিনন্দিত হয়নি—উপরন্তু ১৯৬৪ সালে যে সাম্প্রদায়িকতার উত্তুঙ্গ ঢেউ উঠেছিল তাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতি-শীল বাঙ্গালীর বিশেষ ভূমিকার সংগে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে পরিচয় করান হয়নি। মনে হয় এ দেশের প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি প্রেস সভয়ে ও-প্রসঙ্গকে চাপা দিয়েছিল যেমন করে তারা বরাবর ভিয়েৎনাম প্রসঙ্গও এড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ পুঁজিবাদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগবার সম্ভাবনার ভয়েই দেশের পাশেই এক ভাষাভাষী আর একটি রাষ্ট্রে আমাদের জাতি ভাইদের মধ্যে এই শুভচিন্তার উদ্বোধনকে তারা চাপা দিতে ও সাম্প্রদায়িকতার হুঙ্কার তুলে লুপ্ত করে দিতেই চেয়েছিল। এই কাজ আসলে আয়ুব সরকারের মিত্রতা, এতে তারা পাকিস্তানের

জনগণের প্রতিকূলে জঙ্গী সরকারের সহায়ক হয়েছিল।

গত বছর অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসারণের কাজে নিযুক্ত হবার ফলে পূর্ববঙ্গের এই শুভ শক্তির প্রতি আমাদের সবিস্ময় শ্রদ্ধা উত্থিত হয়েছে।

সম্প্রীতির কাজে নিয়োজিত 'নবজাতক' সামান্য কয়েক সংখ্যা পূর্ববঙ্গে পৌঁছলে সেখানকার বহু মানুষের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আশাতীত অভিনন্দন পেয়েছিলাম। খবরের কাগজের মারফৎ খোলা-খুলিভাবে ভারতের সংগে যোগাযোগ থাকলে রাজরোষে পড়বার সম্ভাবনা খুবই। সেজন্য পত্র-পত্রিকার মালিকরা অনেকে আমাদের দপ্তরে বিনামূল্যে কাগজ পাঠিয়ে দিয়েই সহযোগিতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠিগুলির মধ্যে সুস্থ চিন্তার সুবাতাসে বার বার আমাদের ভাতৃবিরোধে ক্লান্ত তপ্ত হৃদয় জুড়িয়ে গিয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের এই প্রগতি আন্দোলনের সম্বন্ধে একটা কথা স্পষ্ট করে মনে রাখা দরকার যে রাজনৈতিকভাবে বঙ্গকে যুক্ত করার উদ্দেশ্য এই নব অভ্যুত্থানের ভিতরের কথা নয়। তাছাড়া তারা যে ভারত সরকারের অনুরাগী তাও নয়, অনেক ক্ষেত্রে তারা স্পষ্টই ভারতে কায়েমীস্বার্থের প্রভাবের জন্য ভারত সরকারকেই দায়ী করে। কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা যাই হোক না কেন সম্প্রীতি সদ্ভাব একই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারই কাম্য বিষয়।

আজকে স্পষ্টতই রাজনৈতিক স্বার্থে পূর্ব বাঙলার এই অসাম্প্রদায়িক প্রীতিপ্রার্থী জনগণের পরিচয় এ দেশের পত্রপত্রিকায় স্থান পাচ্ছে, অভিনন্দন জানান হচ্ছে। বিলম্ব হলেও এ কাজ ভালো কিন্তু এতে স্বার্থের আঁশটে গন্ধ লেগে আছে তাই যে প্রীতিলতা শুকিয়ে গেছে তাতে এ সুগন্ধি ফুল ফোটাতে পারবে না। পরন্তু এ চেষ্টাকে উস্কানী-মূলক ও স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস রূপে মনে হতে পারে। সুযোগ ও সুবিধা মত ভাইকে ভালোবাসব এটা কোনো উঁচু দরের কথা নয় এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বহু পুরোনো উক্তি উল্লেখ করছি—

হিন্দু মুসলমান এক হইলে পরস্পরের কত সুবিধা একদিন কোনো

সভায় মুসলমান শ্রোতাদিগকে তাহাই বুঝাইয়া বলা হইতেছিল। তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারি নাই যে, সুবিধাটার কথা এস্থলে মুখে আনিবার নহে; দুই ভাই একত্র হইয়া থাকিলে বিষয় কর্ম ভালো চলে কিন্তু সেইটাই দুই ভাই একত্র থাকিবার প্রধান হেতু হওয়া উচিত নহে। আসল কথা আমরা এক দেশে (এখন এক দেশ না হলেও এ সত্য বদলায়নি) এক সুখ দুঃখের মধ্যে বাস করি, আমরা মানুষ, আমরা যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম। উভয়েই এক দেশের সন্তান আমরা, ঈশ্বর কৃত সেই ধর্মের বন্ধনবশতঃ শুধু সুবিধা নহে অসুবিধাও একত্র ভোগ করতে যদি প্রস্তুত না হই তবে আমাদের মনুষ্যত্বে ধিক।

প্রায় ষাট বছর আগে লেখা এ কথার সত্যতা বর্তমান অবস্থায়ও অনুধাবন যোগ্য।

মানুষ যা কিছু করবে তা মানুষের জন্য হওয়া চাই। মানুষের সমাজের উন্নতির জন্য, সুবিধা এবং অসুবিধা, সুখ বা দুঃখ, নিন্দা বা প্রশংসা কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে এগিয়ে চলাই প্রকৃত ধর্মের পথ, সুবিধার চর্চা সে পথের ঠিকানা জানে না।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ধর্ম সঙ্গম

সমগ্র বঙ্গ সংস্কৃতির এক রূপ ও ভাব—দেশ ভাগ হবার ফলে সে কথা সর্বদা স্মরণ থাকে না। কিন্তু এ সত্য স্মরণীয়। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছিলেন প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে যেন হিন্দু ও মুসলমানী কথা গলা-গলিভাবে মিশিয়া আছে। যে কেহ প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনিই এ কথা জানেন, জানেন ডাঃ শহীদুল্লাহ ও আজকের পাকিস্তানের বঙ্গ ভাষা সেবীরা অনেকেই।

অথচ এই সত্য পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্‌কালে রাজনৈতিক ঘূর্ণীঝড়ে একেবারে ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতে বসেছিল। কৃত্রিম বিচ্ছেদ ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে কাঁটা বুনতে শুরু করেছিল। কারণ বাংলা দেশের প্রাণ রূপকথার কৌটার মধ্যে ভ্রমরার মত সাহিত্যের মধ্যেই বেঁচে আছে—তাই যখন দেশকে ভাগ করারার জন্যে দ্বিজাতি তত্ত্বের অবতারণা করা হল তখন প্রথম আঘাতটিই পড়ল ভাষা ও সাহিত্যের উপর। এবারও দেখলাম পাক্ ভারত যুদ্ধের শুরুতেই সেই পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ, নজরুলের গানের বিকৃতি সাধন—এই সব রাজনীতি ব্যবসায়ীদের কুকীর্তি। আজকের পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মনের উপর এসব কোনো দাগ কাটতে পারেনি। কারণ রাজনৈতিক তর্কা-তর্কি পার হয়ে পূর্ববঙ্গের সাহিত্য আজ যে দিকে চলেছে, সে মিলনের পথ—ভাঙ্গা মন জোড়া লাগাবার পথ। বস্তুত সাহিত্যের সেইতো কাজ, সাহিত্যের আনন্দযজ্ঞে মিলনেরই নিমন্ত্রণ।

হিন্দু মুসলমানের মিলিত রচনা এই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে মুসলমানের দান যে কত ব্যাপক ও গভীর তা সেই দ্বন্দ্বমুখর প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে বসে দীনেশ সেন মহাশয় বিস্তারিত করে লিখেছিলেন।

ব্রাহ্মণদের কুক্ষীগত সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ সাহিত্য যখন ছিল সাধারণের অগম্য, তখন রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদি মুসলমান রাজাদের আদেশেই বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। রাজা জানতে চান

প্রজার সংস্কৃতি ও জীবন—মাঝখানে আছে ব্যাকরণ কণ্ঠকিত সংস্কৃত। এই কাজে 'সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক' বিশেষ সচেষ্ট হয়েছিলেন। তার পূর্বে বাংলা ছিল অশিক্ষিত চাষা-ভূষোর ভাষা, এ ভাষায় কোন সংগ্রহ রচিত হওয়াই নিষিদ্ধ।

অষ্টাদশ পুরাণাদি
রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা
রৌরবং নরকং ব্রজেৎ—

অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত যারা চলতি ভাষায় শুনবে তারা রৌরব নরকে যাবে। ব্রাহ্মণদের অচলায়তন থেকে উদ্ধার করে চলিত জীবন সংগ্রামে সাহিত্যের রস সঞ্চার করে তাকে ঐশ্বর্যপূর্ণ করে তুলেছিলেন মুসলমান রাজন্যবর্গ। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন—মুসলমান রাজ-রাজরারা যে রীতি প্রবর্তন করেন তাহা ব্রাহ্মণগণের শত নিষেধ বিধি উপেক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া প্রচলিত হইয়াছিল। শাহেন শা বাদশা-গণ যাহা করিলেন ছোট হিন্দু রাজন্যবর্গ তাহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন।···মুসলমানগণ এই ভাবে বঙ্গ দেশে বাঙ্গলা ভাষাকে সুপ্রতি-ষ্ঠিত করিয়া আমাদের সাহিত্যে এক নূতন যুগ সূচনা করিলেন। শুধু তাহাই নহে তাঁদের প্রভাব আমাদের ভাষার বক্ষে আরবী ফার্সীর ভৃগুপদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল। অর্থাৎ বিদেশী বহু শব্দ বাঙলার মধ্যে যুক্ত হয়ে ভাষাকে সমৃদ্ধ করল। এই সময়ে পল্লী জীবনের বহু কাহিনী হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের কবিদের রচিত গানে-পাঁচালিতে মেশামেশি হয়ে গেছে। বাংলাদেশের পল্লীসঙ্গীত মুসলমান কৃষকের অতুলনীয় সম্পদ। অতুলনীয় সম্পদ তার ভাটিয়াল ও তার বাউলের জীবন দর্শন—যা সুরে ছন্দে বাণীতে গভীর তাৎপর্যময়। এই রসের জগতে হিন্দু মুসলমান একত্র মেশামেশি করে বহুযুগ ধরে বাস করেছে —একজন অপরের পুরাণ ইতিহাস ও ধর্মকাহিনী থেকে প্রেরণা ও আনন্দ পেয়েছে।

কেতকা দাস প্রণীত বিখ্যাত মনসামঙ্গলে লেখা আছে যে—

লক্ষীন্দরের শয্যাপার্শ্বে রক্ষা কবচের সঙ্গে একখানি মানসা মঙ্গল ও একখানি কোরাণ শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষিত হয়েছিল। মুসলমানদের রচিত বহু কাব্যে হিন্দুদের দেবীর বর্ণনা, কালীসঙ্গীত, পীর ও সন্ন্যাসী উভয়ের বন্দনা আছে। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানী কথা গলা-গলিভাবে মিশে আছে। পরস্পরের আমোদে প্রমোদে, উৎসবে আনন্দে জীবন থেকে জীবনে রস সঞ্চার করে ভেসে চলেছে পল্লীজীবন।

এই জীবন থেকে রস ও মাধুরী আহরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পতিসর সাজাদপুরের গ্রামে গ্রামে পদ্মার বুকে ভাসমান পদ্মাতরণীতে রবীন্দ্রনাথের সদ্যোদ্ভিন্ন আশ্চর্য যৌবনের অনেকগুলি দিন কেটেছিল। সেই সময় বাঙলা দেশের গ্রাম তার স্রোতস্বিনী নদীর কলস্বরে রবীন্দ্র-নাথের জীবন ধ্বনিকে সুরে ভরে দিয়েছে। পল্লীসাহিত্য পল্লীসঙ্গীত বিশেষ করে বাউল সাধক—যারা মুসলমান হয়েও কোনো সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে বদ্ধ নয়—তাদের মধ্যে মানবধর্মের যে পরিণতি রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, তা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। শুধু বাউলের সুর নয় তার তত্ত্ব, তার বাণী রবীন্দ্রকাব্যে নূতন মহিমাময় রূপে প্রকাশ পেয়েছে—বাউল গানের ভাষা ও কতকগুলি শব্দ রবীন্দ্রকাব্যে বিশেষ পরিচিতি পেয়েছে যেমন—'অরূপ', 'অরূপ রতন', 'অধরা' এমন কি তাঁর জীবনদেবতার কল্পনা, তাঁর সীমা অসীমের তত্ত্বও অনেকখানি এই সব গ্রাম্য সাধকদের কাব্য থেকে নূতন ভাবে উৎসারিত হয়েছে।

তিনি লিখছেন—এ দেশের অধিকাংশ মুসলমান বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্মগত জাতিতে মুসলমান। দেশ তাই উভয়েরই কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্ম নিয়ে কি ঘোরতর বিরুদ্ধতা মাঝে মাঝে উত্তাল হয়ে ওঠে। ভারত বর্ষের ইতিহাসে এই বিরুদ্ধতার সমন্বয় সাধনাই এক পরমাশ্চর্য শক্তি যা বহু মহাত্মার জীবনের মধ্যে প্রকাশ হয়েছে। যে সব উদার চিত্তে হিন্দু মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হতে পেরেছে সেই সব চিত্তে সেই ধর্ম সংগমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানসতীর্থ স্থাপিত হয়েছে। রামানন্দ কবির দাদু রবীদাস প্রভৃতির ধর্মীয় সাধনার মধ্যে এই মিলনের একটা রূপ চিরবহমান লোকসাহিত্যে ও লোকসংগীতে। এখানে

হিন্দু মুসলমানের সুর মিলেছে গলায় গলায় প্রাণে প্রাণে—,অথচ এক দিন ধর্ম রক্ষকদের উদ্যত দণ্ড উঠেছিল এই প্রাণের জিনিষকে ধ্বংস করে—দ্বিজাতিতত্ত্ব স্থাপিত করবার জন্য—তাদের যে প্রয়াসকে লক্ষ্য করে দীনেশচন্দ্র বলেছেন—"যাঁহারা বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষা এদেশে প্রচলনের প্রয়াসী তাঁহারা কৃতকার্য হইবেন না। শুনিয়াছি মুসলমান কৃষকেরা যাহাতে আর পালা গান না গায় বাংলার পল্লীতে মোল্লারা তাহার চেষ্টা করিতেছেন।"

এই কুকীর্তির বেদনাদায়ক ইতিহাস দেশ ভাগে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করল—তারপরে পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য পূর্ববঙ্গের অবস্থা বিপর্যয় সম্বন্ধে একরকম উদাসীন হয়ে রইল—পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ব বঙ্গের সূত্র হল ক্ষীণ। যে ভয়ানক তিক্ততার মধ্যে দেশ ভাগ হল তারই ফলে এদেশের মানুষ সে দেশের জনজীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সম্বন্ধে হল উদাসীন—আমাদের কাছে সমগ্র পাকিস্তানই এক ভয়াবহ বস্তু হয়ে রইল—তার জনজীবনে নিগূঢ়ভাবে এই উপ-মহাদেশের মিলন সাধনা আজ কোন্ ভাবে বিকশিত হচ্ছে, কোন্ পরিণতির দিকে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে আমরা ছিলাম অজ্ঞ। আমাদের পত্র-পত্রিকা ওদিকের কোন সংবাদই এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেনি। কলহের দিকটাই উচ্চ কলোরোলে রাজনৈতিক সংঘাত সৃষ্টি করার কাজে লাগান হয়েছে—ফলে শিক্ষিত লোকেরও মন বিষিয়ে গেছে—সাম্প্রদায়িকতার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলেছে।

১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাঙালীর ঐতিহ্যকে, তার গৌরবময় ইতিহাসকে, ফিরে পাবার আন্দোলন। এই আন্দোলনের নির্দয় আঘাতে বাঙ্গালী মুসলমানের চিত্তে সত্যের প্রকাশ স্বচ্ছন্দ হল। হিন্দুর সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ স্বীকারে রইল না কোনো লজ্জা বা শঙ্কা—নূরুল হক লিখছেন—ভাষার দ্বিখণ্ডীকরণ শুরু হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠি করবার জন্য, দ্বিজাতিতত্ত্ব মিথ্যার উপর গড়া কতগুলি স্বার্থান্বেষী রাজনীতি ব্যবসায়ীর দুষ্টবুদ্ধির ফসল।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করবার চেষ্টাতেই পূর্ব-

বঙ্গের বাঙ্গালীর মনে এক সর্বহারা ভাব এসে পড়ল। ইতিহাস হারা এক ছিন্নমূল জাতি সৃষ্টি করার এই চক্রান্তকে রুখবার চেষ্টাই তার ভাষা আন্দোলনের মূল। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন তাই ঐক্যের আন্দোলন, ভাঙ্গা হৃদয়কে জোড়া লাগাবার আন্দোলন; সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার আন্দোলন। এ কেবলমাত্র পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার শরিকী বিবাদ নয় বা রুজি রোজগারের ক্ষেত্রে সুবিধা সৃষ্টির, দাবীদাওয়ার, অধিকারের জন্যই মাত্র নয় বা কোনো প্রাদেশিক বুদ্ধির ক্ষুদ্রতা থেকেও এ দাবী উচ্চারিত নয়। অসম্প্রদায়িক উদার মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা, সাংস্কৃতিক ঐক্যকে ও প্রগতিশীল ভাবধারাকে প্রচার করার জন্য একটি সিম্‌বল বা চিহ্নরূপে বাঙ্গালীত্বকে সামনে ধরে এই আন্দোলন—তাই রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলা স্বীকৃতি পেলেও এ আন্দোলন আজও চলেছে। কারণ বঙ্গ সংস্কৃতির গভীরতর ঐক্যকে এখনও বহু মানুষ উপলব্ধি করতে হয়ত পারেনি। এখনও এ সত্যের ব্যাপক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলেছে যে, আগে আমরা বাঙ্গালি তারপর হিন্দু বা মুসলমান। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ৺আমেদুর রহমান লিখছেন—"পাকিস্তান আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি খুঁজতে গিয়ে অনেকে অনেক কথাই বলেছেন, আজও সমানে বলে চলেছেন। সবগুলো একত্রিত করে মিলিয়ে জড়ো করলে দেখা যাবে একটা প্রকাণ্ড 'না' ক্রমশই প্রকাণ্ডতর হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত পরবর্তীকালে পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকারের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত জনৈক প্রবীন ব্যক্তির সঙ্গে সান্ধ্য আলোচনার এক খণ্ডাংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না—

"সেদিনকার সেন্টিমেন্ট তোমরা বুঝতে পারবে না। মুখে এক রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে তিনি বললেন,—'জানো আমরা ডিম ছেড়ে আণ্ডা খেতে আরম্ভ করেছিলাম'। সকৌতুকে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে তিনি সহাস্য বদনে বললেন,—'আমরা ডিম, ছেড়ে আণ্ডা খেতে আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু তাতে পার্থক্যটা কোথায়? হাসিটা আরো প্রশান্ততর করে তিনি বলেছিলেন, 'সেই তো মজা, সেটাই তো তোমরা বুঝতে

পারবে না—হিন্দুরা ডিমকে ডিম বলে অতএব আমরা ডিম খেতে পারি না, আমরা খাবো আণ্ডা—এই ডিম এবং আণ্ডার লড়াইই নাকি বস্তুত পাকিস্তানে আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তি। কথাটা হাস্যকর হলেও হাসবার মত যে নয় একটু ভেবে দেখলেই তা আমরা অনুধাবন করতে পারব। একটা উত্তুঙ্গ 'না' কে সামনে রেখে রাজনৈতিক আন্দোলন হয়ত চালানো যায়। ঘটনাচক্রে তাতে সাফল্য লাভও হয়ত হতে পারে,—কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'না' ব্যাপারটা বলতে গেলে সর্বঘাতি, অথচ, উত্তর-স্বাধীনতার রাজনৈতিক কারণে উক্ত 'না'-টাই পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনাবশ্যক রকম বড় হয়ে উঠল। আমরা দেখলাম এটাতে 'না', ওটাতে 'না,। সর্বত্র কেবল 'না,' 'না', 'না'। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা যাবে না। বাংলা ভাষায় রচনা কালে যথেষ্ট বাংলা শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কবি নন। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা যাবে না ইত্যাদি শত প্রকার 'না' আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে চারিদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ালো। যুক্তিটা হল—এই রকম 'না' এর প্রাচীর খাড়া না করলে আমাদের শিশু রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ব্যা[illegible]ক শত্রুতার কবল থেকে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না। এই 'না' এর দ্বারা কে রক্ষা পেল তা প্রণিধানের অবসর না হলেও এটা বোঝা গেল যে ওতে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঘটলো মরণদশা।"

সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে জাতীর স্বকীয়তা অবশ্যই প্রকাশ পাবে। তাই বলে তা গণ্ডীবদ্ধ অচলায়তন ছাড়া অন্য কিছুতেই হবে না এমন নয়। বরঞ্চ নির্বাধ প্রবহমানতা থেকেই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে—এবং তা থেকেই উদ্ভব ঘটে জাতীয় স্বকীয়তার।

রাজনৈতিক কারণে ভৌগোলিক সীমানা বারে বারেই নূতন করে নির্দ্ধারিত হতে পারে। জাতির সংজ্ঞাতেও পরিবর্তন আসা অসম্ভব নয়। কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতির সীমানা ও সংজ্ঞা ওভাবে নির্দ্ধারিত হওয়া সম্ভব নয়।

এই চেষ্টা বারবার হামলার আকারে নেমে এল পূর্ব পাকিস্তানের

সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর। ভাষার উপর আক্রমণ, বাংলা হরফের উপর আক্রমণ। বাংলা ভাষার 'পৌত্তলিক' হরফ বদলে দিয়ে রোমান কিংবা আরবী হরফের প্রবর্তনের পবিত্র চেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে কুৎসিত প্রচার, রবীন্দ্রনাথকে বিসর্জন দেবার চেষ্টা, এমন কি নজরুলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, যুক্ত বাংলার জুজুর ভয় প্রদর্শন, লেখক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবিদের নিন্দা, তাদের দেশপ্রেমে সন্দেহ প্রকাশ, তাদের পিছনে গোয়েন্দা নিয়োগ এবং তাদের উপর নানা রকম নির্যাতন চলতে লাগল। অন্যদিকে সরকারী নির্দেশ বলে পূর্বপাকিস্তানের সংস্কৃতির রূপ নিরূপণ ও গতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হল প্রচুর।

সরকারী দফ্তরে তার নীল নক্শা তৈরী হল। আর সরকারী পোষিত সংস্থার সাহায্যে তা কার্যকরী করার চেষ্টাও হল বিস্তর। আজও সে চেষ্টার বিরাম নেই। এসব চেষ্টার উদ্দেশ্য একটাই।

সেটা হচ্ছে মানুষের চিন্তা-ভাবনার শক্তিকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে একদিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। যারা স্বেচ্ছায় কিংবা প্রাপ্তি যোগের লোভে সে পথ অনুসরণ করলেন তাঁরা প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হলেন যাঁরা তা করতে পারলেন না তাঁরা হলেন সন্দেহের পাত্র। ওতে এক শ্রেণীর পোষা লেখক তৈরী হয়ে উঠল এবং পোষকের কৃপায় দিন দিন তারা নাদুশ-নুদুশও হয়ে উঠলেন ঠিকই কিন্তু পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্যের দৈন্য দশা ঘুচল না। কেননা সরকারী সংস্থার সাবসিডির দ্বারা আর যাই হোক কোনো উচুমানের সাহিত্য হতে পারে না।"

আমেদুর রহমনের এই সুচিন্তিত বক্তব্যের মধ্যে পূর্বপাকিস্তানের সাহিত্য ক্ষেত্রে যে দ্বন্দ্বের ছবিটি স্পষ্ট হয়েছে সেটি আমাদের কাছে অপরিচিত নয়।

এই ভারতেও সরকারী পোষণে বা পত্রিকাদির পৃষ্ঠপোষকতায় নানা পদলেহী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে—সবরকম গতিশীল আন্দোলনের বিরোধীতা করাই যাদের উদ্দেশ্য।

বড় বড় কথার মুখোশ পরে লেখক ও শিল্পীর 'স্বাধীনতা' রক্ষা করার অছিলায় দেশের মধ্যে কায়েমী স্বার্থের পোষণ করাই সেই সব সাংবাদিক

ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কাজ। যা এতদিন নির্বাধে চলেছে।

এ অবস্থায় পেশাদার ও সরকারের বশংবদ সাহিত্যিকরা সাহিত্যের নবদিগন্ত উন্মোচন করতে বা সত্যাশ্রয়ী হতে পারে না বলেই অবক্ষয়ের পথ ধরে। এ বিষয়ে পশ্চিম বা পূর্ব বাঙলার মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। সেখানে কিছু কিছু সাহিত্যিক ও পত্রপত্রিকা সরকারী স্বার্থের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা থাকলেও বেশির ভাগ জনপ্রিয় সংবাদপত্র প্রভৃতি এই পশ্চাৎমুখী মনোভাবের বিরোধী। ভীতি প্রদর্শন শাসন বা প্রলোভন কোনো কিছুর দ্বারাই তাদের বিচলিত করা যায়নি। ইত্তেফাকের সম্পাদক জেলে গিয়েছেন, পুলিশ তাঁদের তাড়া করে ফিরেছে তা সত্ত্বেও তাদের পত্রপত্রিকা সংবাদ চালিয়ে চলেছে।

ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখলে আমরা জানি সরকারী পোষণ ও তোষণের লাঞ্ছনাই সাহিত্যের প্রেরণাকে জাগিয়ে তোলে। আঘাতের সংঘাতেই সচেতন সক্রিয় চিত্তে সৃষ্টির বিকাশ হয় পূর্ণতর। ইংরেজ শাসন ও ভ্রূকুটি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের রচনা প্রবাহকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

এমন কি জারের কঠিন শাসনেও রাশিয়ার বড় বড় সাহিত্যিকদের কলম কম্পিত হয়নি। বাধার আঘাতে তাদের স্পর্দ্ধা আরো বেড়েই গেছে। পশ্চিমবঙ্গেও স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন এমন লেখকের সংখ্যা কম তা বলি না। কিন্তু সংবাদপত্র ও বহু প্রচলিত পত্রপত্রিকাগুলি সবই প্রায় কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা থাকায় সে সব লেখকদের স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের কোনো পথ থাকে না। দেশের জনসাধারণের কাছে তাদের মতামত পৌঁছায় না।

অপরপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আজ এই সুযোগ সন্ধানী রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীদের বিষাক্ত চক্র থেকে মুক্তির আন্দোলনে সঙ্গে পেয়েছে বেশির ভাগ সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদেরও। এই কারণে পূর্ববঙ্গের পত্রপত্রিকা বিশেষভাবে অভিনন্দন যোগ্য।

এই কারণে আজ সেখানে সমস্ত দেশের মধ্যে একটি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা স্পন্দিত হচ্ছে, যেমন হয়েছিল স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে ভারতের স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে।

সেকালের সেই স্বাধীনতা যুদ্ধে লক্ষ্য ছিল প্রধানত একটি দিকেই —সে হচ্ছে ইংরেজ বিতাড়ন। কিন্তু আরো যে শত শত বন্ধন সমগ্র জাতির প্রাণশক্তিকে সহস্র বন্ধনে বেঁধে রেখেছে সেদিকে দৃষ্টি তেমন জাগ্রত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বারবার সেকথা বলেও আমাদের সচেতন করতে পারেননি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমাদের তাই এক আত্মসন্তুষ্ট তৃপ্তি আচ্ছন্ন করে। যার সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্বেষীরা তাদের শক্তি সম্পদ ভাগ-বাঁটওয়ারার কাজেই লাগাল কিন্তু চিন্তার জগতে অগ্রসরতাও তেমন দেখা গেল না।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন এবং সংগ্রাম তাই কেবল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী মাত্র নয়, এ এক পশ্চাৎমুখী ধর্মের জিগির তোলা স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, অন্ধ গোঁড়ামী, জাতি বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে উদার মানবতাকে প্রকাশ করার আন্দোলন। নূরুল হকের মতে এ হল বাঁচার আন্দোলন—

আমরা এতদিন পূর্ববঙ্গের বাঙালী মুসলমানের এই নবজাগরণের কোনো সংবাদই রাখিনি। আমাদের জনসাধারণের মনে সেই প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের মুসলিম লীগের চিত্রিত চিত্রই সমগ্র পাকিস্তানের চিরস্থায়ী চিত্র হয়ে রয়েছে। আজ যে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান হয়ত বা পশ্চিম বাঙলার বাঙালীর চেয়েও বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক ঐক্যকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে চাইছে সে সত্য আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

ক'জন জানেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে সমারোহে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মোৎসব হয়? আচার্য পি সি রায়ের জন্মোৎসব হয়, বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ বা শিক্ষা সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রতীক অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতিপুতঃ স্থান বলে উল্লেখ করা হয়, এঁদের সকলকেই আজ বাঙালী মুসলমান পূর্বসূরী বলে গ্রহণ করেছে। সূর্য সেন প্রভৃতি শহীদ-দেরও তারা সেই চোখেই দেখে, ও নিজেদের তাঁদের উত্তরাধিকারী বলে মনে করে। সূর্য সেনের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে লেখা একটি প্রবন্ধে বলা হচ্ছে—"একত্রিশ বছর আগেকার চাঁটগা কারাগারের বারোই জানুয়ারীর প্রভাত, যেদিন সূর্য সেনের ফাঁসী হয় সে দিনটি স্বাধীন

পাকিস্তানের প্রতিটি নরনারীর চেতনায় চির জাগ্রত হয়ে আছে—

একটি কবিতায় বলা হচ্ছে—

'হে বিপ্লবী বন্ধু বীর
তোমাদের প্রতিশ্রুতি
আমাদের রক্তে দেয় দোলা—
তোমাদের নিঃশব্দ মৃত্যু আমাদের
উদ্বোধিত করে—বাঁচার স্বাধীনতা
জনতার মুক্তি এনে দিতে।'

এইসব কবিতা ও পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ পড়লে স্বাধীনতা-পূর্ব অভঙ্গ বাংলাদেশের আবেগময়তার কথা মনে পড়ে। যখন আত্মত্যাগের, প্রাণ বিসর্জনের সঙ্গীতে বাঙালীর মনপ্রাণ ধ্বনিত হচ্ছিল।···যে সময়ে—

'বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার,
কারাগার করে অভ্যর্থনা—'

ওদের আজকালকার কবিতা, 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই' পড়লেও আমাদের এমনি ভালো লাগে।—

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক সংযোগের প্রধান সেতু হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা সেখানকার জনমনে নানাভাবে কাজ করছে যদিও সরকারী তরফ এ বিষয়ে যথেষ্ট বিধিনিষেধ আরোপে সচেষ্ট তবু তা কার্যকরী হয়নি। রবীন্দ্রসঙ্গীত রেডিও পাকিস্তানে নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু সে নিষেধ তুলে নিতে হয়েছে। পূর্ব বাঙলার রবীন্দ্র জন্ম দিবসের উৎসবগুলি অনেকটা পশ্চিমেরই মত। নৃত্যগীতানুষ্ঠানে যে মুসলিম মেয়েরা এরকম উৎসাহী এর একটা বড় তাৎপর্য আছে। ইসলাম সঙ্গীত বিরোধী—নৃত্যের তো বটেই। পশ্চিম ভারতে এখনও বোরখার প্রভাব কম নয়। সে অবস্থায় বাঙালী মুসলিম মেয়েরা আজ যে রবীন্দ্র প্রদর্শিত নৃত্যগীতানুষ্ঠানে পারদর্শী হয়ে উঠেছে এ বড় কম কথা নয়। এ একটা নিঃশব্দ বিপ্লব। মুসলিমরা অন্য জাতি তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি হিন্দু সংস্পর্শে বিকৃত হয়ে যাবে এই ধূয়ো যে সব প্রাচীনপন্থী মোল্লা শাসিত গোঁড়া এবং মূঢ়

মানুষেরা বিশ্বাস করেছিল আজ তারা কি সে দেশে নেই? নিশ্চয় আছে। এবং হয়ত সংখ্যায় তারাই ভারি। কিন্তু তাদের মুখের উপর তুড়ি মেরে নবযৌবন তার মুক্তির দৃপ্ত পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। সে আর ইসলামের গণ্ডি, সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি, মোল্লা তন্ত্রের বন্ধন এমন কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের মূঢ় হাতিয়ার হতে চায় না। মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ কীর্তি তা যে জাতি সম্প্রদায় বা ভৌগলিক সীমায় উদ্ভুত হোক না কেন সব মানুষেরই তাতে অধিকার।

এ বছরও তাই পঁচিশে বৈশাখে দেশ ব্যাপী আনন্দ অনুষ্ঠান হয়েছে এবং বেতারে রবীন্দ্রজন্মোৎসবের লগ্নটি বৃথা গেছে বলে কাগজে কাগজে তিরস্কার করা হয়েছে। কিছু বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে একটি ক্ষুদ্রায়তন পত্রিকা (ভেলা) আমার হাতে এসেছে। এটা তরুণদেরই প্রচেষ্টা।

পশ্চিম বাঙলার এক বৃহৎ গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথকে ভুলবার সাধনায় ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের কবি তাই তাঁর প্রভাব কাটাবার জন্য এরা অসুন্দর কুৎসিত কদর্যতা ও বীভৎসতার পঙ্ক কুণ্ডে ঝাঁপ দিতে চায়। একটি দেশের ইতিহাসের যা শ্রেষ্ঠ দান তাকে অস্বীকার করার এই প্রবণতার নাম আধুনিকতা। অপরপক্ষে আজকের পূর্ব পাকিস্তানের তরুণরা সেই ইতিহাসের ধারাটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিদ্বেষের মরু বালুর মধ্যে সেই ফল্গুধারাকে উদ্ধার করে তারা ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত করতে চাইছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে তারা উদাসীন নয়। সমাজ রাজনীতি ও বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে তাদের ধারণা স্পষ্ট, তাই কোনো যৌনতার ধোঁয়া দিয়ে তাকে বাস্তব সাজাবার দরকার নেই। ভাষাকেও জটিল কৃত্রিম ও দুর্বোধ্য করে বাহাদুরীর প্রয়োজন নেই। এবং বিদেশের কোনো ক্লিপ্ত ক্লিন্ন মতলবের সঙ্গে এদের টিকি বাঁধা নেই কারণ এই নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর স্বচ্ছ সমাজ চেতনার পটভূমি বর্তমান রয়েছে।

আলি মাহমুদ নামে এক তরুণ কবির লেখা পড়ছি সেই দুর্দশা গ্রস্ত দেশের বন্ধ্যা পরিস্থিতির মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলছেন—

এ কেমন অন্ধকার বঙ্গদেশ উত্থান রহিত
নৈশব্দের মন্ত্রে যেন ডালে আর পাখীও বসে না
নদীগুলো দুঃখময় নিপতিতা মাটিতে জন্মায়
কেবল ব্যাঙের ছাতা।
অন্য কোনো শ্যামলতা নেই।

বুঝি না রবীন্দ্রনাথ কি ভেবে যে বাংলা দেশে ফের বৃক্ষ হয়ে জন্মাবার অসম্ভব বাসনা রাখতেন—

গাছ নেই নদী নেই অপুষ্পক সময় বইছে। পুনর্জন্ম নেই। আর জন্মের বিরুদ্ধে সবাই।

শুনুন রবীন্দ্রনাথ আপনার সমস্ত বই আমি যদি পুঁতে রেখে দিন-রাত পানি ঢালতে থাকি নিশ্চিন্ত বিশ্বাস এই একটিও উদ্ভিদ হবে না আপনার বাংলা দেশ এ কি রকম নিষ্ফলা ঠাকুর অবিন্যস্ত হাওয়া আছে নেই কোনো শব্দের দ্যোতনা—তু একটি পাখী শুধু অশ্বথের ডালে বসে আছে। সংগীতের ধ্বনি নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাক্যালাপ করে বৃষ্টি বোশেখের নিঃশব্দ পঁচিশ তারিখে—

একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে আসাদ চৌধুরী গোঁড়া মুসলমান ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য রেখে লিখছেন।—

কল্যাণ ও শান্তিকামী ভারতীয় দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন তেমনি কোনো বাঙালী মুসলমান দিতে পারেন নাই। এমন কি স্বয়ং মুহম্মদ আলী জিন্নাহও নন। অন্তত সে সময় তো নয়ই। সে পরিমাণে কাজী নজরুল ইসলাম যিনি এখনও ভারতীয় নাগরিক, তিনি ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি বিস্ময়-করভাবে উদাসীন, তাহাকে লইয়া আমাদের সহৃদয় মমত্ব বোধের কারণ বোধহয় তিনি মুসলমান। রবীন্দ্র বর্জনের উৎসাহী সাহিত্য সমাজ সেবক এই বিচারে তেমন উৎসাহী নন। নজরুলের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন বা ভুল তথ্য পরিবেশনের দায়িত্ব না নিয়াও আমরা বলিব রবীন্দ্রনাথের প্রতি বোধকরি এত দিন সুবিচার করি নাই। বিশ

বছরের জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও যদি আমাদের মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না হয় সে দোষ সাম্প্রদায়িকতার, রবীন্দ্রনাথের নয়।

এই প্রসঙ্গে কুমিল্লা থেকে লেখা একটি তরুণ মুসলিমের চিঠি থেকে উদ্ধৃত করছি? চিঠিখানির সঙ্গে আমার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি গদ্য কবিতা পাঠিয়ে লেখক আমাকে প্রশ্ন করেছেন—"একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন কি? আমি নাস্তিক, ঈশ্বর বিশ্বাসী নই। তবু কেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে আমার এমন অবস্থা হয়? আমার শরীরে রোমাঞ্চ ও মন উন্মুখ হয়ে কোন অভাবিত অজানার দিকে ছুটে যেতে চায়"—

শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই এদের আগ্রহ এমন গভীর তা নয়—যে রাষ্ট্র একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই মানুষকে বেঁধে ফেলতে চেয়ে ছিল মানুষের বিরুদ্ধে সেই অন্যায় চক্রান্তর গণ্ডী ভেঙে চুরে ফেলাই এই মুক্তি সাধককের সর্বদিকের প্রচেষ্টা।

সাহিত্যের ভাষা

আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় 'সাহিত্যের ভাষা'। বিশেষ-ভাবে সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই ভাষা সম্বন্ধে কিছু সচেতন মননা চাই। ভাষাই সেই আশ্চর্য সম্পদ বা গুণ যার দ্বারা মানুষ মনুষ্যেতর প্রাণীর চেয়ে পৃথক হয়েছে। যে অংশ জীব সাধারণের সঙ্গে এক সেই জৈব অংশকে ছাড়িয়ে বহুদিকে বহু বিস্তৃত তার দৈব সত্তা সে সত্তার প্রকাশ ঘটেছে ভাষার মাধ্যমে। জড় প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত এই প্রাণ প্রথমে ছিল বোবা তারপর জন্তুর মধ্যে শুনি তার অব্যক্ত ক্রন্দন, তার আত্মপ্রকাশের কত নিষ্ফল আর্তনাদ। মানুষের মধ্যেই যা পেল প্রথম প্রকাশের পথ অর্থযুক্ত বাক্যের মাধ্যমে। উদ্ভিদ থেকে জীবের প্রথম উন্নতি তার চলাফেরার শক্তিতে, গতির সম্পদে। মানুষের মধ্যে ভাষা দিয়েছে তার মনকে গতি। শরীরের চলাকে অতিক্রম করে মনের জগতে শুরু হল তার অবাধ ভ্রমণ।

ভাষার গতি বলতে এই বোঝায় যে, এক মন থেকে অন্য একটি মনে তার ভাব বা চিন্তাকে প্রবেশ করাবার ক্ষমতা। যখনই কথা বলি তখনই চাই অন্য মনের মধ্যে নিজের ভাবকে, চিন্তাকে প্রবেশ করাতে। মানুষ যদি একলা হত তবে সে কথা বলত কিনা সন্দেহ। অন্য মানুষের মনের সঙ্গে এই যে যোগস্থাপনের ইচ্ছা এ শুধু জীবন যাত্রার প্রয়োজনের খাতিরেই নয়—শুধু একত্র বসবাস, দেওয়া নেওয়া ও গোষ্ঠী জীবনের বন্ধনেই সমাপ্ত হয়নি কোনদিন। মানুষ তার জন্মকাল থেকেই ভাষাকে একই সঙ্গে তার জীবন ধারণের প্রয়োজনে প্রত্যহের ব্যবহারে লাগিয়েছে এবং আরও কিছু বলতে চেয়েছে। যা তখন তার নিজের কাছেও খুব স্পষ্ট নয়। পাহাড়ের গহ্বরে, পাথরে, পোড়ামাটিতে সে কত কথা লিখে রেখেছে যা আজ কারও বোঝবার সাধ্য নেই। তবু সেই অজ্ঞাত রচনার রেখায় রেখায় এই কথাটি স্পষ্ট যে, বহুপূর্ব যুগের মানুষের মন আজকের মানুষের মনকে স্পর্শ করতে চেয়েছিল।

শিল্প এবং সাহিত্য এই দুই পথে মানব চিত্ত চিরদিন ধরে অনাগত মানবের মনের দিকে বয়ে চলেছে। নিজে যা বুঝেছে, নিজে যা ভেবেছে, যে অনুভাবে, যে সুখে দুঃখে স্পর্শিত হয়েছে, তাকে শুধু নিজের করে রেখে মানুষের সন্তোষ নেই এবং পাশের বাড়ীর আত্মীয় কুটুম্বকে জানিয়েও সন্তোষ নেই। বহু যুগ পার করে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যেও সেই ভাবনাকে চালিয়ে দেবার এক অসীম আগ্রহে মানুষের ভাষা সাহিত্যের রূপ নিয়েছে। এই তো গেল গোড়ার কথা। এরপর স্বতঃই মনে হয় সাহিত্যের ভাষা এক পৃথক পোশাকী বস্তু কি না? যে ভাষা প্রতি-দিনের প্রয়োজনে লেনা-দেনার টানাপোড়েনের মধ্যে তৈরী হচ্ছে, ঘষে যাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে, বেঁকে যাচ্ছে সেই আটপৌরে ভাষা কি সাহিত্যে অচল?

আমরা জানি ভাষা সবদেশে ও সবকালে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বিশেষত—যখন দেশে দেশে দূরত্ব বিজ্ঞানের প্রভাবে এমন করে মুছে যায়নি। যখন দু ক্রোশ দূরের লোকের সঙ্গে দিনে একবার দেখা হওয়া সম্ভব ছিল না তখন ভাষার এই পরিবর্তন আরো বিশেষভাবে লক্ষ্য-গোচর ছিল এবং একই দেশের উত্তর ও দক্ষিণে উচ্চারণ, বর্ণবিন্যাস ও শব্দের অর্থেরও পার্থক্য ঘটত অতি সহজে। উত্তর থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব থেকে পশ্চিমের কথ্য ভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এর তাৎপর্য বোঝা যায়। নদীয়া জেলার ঘরোয়া কথাবার্তার সঙ্গে চট্টগ্রামের ভাষার পার্থক্য প্রায় অসমীয়া বা নেপালীর সঙ্গে দক্ষিণ বাঙলার মতই। তবু চলতি ভাষার এই বিপুল পার্থক্য সত্ত্বেও সাহিত্যের ভাষার একটি শুদ্ধ আদর্শ নিশ্চয় আছে—যার প্রভাবেই বাঙালীর বাঙালীত্ব। একথা অবশ্য অন্যান্য সকল দেশেও সত্য। প্রতিদিনের কথাবার্তার ঘষা লেগে, বিভিন্ন মানুষের মুখে মুখে একই ভাষা ক্রমে ক্রমে বদলে একেবারে অন্য হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তন যদিও সাহিত্যের পরিপন্থী। সাহিত্য রচনা কেবলই সাহিত্যিকের অন্তরের তাগিদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, কবি কবিতা লিখেই সন্তুষ্ট একথা পুরোপুরি সত্য নয়—সাহিত্য তার প্রধান প্রেরণা পায় পাঠকের মন থেকে। পাঠকের ও লেখকের সম্মেলনেই

সাহিত্যের উৎস। পাঠকের ক্ষেত্র দেশে কালে যত ব্যপ্ত সাহিত্যেরও তত প্রসার। বস্তুত ভাষার দুটি দিক একটি তার আশু প্রয়োজনের ক্ষণিক কাজে ফুরিয়ে যায় বহু মানব চিত্তে, আর একটি চিরদিনের স্থান খোঁজে—সে অমরত্বের প্রয়াসী। সেই স্থায়ীত্বের খাতিরে তার অবিরত পরিবর্তন ক্ষতিকর—তা ছাড়া, ব্যাপকতার জন্যও নির্দিষ্ট গণ্ডির বিকৃতি-গুলি ত্যাগ করা প্রয়োজন। চট্টগ্রামের প্রচলিত কথ্য ভাষায় রচনার রস অন্যান্য প্রান্তের বাঙালীর পক্ষে সহজবোধ্য নয়, সেইজন্যই প্রাত্যহিক ব্যবহারের দ্বারা যে আঞ্চলিকতা গড়ে ওঠে সেগুলি বর্জন করে ভাষার একটি শুদ্ধ আদর্শ থাকা প্রয়োজন। কিছুদিন পূর্বে যখন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অনেক কম ছিল এবং শুদ্ধ ভাষা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনের গণ্ডীর মধ্যে কেবল সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেই বদ্ধ ছিল, তখন কথ্য ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার পার্থক্য ছিল বিরাট। ক্রমে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য মানুষের জীবনে প্রবেশ করে তার প্রতি-দিনের ভাষাকেও দিয়েছে বদলে এবং সে ভাষায় কথ্য ও সাহিত্য রচনার ভাষার পার্থক্যও কমে এসেছে। আমরা জানি ভাষা চিন্তার বাহন, চিন্তাকে প্রকাশ করবার তাগিদেই ভাষার জন্ম আবার ভাষাও চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে তাতে সন্দেহ নেই। যে ভাষায় যত চিন্তাশীল মানুষ জন্মেছেন সেই ভাষা ক্রমে ততই পরিণতি লাভ করেছে, নানা ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়েছে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশের ভাষাই সংস্কৃতের কোলে জন্মেছে। যে সমৃদ্ধ সংস্কৃত অর্থাৎ শুদ্ধ ভাষা এক সময়ে নানা গূঢ় গভীর চিন্তার বাহক ও ধারক হয়ে ছিল তার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে প্রতিদিনের কথ্য ভাষার ঘটল বিচ্ছেদ—কারণ শুদ্ধতা রক্ষার খাতিরে এই ঐশ্বর্যময়ী নিজের চারিদিকে কঠিন প্রাচীর গাঁথলেন, পাছে তার এতটুকু ত্রুটি বিচ্যুতি হয় তাই মূঢ় জনের, প্রাকৃত জনের মুখে তা হল নিষিদ্ধ। ভাষা দেবতা হয়ে উঠল, পাছে প্রত্যহের ব্যবহারের মলিনতা তাকে নষ্ট করে তাই সাধারণের অগম্য ব্যাকরণের দুর্ভেদ্য দুর্গে বদ্ধ সেই বিশুদ্ধ ভাষা পরম জ্ঞানের পাত্রটি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জীবনের চলাচলের পথ থেকে

দূরে। ফলে সে যত্নে রইল বটে, কিন্তু যেমন অতি যত্নে একটি সজীব চারাকে সিন্ধুকে বন্ধ করে রাখলে তাকে নিরাপদ করা হয় বটে, ঝড় ঝাপটায় নষ্ট হয় না, গরু ছাগলে খায় না, কিন্তু সজীব চারাটি মরে শুকনো কাঠ হয়ে যায়। তেমনি বহু প্রাণদায়িনী মহা ঐশ্বর্যবতী সংস্কৃত ভাষা জীবনের যোগ হারিয়ে মরে গেল।

ভাষার প্রবাহ প্রাণের প্রবাহেরই মত। জীবন থেকে তার রস আহরণ করা চাই—মানুষের জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে বাঁচান যায় না। সেই কারণেই প্রাণপ্রবাহের মত ভাষারও চলাচল চাই, তারও আছে জন্ম ও মৃত্যু। মানুষের জীবন থেকে সরে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা মরে গেল, জন্ম নিল প্রাকৃত ভাষা। মাতৃদেহ থেকে রসে পুষ্ট হয়ে সেই প্রাকৃত নানা প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিদিনের ব্যবহারে, মানুষের নানা অনুভাবের প্রকাশে, চিরপরিবর্তনশীল বেগবান মনের স্পর্শে ভাষা নূতন নূতন কলেবর ধারণ করে। ভিতরের মূল গ্রন্থিগুলি থাকলেও তার বাইরের আকৃতি যায় বদলে। এই বদলের দুই প্রান্তের দিকে লক্ষ্য করলে পার্থক্য প্রচণ্ড কিন্তু সেই পরিবর্তন এত ক্রমিক যে অল্প কালের মধ্যে তা লক্ষ্য হয় না। তাই সংস্কৃতর সঙ্গে বাংলার প্রভেদ বিপুল হলেও বাংলা ভাষা তারই আত্মজা। আবার এই বাংলারও নানা প্রচলিত বিবর্তন তার শুদ্ধ রূপের থেকে পৃথক। তবু সেই শুদ্ধ বাংলাই একটি ভূখণ্ডের ভাবের বাহন হয়ে বাংলা ভাষার ও বাঙালী মনের বন্ধন হয়ে আছে। দেশজ ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রেরণা নেই তা নয়—সমস্ত লোকসাহিত্যের উদ্ভব সেই খানেই, বিভিন্ন প্রদেশের দেশজ বিকৃতি সত্ত্বেও লোকসাহিত্য মানুষের আদরণীয়—শ্রুতিমধুর, ঘরোয়া মানুষের কাছাকাছি। লোকসাহিত্য বিশেষ পরিধির কথ্য ভাষাতেই জন্ম নিলেও তার মধ্যে সাহিত্যের বিশেষ চিহ্নটুকু থাকে সর্বদাই। সদা ব্যবহৃত শব্দের অতি পরিচয়ের সাধারণত্বের থেকে সরিয়ে নিয়ে ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলি কথ্য ভাষাতেই গাঁথা কিন্তু মনের বিশেষ ভাবগুলির ছোঁয়া লেগে তা বেঁকে চুরে নূতন হয়েছে—এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উদাহরণ কবি উদ্ধৃত করেছেন—

"খোকন যাবে নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে"— ।

—জুতো তো সবাই জানে কিন্তু জুতুয়াটি কি ? না খোকনের প্রতি যে বিশেষ অনুরাগ ও তারই ভাষা। প্রতি দিনের ব্যবহারে কথার পালিশ উঠে যায়, মনের সুক্ষ্ম রসানুভূতি জাগিয়ে তোলবার মত দীপ্তি তার আর থাকে না, নিত্য ব্যবহৃত রংচটা আসবারের মত। তখন সাহিত্যিক নূতন নূতন ধ্বনি খোঁজেন। এক একটা শব্দকে একটু অন্যভাবে ব্যবহার করেন, একটু নূতন ভঙ্গীমা দেন, তাতেই ভাষা নব শক্তিতে নবজীবন লাভ করে—'চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর'— অবশ্য এ কথ্য ভাষাই কিন্তু দৈনন্দিন খাওয়া পরার কথা নয়, যে কথার অব্যক্ত বেদনায় মন মথিত হয়েছে এ ভাষা সেই কথা। এ ভাষায় যে বেদনা ধ্বনিত তা বলা মাত্রই ফুরিয়ে যায় না, যুগ যুগান্ত ধরে তার অনুরণন মানুষের মনে বাজতেই থাকে এবং এই রকম ভঙ্গীর দ্বারাই প্রাদেশিক অশুদ্ধ কথ্য ভাষার মধ্যেও অমর বেদনার স্পন্দন বিধৃত হয়। আবার শুদ্ধ ভাষা যার নিয়ম নির্দিষ্ট ছাঁচ সমস্ত দেশজ ভঙ্গীকে অগ্রাহ্য করে একটি নির্দিষ্ট মান রক্ষা করে, ব্যবহারিক ভাষার চেয়ে শব্দ সম্ভারে সমৃদ্ধ হলেও সেই শুদ্ধ লেখ্য ভাষারও প্রকাশ ক্ষমতা নিত্য ব্যবহারের দ্বারা ম্লান হয়ে আসে। এক একটি শব্দ পুরানো হয়ে যায়। তখন ভাব প্রকাশের বা পাঠকের চিত্তে ভাব উদ্বোধনের শক্তি বা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে—সেই জন্যই প্রতি যুগে নূতন লেখকের হাতে ভাষা কেবল নব নব ভঙ্গীতে মনোহারিণী হতে চেষ্টা করে। শব্দের একটু হেরফেরে, বিশেষ্য বিশেষণের একটু ওলট পালটে, পদ বিন্যাসের সামান্য একটু পরিবর্তনেই অসাধ্য সাধন হয়, সামান্য কথা অসামান্য রূপ নেয়— যেমন 'সন্ন্যাসীবর চমকি জাগিল রূঢ় দীপের আলোক লাগিল ক্ষমাসুন্দর চক্ষে'—রূঢ় কথাটা কার বিশেষণ ? দীপ না আলো ? রূঢ় কথাটি মানুষের চরিত্র সম্বন্ধেই সাধারণ বাংলায় ব্যবহার হয়ে থাকে। আলোক সাধারণত তীব্র, উজ্জ্বল, দীপ্ত ইত্যাদি বিশেষণেই বিশেষিত হয় কিন্তু রূঢ় এই নূতন বিশেষণের প্রয়োগে ভাষার একটি বিশেষ ভঙ্গীতে অর্থের

এক নূতন ব্যঞ্জনা আনে—সদ্য জাগ্রত চোখের উপর দীপ্ত আলো যে কর্কশতা যে কষ্ট আনে, রূঢ় কথার মধ্যে সেই অর্থটি প্রতিভাত—রূঢ় আলোক পড়ল কোথায়—ক্ষমাসুন্দর চক্ষে। আজকাল ক্ষমাসুন্দর কথাটির খুব ব্যবহার হয়েছে। অভিসার কবিতায় যখন প্রথম এই সমাসবদ্ধ পদটি পাওয়া গেল তখন বাংলায় এটি একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রয়োগের বিস্ময় নিয়ে এসেছিল। চক্ষু যে ক্ষমার দ্বারা সুন্দর হয়—এত সংক্ষেপে তার এমন নিখুঁত প্রয়োগ একটি নূতন উপলব্ধির সৃষ্টি করে—এবং প্রত্যহ ব্যবহারের শব্দগুলিই যেন নূতন সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। সর্বদা ব্যবহারে নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে বদ্ধ হয়ে কথা যখন অর্থের ব্যাপ্তি হারিয়ে ফেলে তখন নূতন প্রয়োগ ও নূতন ভঙ্গী দ্বারা তার নবজীবন দান করা সাহিত্যের অন্যতম কাজ। মানুষের যত অস্ফুট চিন্তার, যত উপলব্ধ অনুপলব্ধ সাধ, যত আনন্দ বেদনার ছোট ছোট কম্পন, কথা দিয়ে তার অনুরূপ প্রতিসৃষ্টিকে ফুটিয়ে তোলা সাধ্য কিনা সন্দেহ। কারণ কথা সীমাবদ্ধ অর্থের বন্ধনে বাঁধা, মন তা নয়—গাছ মানে গাছ-ই এবং সাংসারিক প্রয়োজনের জন্য বস্তুর প্রতীকরূপে ওই সাধারণ নামটিই যথার্থ; কিন্তু যখন আলো ঝলমল পাতার নীচে ঘেরা বনস্পতিটি দেখি তখন তার আনন্দ ভাবনা সদা সর্বদার কথা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না —তখন কবি তার ভাষায় ছন্দ লাগান, সুর লাগান। তখন 'অশ্বত্থ পল্লবে অশান্ত হিল্লোল সমীর চঞ্চল দিগঙ্গনে'—কবির গভীর দৃষ্টির সামনে বিশ্বসৌন্দর্য যে রূপ উদ্‌ঘাটিত করে তাকে আটপৌরে কথার মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা যায় না। নূতন বিশেষণ উপমা ও ধ্বনি সংযোগে কবি তাঁর চিত্ত ভাবনার অনুরূপ একটি ধ্বনি তোলবার চেষ্টা করেন—আকাশে ঝড়ের গর্জন ও বিদ্যুৎ বেগ ভাষায় তার স্পর্শ রাখে। তখন—

গগনে গগনে ধায় হাঁকি
বিদ্যুৎবাণী বজ্র বাহিনী বৈশাখী
ছন্দ ছুটিল হোম বহ্নির তরঙ্গে
মুক্তি রণের যোদ্ধ বীরের ভ্রূভঙ্গে—

ছন্দ ঝঙ্কারের ধ্বনি সংযোগে কবি ভাষার মধ্যে ভাষাতীত ভাবকে

ধ্বনিত করতে চান। কথ্য ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার পার্থক্য প্রধানতই এই যে, সাহিত্যে মানুষ যে সমস্ত ভাব প্রকাশ করতে চায় তা প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনের মধ্যে বদ্ধ নয়—তার ক্ষেত্র পৃথক—সেই জন্য আনন্দ ও উপলব্ধির ছোট বড় নানা সংবাদ তার আপন তাগিদে ভাষাকে নূতন নূতন ভঙ্গী দেয়—একথা লোকসাহিত্য ও সকল রকমের কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধেই সত্য। মানুষের যে অনিবচনীয় ভাবনাকে বচনে ধরে রাখতে চাই—অর্থের সীমা দিয়ে ঘেরা শব্দের সঙ্গে যুক্ত থেকেও কি করে সে ভাবনার, অনুভবের অসীমতাকে পাঠকের চিত্তে স্পন্দিত করতে পারে সাহিত্যের ভাষায় তারি নিত্য নূতন পরীক্ষা চলেছে—শব্দের সঙ্গে সুর যোগ করেও সে সেই চেষ্টাই করে।

সাহিত্য

সাহিত্যের কাছে মানুষের অনেক প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশার কোনো একটি নির্দিষ্ট মান থাকতে পারে না, কারণ পাঠকের চিন্তা, পাঠকের শিক্ষার মান ও আদর্শের সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে যুক্ত। অনেকে চান তিনি নিজে যে জগতে বাস করেন সেই পরিচিত জগতের ছবি দেখতে। অনেকে মনে করেন, যা আদর্শ যা হওয়া উচিত সাহিত্য তাই প্রকাশ করবে, সাহিত্য একটি পথ নির্দেশ করবে যার দ্বারা সমাজ উন্নত হবে। সমাজে মন্দের প্রভাব কমবে। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, কর্মস্পৃহা ইত্যাদি সমস্ত-গুণ সৎসাহিত্য পড়ে পড়ে বিকশিত হয়ে উঠবে। সমাজে দুর্জন আছে, দুষ্ট ইচ্ছা আছে, অসাধু প্রবণতা আছে আর সাধুত্বের জয় ও দুষ্টের ধ্বংস যদি সাহিত্যে পড়া যায় তাহলে সৎ শিক্ষা হয় এরকম একটা ধারণা অনেকের আছে। বিশেষত যে দেশের সরকার একটা সর্বাত্মক শুদ্ধ সমাজ গঠন করার প্রস্তাব নিয়েছে, সাহিত্যকেও তারা সেই কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে এ আর আশ্চর্য কি? তাঁরা চাইবেন সাহিত্য যেন পূর্ব কালের অর্থাৎ প্রাক্ সমাজবিপ্লব, প্রাক্ মার্কস্ যুগের সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি তুলে ধরে ও বর্তমান ব্যবস্থার সুখ সুবিধা, মানুষের ও জগতের উন্নতির কথা বলে। সমস্ত কমিউনিষ্ট দেশে মানব মঙ্গলের ইচ্ছা প্রসূত এই ধারণার অনুবর্তী হয়ে সাহিত্য রচনা হচ্ছে।

অপরপক্ষে অ-কমিউনিষ্ট দেশ তথা পাশ্চাত্য দেশগুলির কথা ভাবা যাক। সেখানে লেখকের না হলেও প্রকাশকের একটা উদ্দেশ্য আছে —সেটা হচ্ছে অর্থ উপার্জন। কী রকম লেখা হলে, কোন ধরনের লেখা হলে বই বেশী বিক্রি হবে, সে সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব কতকগুলি ধারণা আছে, সেই ধারণা যে সর্বথা সত্য তা নাও হতে পারে, তবু সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা রচনার গতিপ্রকৃতি ঠিক করে দেন। যেহেতু এ ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনই প্রায় প্রধান লক্ষ্য বা একমাত্র লক্ষ্য

বলা চলে, সেহেতু যে সব রচনা প্রকাশ করছেন তার প্রভাবে সমাজ উন্নত হবে কি উচ্ছৃঙ্খল হবে সে তাঁদের চিন্তার বিষয় বা তাঁদের দেখবার বিষয় নয়। রচনা মুখোরোচক কিনা, উত্তেজক কিনা, লোকের মনে যে সব অবদমিত ইচ্ছা গোপন থাকে তারই স্বাদ পেয়ে পরের মুখে ঝাল খাওয়ার শখ মিটবে কিনা—যদি মেটে, তাহলে রচনা লোকে শুধু পড়বে না, গিলবে—বই হু হু করে বিক্রি হবে।

প্রকাশকরা যখন একলক্ষ্য হয়ে থাকছেন সেটা হচ্ছে তাদের আর্থিক উন্নতি, অন্যপক্ষে লেখকরাও যখন দেখেন ঘরের খেয়ে বন্য মহিষ বিতাড়ণ বেশি দিন চলে না, তখন তাঁরাও প্রকাশককে সন্তুষ্ট করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। প্রত্যেক নূতন লেখক জানেন বই প্রকাশ করা কত কঠিন। প্রকাশক পাওয়া নূতন লেখকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এমন কি খুব নাম করা লেখকও যদি কোনো গভীর বিষয়ে লেখেন বা এমনকিছু লেখেন, যে বিষয়ে তিনি ইতিমধ্যে সাপ্তাহিক ইত্যাদিতে লিখে খ্যাতি অর্জন করেননি, তাহলেও তাঁকে লেখা প্রকাশের জন্য ক্রমাগত হোঁচট্ খেতে হবে। হয়ত একজন কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি নেই; তিনি যদি একখানি উপন্যাস লিখে বসেন, তাহলে তাঁর দুর্গতির অন্ত থাকবে না। দ্বারে দ্বারে ঘুরেও তিনি পাব্লিশার পাবেন না। পাব্লিশারের তো পড়ার সময় নেই অথবা পড়ে ভালমন্দ বিচার করার সামর্থও নেই, আছে কয়েকজন অর্বাচীন উদীয়মান সাহিত্যিক, যাঁরা দোকানে যাতায়াত করে চাটুকারবৃত্তিতে কালক্ষেপ করেন। অনেক সময় তাঁরাই হচ্ছেন 'রীডার',—যাঁরা পড়ে অভিমত দিলে প্রকাশক ছাপবেন। এমনও হয় যে কোনো অভিজ্ঞ লেখকের লেখা তাঁদের বোধমগ্যই হবে না মাথার উপর দিয়ে ভেসে চলে যাবে। কিন্তু তাঁরা গম্ভীর মুখে রায় দেবেন, 'এ অচল'—এ বই বিক্রি হবে না।

ফলে লেখকের ইচ্ছে হবে না এমন কিছু লিখতে যার জন্যে সহজে প্রকাশক পাওয়া যাবে না। লেখক আর পাঠক এই দুই এর যুগল সম্মিলনে লেখা সম্পূর্ণ হয়—পাঠক না থাকলে কোন্ লেখক লিখবেন?

কোনো নির্জন দ্বীপে যদি দৈবাৎ কোনো লেখক একলা বন্দী জীবন যাপন করেন বা নির্বাসনে দিন কাটান, তবু হয়ত তিনি লিখবেন কিন্তু লিখবেন পাঠকদের কথা ভেবেই, যে পাঠক আজও জন্মায় নি। সেই অনাগত দিনের ভবিষ্যৎ মানুষের জন্যই তিনি কলম ধরবেন, কাজেই লেখকের প্রয়োজন পাঠক। যত বেশী মানুষের কাছে যতভাবে সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে ততই সে সার্থক। সেই কারণে প্রকাশককে বাদ দিয়ে লেখকের অস্তিত্ব অপ্রকাশিত, সত্তা বিনষ্ট।

এই যেখানে বাস্তব পরিস্থিতি তখন প্রতি লেখকই কতকটা ব্যবসায়ীদের চক্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর লেখক সত্তার বিশুদ্ধতা ও সৌন্দর্য মলিন হয়ে পড়ে। রচনা সত্যভ্রষ্ট হয়।

যখন বলা হয় সাহিত্যে আমরা 'সত্য শিব ও সুন্দরের' স্পর্শ চাই, তখন সেটাকে বহু উচ্চারিত একটা কথার কথা—ইংরেজি ভাষায় যাকে বলা হয় ক্লেশে সেই রকমই মনে হয়। কিন্তু বাক্যটা মামুলী হলেও এর তাৎপর্য ভাবলেই আর মামুলী ঠেকে না—আমরা সাহিত্যিকের কাছে এমন রচনা চাই না—যা কেবল ভুয়ো ধাপ্পাবাজি, যা লেখকের অভিজ্ঞতায় নেই, কল্পনায় নেই। যা কেবল বইয়ের পাতা ভরাবার জন্য মুখোরোচক বা বিনোদক, আন্তঃসারশূন্য কথার বুদবুদ। আমরা এমন জিনিষও চাই না যা চিরদিন না হলেও দীর্ঘদিন মানুষকে আনন্দ দেবে না। মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ উদ্বুদ্ধ করবে না। এমন বাক্য চাই না যা রসাত্মক নয়।

সত্যি কি তাই? পাঠকের চাওয়া যদি বিপুল হত তাহলে তার চাওয়ার দাবীতেই লেখককে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করতে হত পাঠকের অঞ্জলি।

কিন্তু কত অল্পতেই আমরা আজ সন্তুষ্ট। পাঠকের যা চাওয়া উচিত তা সে চাইছে না বলেই যা তার পাওয়া উচিত তা পাচ্ছে না। শারদীয়ার মোটা মোটা সংখ্যাগুলির কথা চিন্তা করা যাক। প্রত্যেকটি নামী সাহিত্যিক ঐ সংখ্যাগুলির উদর পূর্তি করে দেন তাদের মোটা মোটা গল্প কাহিনীতে। ধরা যাক এদেশে মাতৃপূজার এমনই মহিমা যে সাহিত্যিকরা ঠিক পূজার আগেই লেখার প্রেরণা পান—মাতৃপূজার

অঞ্জলিরূপে তাঁদের রচনার অর্ঘ্য এসে পড়ে সাহিত্য পত্রিকার পাতায় পাতায়। কোনো দুষ্টবুদ্ধি লোক হয়ত ভাবতে পারে এটা পণ্য, যেমন তাঁতিকে পূজার আগে দাদন দিয়ে রাখে ব্যবসাদাররা শাড়ির জন্য তেমনি লেখককেও দাদন দিয়ে রাখে সাহিত্য ব্যবসায়ীরা। লেখকরা লিখতে বসেন এবং হু হু করে লেখেনও। বাইরের একটা তাগিদ থাকলে লেখা এগোয় তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু একবার কলম ধরলে যে লেখকের নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে তিনি কখনই এমনকিছু লিখতে প্রবৃত্ত হতে পারেন না যা কেবল ব্যবসায়ের উপযোগী। কড়া ঝাল ফুলুরীর মত তিনি দগ্‌দগে যৌনতা ও রগ্‌বগে ঘটনা সমাবেশ করে তৃপ্ত হতে পারেন না। তাঁর রচনা তখন আত্মনিবিষ্ট হবে। কিন্তু কার্যকালে আমরা কি দেখি? আমরা পাই না এমন কোনো গভীর অভিজ্ঞতা, তীব্র সুখ বা আনন্দময় যন্ত্রণা, এমন কোন অনুভূতি যা আমাদের ভিতরের সুপ্ত অপূর্ণ সত্তাকে জাগিয়ে তুলতে পারে, পূর্ণ করতে পারে। সাহিত্যের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। মানুষ একলা অসম্পূর্ণ—তার পরিধি সঙ্কীর্ণ। অধিকাংশ মানুষই আত্মীয়স্বজনের গণ্ডী দিয়ে ঘেরা নিজের গৃহসীমায় বন্দী। কিন্তু তার আকাঙ্খা তো ঐটুকুই নয়—অন্তরে অন্তরে বৃহৎ মানব সমাজের সুখ-দুঃখ জীবনলীলার সঙ্গে সে যুক্ত। কত অকথিত বাণী, কত অগীত সঙ্গীত, কত অনাস্বাদিত আনন্দ তার মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে। কাব্য সাহিত্য শিল্পের সংযোগে ক্ষণে ক্ষণে নিজের অন্তরস্থ এই গভীর ভাবের স্পর্শ পেয়ে নিজেকেই সে বৃহৎভাবে উপলব্ধি করতে পারে। খুচরো আমোদের চাটনীতে তা পাওয়া যায় না। তাই যত রংদার চটকদার যৌন মজার লঙ্কামরিচ ছেটানো লেখাই হোক, তার স্থায়ীত্ব হয় না। পাঠক বার বার তা পড়ে না—তার মধ্যে এমন কিছু পায় না যা সে অপ্রাপ্য অধরা গভীরের দিকে মানুষের অনুভূতি বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে রয়েছে—সেই দিকে নিয়ে যাবে।

এই তো গেল ব্যবসায়ী সাহিত্যের রোগনির্ণয়। রোগ জানলেই যে আরোগ্যের পথ জানা যাবে তাও নয়। এক সময় কিন্তু ছিল যখন

ক্ষয়রোগগ্রস্ত অনাহারী, অর্থলোভশূন্য সাহিত্যিকরা, কবিরা, সমাজে সমাদৃত ছিলেন। অন্তত তাঁরা লিখতেন, তাঁদের কথাও লেখা হত। জীবনের সমস্ত সুখ সুবিধা তুচ্ছ করে তাঁরা জীবনের সুনির্দিষ্ট আদর্শকেই বড় করে পথ চলতেন। আজ সমগ্র সমাজ বদলে গেছে, অর্থই এখন সমাজে প্রতিষ্ঠার মানদণ্ড। বিত্তবান ও বিত্তহীনেরা উভয়েই যখন একটি লক্ষ্য ধরে আছেন তখন ধনী ব্যবসায়ীর আদর্শ ও দরিদ্র শিক্ষকের আদর্শের মধ্যে বড় একটা পার্থক্য নেই। শুধু এক জনের বিত্ত আছে, অন্য জনের বিত্ত নেই কিন্তু উভয়েই মনের দিক থেকে একই প্রবণতায় ঝুঁকে আছেন। তাই লেখকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—সাহিত্য রচনা ছেড়ে জার্ণালিজমের দিকে এগিয়ে চলেছে। কোনো মতে কোনো পত্রিকায় একটা চাকুরী জোগাড় করতে পারলে, লেখা ছাপাবারও সুবিধা, অর্থ উপায়েরও একটা ব্যবস্থা এক সঙ্গেই হয়ে যায়। যদিও ফলে দেবী সরস্বতীকে দিয়ে দাস্যবৃত্তি করাতে হয়। লেখক যখন চাকরী করেন তখন মালিকের অভিরুচি, সেই বিশেষ পত্রিকার উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও আদর্শ অনুসারে লিখতে হয়—তখন তাঁকে আর স্বাধীন বলা চলে না। তিনি তাঁর কলমকে উপার্জনের হাতিয়ার করেন এবং তাঁর স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মত, স্বাধীন প্রেরণা খণ্ডিত বিক্রীত হয়ে যায়। সে দিক থেকে দেখতে গেলে বর্তমানকালে কি আমাদের দেশে, কি পাশ্চাত্য জগতে কোনো সম্পূর্ণ স্বাধীন লেখক নেই বললেই চলে। এই বিপদটা ঘটেছে পাঠকের উপর অনাস্থার ফলে—যারা সাহিত্য ব্যবসায়ী তাঁরা তাঁদের নিজেদের মনের মাপে একটা ছক করে নিয়েছেন কি রকম লেখা হলে পাঠকদের অর্থাৎ বেশীর ভাগ পাঠকদের রুচিকর। সেই ধারণাটা যে একেবারে নির্ভুল নাও হতে পারে এ সন্দেহ তাঁদের কদাচিৎ আসে। কারণ যারা সাহিত্য ব্যবসায়ের মালিক তারাও অন্যান্য ব্যাপারের মালিকদের মতই বিত্তশালী এবং বিত্তশালী ব্যক্তি মাত্রই সবজান্তা হওয়ায় তাঁরা শিল্প সংস্কৃতির ভুবনও করায়ত্ত করতে পারে।

এই তো গেল বাস্তব পরিস্থিতি। এখন এর সমাধান কি তা খুঁজছে অনেকেই, বিশেষত যারা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। এবং এই

অনুসন্ধানের ফলেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জন্ম। লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলি তাই এক অর্থে স্বাধীন সাহিত্যের জন্মস্থান। এবং বর্তমানে ব্যবসায়ী সাহিত্য সমাজে এর দান একদিক থেকে অমূল্য। তাই যারা লেখার জন্যই লিখতে চায়, লিখতে চায় আত্ম প্রকাশের আনন্দে, তাদের পথ একেবারেই সহজ নয়। সমস্ত স্বাধীন দেশে যাকে বলা হয় ফ্রি-কান্ট্রি অর্থাৎ অ-কমিউনিষ্ট দেশে এই ধারণা প্রচলিত যে—কমিউনিষ্ট দেশে লেখক স্বাধীন নয়, তারা সরকারের দাস এবং সরকারের প্রচার বা প্রপাগ্যাণ্ডা লেখাই তাদের সাহিত্যকৃতি।

এটা ঠিকই কমিউনিষ্ট দেশে যেহেতু প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা সব সরকারের হাতে, সেহেতু সরকারের বিপক্ষে কিছু লেখা লেখকদের পক্ষে কঠিন—কিন্তু তার মানেই এই নয় যে, তাঁরা তথাকথিত free country-র লেখকদের চেয়ে লেখবার সুযোগে বঞ্চিত। বর্তমানে প্রায় সব কমিউনিষ্ট দেশের লেখার মধ্যে একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করি, সে হচ্ছে অতি সরলীকরণ। ভালো যে সে নিখুঁৎ ভালো, মন্দ মন্দই। ভালো মন্দে সংঘর্ষ এবং ভালোর জয়—সচরাচর ভালো হচ্ছে দরিদ্র ও দুর্বল পক্ষ, মন্দ হচ্ছে ধনী বা সবল পক্ষ। সংসারে ঘটনা কখনো এরকম একটা সাজানো প্যাটার্ণে ঘটে না, বা এরকম সাজানো ঘটনার বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটালে কচলানো লেবুর মত তার থেকে সব রস নিষ্কাশিত হয়ে বিস্বাদ হয়ে যায়। এই কারণে আজকের দিনে প্রায় সব কমিউনিষ্ট দেশের সাহিত্যই রক্তশূন্য পাণ্ডুর। তা মনকে নাড়া দেয় না, জাগিয়ে তোলে না, হর্ষ বা বিষাদে দোলায় না। এর কারণ কি ঐ দেশের লেখার ভিতরে কতগুলি হিতকথার প্রভাবের চেষ্টা? কতগুলি মত আরোপ করে দিয়ে সাহিত্যের পিঠের উপর হিতোপোদেশের বোঝা চাপান? কিন্তু যদি বিশ্ব সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করব যে কোনো দেশের কোনো স্থায়ী সাহিত্যই বক্তব্যশূন্য নয়, লেখকের নিজস্ব কোনো মত আছে, কোনো ভাবনা আছে, যা তিনি কাহিনীর আঙ্গিকে উপস্থাপিত করে বহুজনকে নিজের মতে নিয়ে আসছেন। এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রাক্ বিপ্লব রুশ

সাহিত্য। টলষ্টয়, ডস্ট্রয়েভ্স্কি চেকভ্ গর্কি প্রত্যেকের প্রতিটি রচনার কাহিনী সন্নিবেশের মধ্যে দিয়ে একটি সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে, যেখানে বঞ্চিত উৎপীড়িত দরিদ্র অপমানিত মানুষকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তাকে দেখতে পাচ্ছি সমগ্ররূপে। যদিও সেই মানুষ আমাদের চোখের সামনেই ছিল। তাদের নিয়েই আমাদের কারবার। আমরা কেউ কখনো উৎপীড়িত কেউ উৎপীড়ক, তবু সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সমাজের সেই নিদারুণ সত্য আমাদের কাছে যেভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তাতে বুঝতে পারি প্রাক্‌বিপ্লব রুষিয়ায় বিপ্লবের প্রস্তুতি ঘটানোর জন্য মানুষের মধ্যে নব যুগের সাম্যভাবনা জাগিয়ে তোলবার জন্য এঁদের উপন্যাসের কী অভাবনীয় দান। কাজেই একদিক থেকে দেখতে গেলে এসব রচনাকেও প্রচারসাহিত্য বলা যায়—কিন্তু বলা যায় কি? বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার লেখকদের খুব কম লেখার মধ্যেই আমরা সাহিত্যের এই সংবেদনা দেখতে পাই। চীনেও যেমন প্রাক্ বিপ্লব লেখক লু-সুনের রচনার যে অনবদ্যতা ছিল, তা কি এখনকার চাইনিজ লিটারেচারে পাওয়া যাবে? সব যেন সহজ সরল প্রায় ছেলেমানুষী কাহিনী। আত্মত্যাগের মহিমা, কিংবা যুদ্ধজয়ের দৃপ্ততায়, কিংবা অত্যাচারীর দমনে সব যেন মৃত রক্তশূন্য পাণ্ডুর। যেন সব জানা কথা বলা হচ্ছে। পড়া বই বার বার পড়া হচ্ছে। যেন হর্ষ বিষাদের উদ্বেলতা নিস্তরঙ্গ হয়ে পড়েছে। উপন্যাস যেন রূপকথার গল্পের চেয়েও শিশুসুলভ।

আমি কিছুতেই ভালো মতো বুঝতে পারি না এর কারণ কী? কোন্ রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সমাজের মঙ্গলামঙ্গলে উদাসীন? শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া কি এক দুস্থ অবক্ষয়িত সমাজ ব্যবস্থার কথা বলছে না? কিন্তু একে কি প্রচারসাহিত্য নাম দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিতে পারি? কিংবা কোনোখানেই এ কাহিনী কি রক্তশূন্য, কেবল বক্তব্যপ্রধান হয়েছে?

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্পই অসহায় বাঙ্গালী মেয়ের জীবন চিত্র। নিতান্ত নিপীড়নের মধ্যেও যে মেয়েরা কতকগুলি আদর্শকে ধারণ করে আছে। যে আদর্শ থেকে স্বার্থমগ্ন পুরুষ ভ্রষ্ট হয়েছে তাকে সেই

আদর্শের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে গল্পগুচ্ছের নারী চরিত্রগুলি। যেমন 'দিদি'—স্বামীর হাত থেকে নিজের ছোট ভাইটিকে বাঁচাবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের আশ্রয় নেওয়া ও পরে তার স্বামীর হাতে মৃত্যু সেদিনকার সমাজের এক পরিচিত ঘটনারই দৃশ্য। কিংবা 'স্ত্রীর পত্র'—'দৃষ্টিদান' এগুলি সবই বক্তব্যপ্রধান। লেখকের একটি নির্দিষ্ট মত আছে তিনি সুনিপুণভাবে পাঠকের মনকে তারই অনুবর্তী করে নিয়ে চলেছেন। স্ত্রীর পত্রে পুরুষের দম্ভ ও ক্ষুদ্রতা সমাজের যে পরিচিত চিত্র উদ্ঘটিত করেছে তা আমাদের জানা হলেও যেন নূতন করে জানা হয়। দৃষ্টিদানেও মহিমময়ী নারী তার ত্যাগ ধৈর্য ও স্নেহের মহিমায় বহু উচ্চে উঠে গেছেন। এরকম মানুষ আমরা দেখেছি তবু যখন সাহিত্যে তাদের আবার দেখি তখনই ফের সেই সব চরিত্র ও সমাজের অবস্থা আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট, আরো বাস্তব হয়ে ওঠে। আমাদের প্রতিদিনের দেখা সংসারকে আমরা বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখতে পেয়ে সত্যকে বুঝতে পারি। সত্য যখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় তখনই আমরা কর্ম করতে উদ্যোগী হই। বহু সার্থক সাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় নারীর দুর্গতির ছবি যখন অসীম বেদনা ভার নিয়ে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় তখনই সংস্কারক জন্মায়। এই সব অনবদ্য সাহিত্যের কারণেই আজ এদেশের নারী অবরোধের বাইরে বেরিয়ে এসে পুরুষের সঙ্গে সম মর্যাদার আসনে বসতে পেরেছে।

সাহিত্যের প্রচারশক্তি যদি এতই বড় হয় যে, তা একটা সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নূতন ব্যবস্থার পত্তন করতে পারে, তাহলে প্রচারধর্মী বলে কোনো লেখককে কি আর অবজ্ঞা করা চলে?

সেটাকে আর তখন শুধু 'প্রচার' আখ্যা দেওয়া চলে না—বলা চলে উদ্বোধক। নূতন চিন্তার উদ্বোধন করায়, চেতনাকে জাগ্রত করে—বাঁধা পথে চলতে চলতে মানুষের মন যখন অসাড়, সন্দ'জ জড়ত্বপ্রাপ্ত, মজে যাওয়া জলাশয়ের মত দূষিত, সাহিত্যই তখন ভগীরথের মত খাল কেটে দিয়ে মহাসমুদ্রের সংবাদ এনে দিতে পারে। সঙ্কীর্ণ সমাজের গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে তাকে বৃহত্তর মানবতার বাণী শোনাতে পারে। এই

রকমই একটি বই গোরা—যে বইটি এই প্রসঙ্গে আমার বারে বারে মনে পড়ছে এবং আমার শেষ ভাষণে আমি বিশদভাবে আলোচনা করব। এই বইতে দুটি বিভিন্ন মত উপস্থাপিত করা হয়েছে। পুরাতন হিন্দু সমাজের সমস্ত দূষিত কুসংস্কারগুলিকে দেশাত্মবোধের রসায়নে উদ্দীপিত উজ্জীবিত করতে চেয়েছিল গোরা। অথবা সেই যুগের মানুষরা যারা পরাধীনতার গ্লানিতে আকণ্ঠ ডুবে আছে তাদের আত্ম মর্যাদা ফিরেয়ে আনতে সে সবলে যা কিছু দেশীয় তাকেই আঁকড়ে ধরেছিল যাদের মত ছিল 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' গোরা তাদেরই প্রতীক। কিন্তু এই চিন্তাধারার যা ত্রুটি তা গোরার জীবনের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেল। কাহিনী সংস্থাপনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ জাতিধর্মের উর্দ্ধে মানবতার অমোঘ বাণীকে প্রকাশ করলেন। তাহলে গোরা বইটি কি প্রচারধর্মী? না বিশুদ্ধ শিল্প? না উভয়ের সম্মেলন? গোরা পড়তে পড়তে কারও মনে হবে না যে লেখক বোধোদয়ের চেষ্টা করছেন। সেই সময়ের সামাজিক পরিস্থিতি ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বদেশচিন্তায় উদ্বুদ্ধ যুবকদের যেমন ভাবনা, গোরার মুখে আমরা তাই পাচ্ছি—। যেন বিবেকানন্দের কথা শুনছি। সমস্ত গোরা বইখানি তর্কে-বিতর্কে ভরা, বহু মতামতের দ্বন্দ্বের সংঘাতে ও ঘটনা সন্নিবেশে শেষপর্যন্ত যে মত জয়ী হল, আমরা বুঝতে পারি সেটাই লেখকের মত। কিন্তু অন্য মতকে তার সমস্ত গৌরবে উপস্থাপিত করতে লেখকের শঙ্কা নেই। প্রত্যেকের বক্তব্যের যুক্তি স্পষ্ট, পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। লেখকের কোন্ দিকে সহানুভূতি প্রথম দিকে তার কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। পাঠক সমাজের সমস্যাটা বুঝুন আর না বুঝুন, সমাজের সমস্যার ফাঁদে পড়ে ব্যক্তি মানুষের বেদনা বুঝতে পারেন। ব্যক্তি মানুষের বেদনার, হর্ষ বিষাদে তার যন্ত্রণাবিদ্ধ কাতরতার অনুরণনেই লেখক ও পাঠকের সংযোগ। পাঠক যখন পড়ছেন তখন তিনি একলা, আর নায়কও একলা—এই দুই ব্যক্তি একজন জীবন্ত আর একজন কাল্পনিক বা প্রতীক পুরুষ। এই দুজনের ভাবনা, সুখ-দুঃখ মিশে গিয়ে যে রস উদ্বেলিত হচ্ছে তারই গুণাগুণের উপর

সাহিত্যের মূল্য নিরুপন হয়। যুক্তিগুলি কত টেঁকসই হয়েছে তার উপর নয়।

গোরার মুখের আর্ত প্রশ্ন 'মা তুমি আমার মা নও' কিংবা তার সেই নৈরাশ্য সে হিন্দু নয়, ব্রাহ্মণ নয়, ভারতীয় নয়, তার কেউ নেই, সে ছিন্ন মূল—এই উপলব্ধির গাঢ়তা মনে হয় অনেক কঠিন সংস্কারের আবরণ ছিন্ন করতে পারে।

তবু এসব লেখাকে উদ্দেশ্যমূলক বলতে পারব না, বলা চলে এগুলি—প্রেরণামূলক। সমাজের অবস্থা লেখকের দৃষ্টিকে যেমন করে সমাজের দিকে প্রসারিত করেছে—তাতে তার মনে যে বেদনার উদ্ভাস হয়েছে তাই তিনি প্রকাশ করেছেন। মনে হয় আজকাল কার কমিউনিষ্ট সাহিত্য অতি সরলীকরণের কারণেই রক্তশূন্য—ভালো মন্দের দ্বন্দ্বের মন্থনেই বোধহয় সাহিত্যের অমৃত উত্থিত হয়।

চন্দ্রশেখর

আমার পূর্বের ভাষণে আমি বলতে চেয়েছি যে কোনো চিরায়ত সাহিত্য সূত্রছিন্ন বাণী নয়। সমাজ জীবনের সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে যুক্ত।

বক্তব্য ছাড়া শুধু কথার বুদ বুদ সৃষ্টি করার মোহ কোনো কোনো লেখকের আছে বিশেষত যে সব লেখক নিজের অসামান্যতা ও স্টাইলের অপূর্বতা বোঝাবার জন্য চেষ্টাকৃত কষ্টকৃত প্রয়াস নেন। বর্তমান কালে দেখেছি এই প্রয়াস প্রায়ই তাঁদের বক্তব্যকে চিন্তাকে উপলব্ধিকে পাঠকের কাছে না এনে দূরে সরিয়ে দেয়। আঙ্গিকের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দেবার ফলে গদ্য রচনাতেও এক রকম দুরূহতা এসে পড়ে। এই দুরূহতা অনেকের পক্ষে এক রকম কৃত্রিম বিদ্যাবত্তার স্বাদ আনে—পাণ্ডিত্যের মরীচিকা সৃষ্টি করে। কিন্তু সাহিত্যের যা কাজ, পাঠকের সঙ্গে সম্মিলন ঘটান সে উদ্দেশ্য থেকে তা বহুদূর চলে যায়।

এই ধরনের নূতন নূতন রচনা শৈলীর ভঙ্গিমা দিয়ে আজকালকার অনেক লেখক নিজের স্বকীয়তা প্রকাশে বিশেষ ব্যগ্র কারণ পূর্বসূরীদের কোনো প্রভাব তাঁরা নিজেদের রচনায় দেখতে চান না। বিশেষত রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হবার ঝোঁকেই তাঁরা কষ্টকৃত নূতনত্বের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েন। কবিতার এই প্রবণতা কবিতাকে জন মানস থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। মুষ্টিমেয় গুটি কতক মানুষই আজ তা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। সে কবিতা তাই কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ—অগণিত সাধারণ মানুষের তা কাজে লাগে না। কিন্তু গদ্য রচনা বিশেষত গল্প উপন্যাসের কাছে পাঠকের প্রত্যাশা অনেক। তা জীবন বিচ্যুত কষ্ট কল্পিত কোনো দুর্বোধ্য রচনার মধ্যে পাওয়া যাবে না। যে সমস্ত উপন্যাস ও কাহিনী আমাদের এই পরিচিত জগতের ছবির ভিতর দিয়ে সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি ভালোমন্দবোধ জাগ্রত করে তোলে, আমাদের প্রেরণা দেয় যে সব বিষয়ে সজাগ না হলে মানুষ বাঁচে না। সেই সাহিত্যই এক মানুষকে অন্য মানুষের ভাব ও ভাবনার সামিল করে, তার

আনন্দ যন্ত্রণার মধ্যে নিজের অনুভূতিকে বিস্তার করতে পারে। অর্থাৎ এই সাহিত্য এক মানুষকে অন্য মানুষের কাছে নিয়ে আসে, 'সহিত' করে। উদাহরণ স্বরূপ দীর্ঘজীবি রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর কথা উল্লেখ করা যায়। দীর্ঘদিন ধরে এই বই দুটি নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির মানুষের কাছে সমাদৃত। আর ভারতীয় সভ্যতার বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে এই বই দুটির উপরই। মহাভারত গ্রন্থে নিপুণ ও বিজ্ঞ লেখক মহামতি ব্যাসদেব গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদের সত্যপরায়ণতা ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের দুর্বৃত্ততা বিবৃত করেছেন। এই কাহিনী সুখে দুঃখে পাপে পুণ্যে জীবনের যে প্রবাহ শুধু তারই ছবি নয় তার মধ্য দিয়ে তখনকার সমাজের আদর্শ ও অভিপ্রায়কে পাঠকের মনে উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে—এই যে আদর্শের স্থায়ীত্ব তারই উপর মনে হয় রচনার গুরুত্ব নির্ভর করে। এই আদর্শ যত বেশী মানুষের গ্রহণযোগ্য, দেশে কালে দূর বিস্তৃত, যত বেশী মানুষ তাতে প্রীত আনন্দিত সে সাহিত্য ততই মূল্যবান।

যেমন অর্থের সমবণ্টন তেমনি ভাবেরও সমবণ্টন একটি সমাজকে সংহত করতে প্রয়োজন।

Greatest good of the greatest number—এ শুধু অর্থনীতিরই লক্ষ্য নয় সাহিত্যেরও লক্ষ্য।

এই মূল কথাটি মনে নিয়ে আমরা আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ বঙ্কিম-চন্দ্রের চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে দু একটি কথা বলব। আমি ধরে নিচ্ছি আমার শ্রোতাদের সকলেরই এই বহুপঠিত বইখানি পড়া আছে। ঘটনা বহুল কাহিনীর ভিতর দিয়ে তখনকার সমাজের যে আদর্শগুলি প্রকাশ পাচ্ছে, দেখা যাক তার মধ্যে কতগুলি নিত্য কতগুলি অনিত্য। কতগুলি বা বেশীর ভাগ মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কতগুলি বা নয়। কতগুলি আপনগুণে দীর্ঘকাল পরিব্যাপ্ত, কতগুলি বা ক্ষণিক। একথা ঠিকই যে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কার সামাজিক পরিস্থিতি এখনকার নিরিখে নির্ণয় করা মুস্কিল। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন

কোনো নূতন মত প্রবর্তন করতে পারেন না। কিন্তু যুগে যুগে সেই রচনাই সার্থক যা বর্তমান সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করে চিরকালের মানুষের কথা বলতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রথম গৌরব তিনি একটি অনিন্দ্যনীয় গদ্য সৃষ্টি করলেন। রামমোহনের ও বিদ্যাসাগরের গদ্যের বুনিয়াদের উপর সংস্কৃত ভাষার লাবণ্য হল তরঙ্গিত, প্রবহমান। আজকাল শোনা যায় কোনো কোনো লেখক আদিম ও অকৃত্রিম বাংলা ভাষার সন্ধানে ইংরেজ আমলের আদি ও অকৃত্রিম ভাষা সেরেস্তার ভাষা সাহিত্যে আমদানীর চিন্তা করছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ভাষার উৎস তার জননী সংস্কৃত ভাষা। বাংলা ভাষার গতিকে বাড়াতে গেলে, তাকে বহুমুখী ও বহু প্রসারী করতে গেলে সেই উৎসমুখে ফিরে যেতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন দুজনেই এই কাজ করেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রর ভাষা আরো সাবলীল ও কৌতুকোজ্জ্বল এবং বাঙালী মানসের অনুকুল হওয়ায় পরবর্ত্তী কালের লেখকরা তার থেকে প্রেরণা পেচ্ছেন। আজ দেড়শ বছর পরেও বঙ্কিমের ভাষা আমাদের কাছে সুগম্য সুপাঠ্য এবং নান্দনিক।

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ ফ্রয়েডের আবির্ভাবের পরে লেখা উপন্যাসগুলি প্রায়শই ঘটনার জটাজাল মুক্ত হয়ে অন্তরের দিকে অভি-নিবিষ্ট। ব্যক্তিমানুষের আন্তরজগৎ, তার দ্বন্দ্ব ইত্যাদিই ইদানীং ছোট বা বড় গল্পের কেন্দ্র—যেহেতু বিভিন্ন মানুষের মানস-প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত স্ত্রী পুরুষ এই সব বিভিন্ন ব্যক্তির মানসলোকে এত পার্থক্য যে একের সীমা অন্যের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য। বর্তমানের অনেক লেখাই তাই অসামাজিক অর্থাৎ সমাজের সব লোকের বা অনেক লোকের বোধগম্য নয়।

সেদিক থেকে সংস্কৃতবহুল হলেও বঙ্কিমের রচনা কাহিনীর সারল্যে চলতি ভাষায় লেখা বহু গল্পের চেয়েও সাধারণ মানুষের কাছে আজও প্রিয়। যত বেশী পাঠকের কাছে লেখক পৌঁছতে পারেন যত বেশী পাঠকের সঙ্গে তাঁর সম্মেলন ঘটে ততই তাঁর সার্থকতা।

তাই ভাষা ও কাহিনীর সংস্থাপনায় বঙ্কিমচন্দ্র কৌতূহলী পাঠকের কাছে সুগম্য। ঘোরাল পেঁচান চিন্তার দুরূহতায় তা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে নয়—। একটা নিন্দা বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচারিত যে তিনি মুসলমান বিদ্বেষী বা আজকালকার ভাষায় কমিউন্যাল। ভারতে হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয় নয়। বিশেষ করে মুসলমানেরা তাঁকে মুসলমান বিদ্বেষী মনে করে। আপাতদৃষ্টিতে আমাদেরও তা মনে হয়। কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে মহৎ মুসলমান চরিত্রের অভাব নেই। দলনী বেগম, আয়েষা, ওসমান প্রভৃতি চরিত্রগুলি মহৎ গুণে অলঙ্কৃত। কোনো সাম্প্রদায়িক লেখকের হাত থেকে এ ধরনের চরিত্র আশা করা যায় না। বঙ্কিম যে সমাজের কথা লিখেছেন তা যদিও বেশির ভাগই রাজ-রাজড়ার বৃত্তান্ত সেজন্যও আমি তাঁকে পশ্চাৎমুখী বলব না—এই সব ঘটনা সমাবেশ ঐতিহাসিক সময়ের অনুকূল। তৎকালীন পাঠকের রুচিকর।

বঙ্কিমের রচনা আমার কাছে সাম্প্রদায়িকতা দোষে ক্ষুণ্ণ বলে মনে হয় না বা ফিউডাল সমাজের কাহিনী বলেও আমার কোনো অনীহা জন্মায় না। কিন্তু বঙ্কিমের রচনার মধ্যে যে পশ্চাৎমুখীনতা সেটাই তাঁর রচনার দুর্বলতা। প্রত্যেক মহৎ সাহিত্যের কাছে আমাদের নিগূঢ় প্রত্যাশা থাকে যে সে তৎকালীন সংস্কার বন্ধন গতানুগতিক অভ্যস্ত চিন্তার আবর্তন থেকে, ক্ষনিক সত্য থেকে, বৃহত্তর সত্যে উত্তরণের পথ নির্দ্দেশ করবে। এই প্রসঙ্গে আমরা চন্দ্রশেখর উপন্যাসটির আলোচনা করতে পারি।

সাহিত্যের যে একটি প্রধান গুণ সে 'সহিত' করার গুণ—কতগুলি ঘটনা সমাবেশের মধ্য দিয়ে লেখকের যদি কোনো স্পষ্ট মত বা কোনো বাণী প্রকাশ পায় তাহলে তা বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। প্রেরণাও দেয়। চন্দ্রশেখর উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমের একটি স্পষ্ট মত অত্যন্ত প্রকট—দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে নিষ্ঠা এবং পতিই নারীর গতি।

দলনী ও মীরকাশমের গল্পটি মূল কাহিনীর সঙ্গে সামান্য সূত্রে যুক্ত, বস্তুত, একটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে তৎকালীন সমাজকে উপস্থাপিত

করবার জন্যই সম্ভবত এ কাহিনীর অবতারণা। চন্দ্রশেখরের গুরু রামানন্দ স্বামীর উপস্থিতিও এই জটিল কাহিনীর একটি গ্রন্থি। চন্দ্র-শেখর পুরোপুরি ঐতিহাসিক কাহিনী নয় তবে এর মধ্যে স্বল্প ঐতি-হাসিক সত্য তখনকার বাংলাদেশের অবস্থা। ইংরেজ তার সাম্রাজ্য লোভী হাত বাড়িয়েছে! কিন্তু সে কতকগুলি পৃথক নীতিবোধ নিয়ে এসেছে। নরনারীর সম্বন্ধের মর্যাদা সে বোঝে না। পরনারীর প্রতি আসক্তিতে তার লজ্জা নেই। কিন্তু শৈবলিনীকে হাতে পেয়েও ফস্টর তাকে ধর্ষণ করে না। সে কতটা ইংরেজের চরিত্র বোঝাবার উদ্দেশ্যে লেখা কতটা বা গল্পকাহিনীর মোড় ফিরিয়ে শৈবলিনীকে পতিগৃহে পাঠাবার জন্য লেখা তা বোঝা যায় না। কিন্তু ইংরেজ সহজে ভয় পায় না। যে কাজে সে কৃতসংকল্প সে কাজে এগিয়ে যেতে সে জীবন তুচ্ছ করে। যে ইংরেজের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধরেছেন, যাকে শত্রুভাবে দেখেছেন তার গুণগুলিকেও দেখান মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ অর্থাৎ একটি চরিত্রের স্বকীয়তা স্পষ্ট করে তোলা। এছাড়া হিন্দু মুসলমানে রেশারেশি থাকলেও মেশামেশির জন্য 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে লক্ষ্য করবার বিষয়—প্রতাপ রায় মুসলমান নবাবের হয়ে যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক এমনই বিরোধতিক্ত হয়েছিল যে আমাদের ধারণা, কখনই বোধহয় তারা একত্রে এক দেশবাসীর মত কাজ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র 'ন্যাশানাল ইন্টিগ্রেশনের' যে চিত্র নানা স্থানে এঁকেছেন তা লক্ষ্য করবার বিষয়।

আমি প্রথমে চন্দ্রশেখর গ্রন্থে লাভের অংশ আলোচনা করছি—পরে লোকসানও আলোচনা করব। চন্দ্রশেখর বইটি মূলত শৈবলিনী ও প্রতাপের প্রেম কাহিনী। যদিও এদের প্রেম দৃশ্য সামান্যই আছে। এবং হয়ত সেই জন্যই এদের প্রেমের গভীরতা মনে হয় অনন্যসাধারণ। মাত্র তিনটি দৃশ্যে আমরা এ দুজনকে একত্র দেখেছি। এক বাল্যকালে জলে সাঁতার দিতে দিতে দুজনের কথোপকথন। দুই ফস্টরের কবল মুক্ত প্রতাপের ঘরে নিদ্রিত শৈবলিনী। তিন জলের উপর ভাসমান দুই প্রণয়ী পরস্পরের অতি নিকটে। প্রতাপ শৈবলিনীকে অনুরোধ

করছে তাকে ভুলে যাবার জন্য। এই ভোলবার অনুরোধই যেন না-ভোলবার শপথ। সামান্য তিনটি দৃশ্যে শৈবলিনী ও প্রতাপের গভীর প্রেম উদ্ভাসিত হয়েছে, এমন বোধহয় বহু প্রণয়লীলার বর্ণনা করেও অনেক লেখক কৃতকার্য হন না। বর্তমানে প্রেমের জৈবিক দিকটির অত্যধিক প্রাধান্য হওয়ার ফলে তার গভীর অপার্থিব মধুর সৌন্দর্য আর ফোটে না। চন্দ্রশেখর গ্রন্থে এই প্রায় নীরব প্রণয়লীলার একটি আশ্চর্য সৌন্দর্য আছে।

দলনীর কাহিনী এই উপন্যাসের একটি অচ্ছেদ্য অংশ নয়—তাকে যেন একটা আলগা সুতো দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন বাঁধা হল তার কোনো উদ্দেশ্য আছে—বঙ্কিমের অনেক উপন্যাসেই এই রকম দুটি অসংবদ্ধ কাহিনী পাশাপাশি চলে—সম্ভবত ইয়োরোপীয় বৃহৎ উপন্যাসের অনুসরণে লেখা হয়ে থাকবে। আজকালও কোনো কোনো উপন্যাসে এরকম লেখা হয়। তবে এক্ষেত্রে দলনী বেগম ও শৈবলিনীর সাক্ষাৎই হয়নি। কিন্তু দুজনেই একটি আইডিয়া। এক সামাজিক আদর্শের রূপায়ণে বঙ্কিমের প্রয়োজনীয় চরিত্র। সে আদর্শ হচ্ছে পতিই নারীর গতি। আর দলনী তাঁর এই আইডিয়ার সমর্থনে একটি দৃষ্টান্ত আর শৈবলিনী তার বিপরীত, তাই তার নরক ভোগ। সুখ কেউই পায়নি বটে তবে একজন মহান ও উন্নত, অন্যজন পতিত।

দলনীর প্রেম তার স্বামীর প্রতি। মীরকাশেমের বহুপত্নীর মধ্যে দলনী একজন মাত্র, তবু সে এমনি পতিগতপ্রাণা যে মীরকাশেম যখন মিথ্যা নিন্দা শুনে চূড়ান্ত হঠকারিতা করে তার মৃত্যুদণ্ড দিল সে তখন স্বেচ্ছায় বিষ পান করল।—প্রভুর আদেশ কেন বিষ পান করব না? এইখানে বঙ্কিমের মতে দলনী শৈবলিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠা। অবশ্য দৈবক্রমে দলনীর প্রেমাস্পদই তার স্বামী। তৎকালীন সমাজ নীতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বঙ্কিমের এই চিন্তা। এখানে তিনি কোনও মৌলিকতা দেখাতে পারেননি। কোনো চিরন্তন সত্য ধ্বনিত হয়নি। এক সময়ের একটি প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় নারীর মূল্য পুরুষের অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর চেয়ে বেশী নয়, সেই মূল্যবোধই

তাঁর রচনার কেন্দ্র। শৈবলিনী যখন তাঁর স্বাভাবিক মানব সত্বাকে অগ্রাহ্য না করে প্রথামত বিবাহিত স্বামীকেই চির আরাধ্য দেবতা না ভেবে তার প্রেমের পাত্রকে লাভ করতে চেষ্টা করল—সেই আদর্শ ভ্রষ্টার ঘটল অশেষ দুর্গতি। তার নরক ভোগ, তার বিবেক যন্ত্রণা।

শৈবলিনী ও প্রতাপ পরস্পরকে ভালোবাসত। শৈবলিনী প্রতাপকে আকাঙ্ক্ষা করত—কিন্তু নীতি ও আদর্শ তার মানবিকতার চেয়ে বড়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমকে উপেক্ষা করেন না—কিন্তু প্রেমের সৌন্দর্য তার উত্তরণে। প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রেমে তিনি এই পার্থক্য দেখেছেন। একজন মোহাকৃষ্ঠ আর একজন বাসনামুক্ত। বাসনা মুক্ত—সত্যই কি? না সামাজিক শাসন নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে সে বেশি মূল্য দেয়? তার সমস্ত অনুভূতি ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সে সমাজের অনুকূল করতে চায় ও সমর্থ হয়। শৈবলিনীর আকাঙ্ক্ষা জড়িত জীবন—সে প্রতাপকে ভুলতে পারে না। প্রতাপই কি পারে? কিন্তু যেহেতু শৈবলিনী নারী তার কাছে বঙ্কিমের প্রত্যাশা বেশি। এই প্রত্যাশা সব সময় অহেতুক নয়। যেমন ক্রুদ্ধা দলনী বেগম গুরগণ খাঁকে বলছে—তুমি নিপাত যাও—অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মিয়াছিলাম, স্ত্রীলোকের যে স্নেহ দয়া ধর্ম আছে তাহা তুমি জানো না।

বঙ্কিমের যুগে স্ত্রীলোকের স্নেহ দয়া ধর্ম সব কিছুরই এক লক্ষ্য—স্বামী। তার থেকে মনে মনেও ত্রুটি বিচ্যুতিতে তখনকার সমাজের মত বঙ্কিমও ক্ষমাহীন। কিন্তু লেখকের কাছে, প্রতিভাধর শিল্পীর কাছে আমরা প্রত্যাশা করি যে প্রয়োজন হলে তিনি সমাজের উর্ধ্বে উঠবেন। বঙ্কিম যে কখনো তা করেননি তা নয়, কিন্তু প্রায়শই তিনি আবদ্ধ। যেমন শৈবলিনীর জন্য পৃথক বজরায় ফষ্টর ব্রাহ্মণ পাচক রেখে দিল। কথাটা কতকটা অসম্ভব কিন্তু বঙ্কিমের মনে আছে তিনি শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের, পতি ও পত্নীর মিলন ঘটাবেন। তাহলে দুটি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার, এক ফষ্টর শৈবলিনীকে স্পর্শ করেনি, দুই শৈবলিনী যবনের স্পৃষ্ট অন্ন স্পর্শ করেনি! কারণ তাহলে তার আর রক্ষার উপায় নেই! তাই শৈবলিনী সুন্দরীকে বলছে—সাহেবের

সঙ্গে এ পর্যন্ত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই তাই আমাকে গ্রহণ করিলে আমার স্বামী ধর্মে পতিত হইবেন না। কিংবা—শৈবলিনীর পাক হইতেছিল। একজন ব্রাহ্মণ পাচক পাক করিতেছিলেন—ফষ্টর জানিতেন শৈবলিনী যদি না পলায় অথবা প্রাণত্যাগ না করে তবে সে অবশ্য একদিন টেবিলে বসিয়া যবনের কৃতপাক উপাদেয় বলিয়া ভোজন করিবে। এখন তাড়াতাড়ি করিলে সব নষ্ট হইবে। এই ভাবিয়া ভৃত্যদিগের পরামর্শে শৈবলিনীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ দিয়াছিলেন। কাহিনীর মধ্যে এই ঘটনা সহজেই বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু এই ঘটনার অবতারণার কারণই এই যে যবনের পাক খেলে অশুদ্ধা শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর গ্রহণ করলেন এরকম দেখান চলবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু সংস্কারের পূর্ণ পরিচয় শৈবলিনীর নরক দর্শনে। প্রতাপ, যাকে শৈবলিনী শিশুকাল থেকে ভালবাসেন, তাঁকে বিবাহের পরও ভালোবাসার জন্য অর্থাৎ পতি ভিন্ন অন্য পুরুষকে ভালোবাসার জন্য শৈবালিনীর নরক দর্শন করতে হয়। এই সংস্কার অবশ্য পৌরাণিক নয়—"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী সীতা মন্দোদরী সতী এর মধ্যে সীতা ছাড়া আর কেহ পতিব্রতা নয়। এবং সীতার সঙ্গে এদের পতিভক্তি তুলনীয়ও নয়। মনুর যে নারী শাসনের নির্দেশ, মনে হয় বঙ্কিম তারই অনুসরণ করছেন। তা না হলে এমন জঘন্য নরকের কল্পনা কোথা থেকে এল—আর কেনই বা এমন সুন্দর একটি তরুণীকে সে যন্ত্রণা ভোগ করতে হল? নরকে নারকীয় জীবজন্তু পুতিগন্ধময় কীট প্রভৃতির অত্যাচারে পীড়িত ভীত শৈবলিনীর পতি প্রেমের উদয় হল। ভয় দেখিয়ে প্রেমের উদয়, বড়ই আদর্শ ঘটনা। তখন ব্রহ্মচারী যিনি সম্ভবত কোনো মানসিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা তিনি বলছেন: যদি কখনো তাঁহাকে (চন্দ্রশেখরকে) দেখিতে চাও তবে সপ্তাহকাল দিবারাত্র এই গৃহমধ্যে একাকিনী বাস কর। অন্য কোনো চিন্তা মনোমধ্যে স্থান দিও না। এই সাতদিন কেবল একবার সন্ধ্যাকালে নির্গত হইয়া ফলমূল আহরণ করিও। তাহাতে পরিতোষজনক ভোজন করিও না। যদি এই অন্ধকার গুহায় সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া সরল চিত্তে অবিরত অনন্যমনা হইয়া কেবল

স্বামীর ধ্যান কর তবে তাহার সাক্ষাৎ পাইবে।

এইভাবে ধ্যান করতে করতে শৈবলিনীর হৃদয়ের পরিবর্তন হয়ে গেল। ব্রহ্মচারী তাকে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন ও যেভাবে স্বামী ধ্যান করবার পথ দেখিয়েছিলেন তাতে শৈবলিনীর চিত্ত চির প্রবাহিত নদীর মত ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল—শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালোবাসিল।—অবশ্য একথাটি পুরোপুরি সত্য বলা যায় না। বঙ্কিমের রচনা স্ত্রীধর্ম প্রচারের উৎসাহে মানবধর্ম প্রায় ভুলে গেলেও কাহিনীর মধ্যে মধ্যে সত্যের আলো দেখা যাচ্ছিল—মহৎদিগের লক্ষণই এই যে তা কেবল যুগোপযোগী মতামতের বাহন হতে পারে না।

প্রতাপের সঙ্গে শেষ দেখায় শৈবলিনী তাকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করে—স্বামী যদি আমায় পুনর্বার গ্রহণ করেন তোমার কি প্রণয় ভাগিনী হওয়া উচিৎ হয়—এবং যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে ততদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও না—

অর্থাৎ উৎকট নরক ভোগ করেও শৈবলিনী প্রতাপকেই ভালোবাসেন—এটা কি একনিষ্ঠা নয়? এটা কি সতীত্ব নয়? কিন্তু যেহেতু প্রতাপের সঙ্গে জাতি কুল মিলিয়ে মন্ত্র পড়ে বিবাহ হয়নি সে হেতু এই অতুলনীয় প্রেম বঙ্কিমের কাছে তথা তৎকালীন সমাজে নিন্দনীয়। এই সমাজের নীতি ও আদর্শের প্রচারেই বঙ্কিম ব্যাখ্যা।

বঙ্কিমের যুগ পর্যন্ত কাহিনীর মোড় ফেরাতে অবাস্তবের অবতারণা প্রচলিত ছিল, শরৎচন্দ্রে সেটা হয়ে দাঁড়াল ব্যামো। সমস্ত বিচ্ছেদের পরে জোড়া লাগাবার অব্যর্থ ঔষধ। হঠাৎ এক পক্ষের অসুখ হবে এবং তখনই অপরাধী পক্ষ ছুটে এসে পায়ে পড়বে। এও প্রায় অলৌকিক ঘটনার মতই। সংসারে রোগ শোক আছে তবে তা মিলনের আঠা নয়। সেদিক থেকে অলৌকিক বরং ভালো। শেক্সপীয়ারও এই অলৌকিককে জায়গা দিয়েছেন। বঙ্কিম হয়ত সম্মোহনের কথা ভাবছিলেন। ফ্রয়েড প্রভৃতির আবির্ভাবের আগে থেকেই এদেশে অবচেতন মনের বিভিন্ন

স্তরের কথা জানা ছিল—এই গূঢ় গভীর মনের অন্ধকার থেকে শৈবলিনীর অপরাধ বোধ উঠে এসে তার চার পাশে যে নরকের সৃষ্টি করেছিল এ পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি—ভাবতে পারি বঙ্কিমের নরক কোনো ভূতল স্থিত আবাস নয়—তা মনের একটা অবস্থা মাত্র ; কিন্তু প্রতাপকে ভালোবাসার কারণে তা পুতিগন্ধময় রুধির স্রোতে লিপ্ত হবে কেন ?

এই দৃষ্টিভঙ্গী কৃত্রিম এবং কোনো একটি সমাজ ব্যবস্থার অনুকূল—যে সমাজে নারী বিশেষভাবে নির্যাতিত। শৈবলিনীর এত নির্যাতন বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তাকে সংসারে পতিগৃহে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই। যে সমাজে বঙ্কিম বাস করতেন, সাহিত্যিক ও স্রষ্টা হয়েও বঙ্কিম সে সমাজকে অতিক্রম করতে পারেননি বরং সেই সমাজের সব ক'টি ভাবাবেগকে সুদৃঢ় করাই বঙ্কিমের অভিপ্রায়। অর্থাৎ স্বামী ভিন্ন অন্য কাহাকে ভালোবাসা যদিও তা বিবাহের পূর্বের বাল্য প্রণয়—তবু তা স্বপ্নস্পৃষ্ট সুন্দরীর মুখে যেন সমস্ত সমাজের হয়ে বলছে—মার! মার, যত পারিস মার আমি উহার পাপের সাক্ষী—মার মার ইত্যাদি। সেকালে সমাজের নিয়মই ছিল প্রধান, মানুষ সেই নিয়মের যন্ত্র মাত্র, বঙ্কিম সেই কালের মানুষ তাই তাঁর লেখার মধ্যে আমরা সেই কালোপযোগী চিন্তা শুধু নয়, লোকহিতায় তার প্রভাবও পাচ্ছি। কেবল 'চন্দ্রশেখর' নয় বঙ্কিমের অনেকগুলি কাহিনীই তৎকালীন সুসম্বদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার অনুকূলে প্রচার। বর্তমান কালে যেসব রচনাকে প্রচারধর্মী বলে নিন্দা করা হয়ে থাকে সেগুলিও কোনো অংশে তার চেয়ে কম প্রচারধর্মী নয়।

বঙ্কিমের অধিকাংশ রচনাই আমাদের চার পাশের কাল আমাদের সীমা, আমাদের প্রথা সংস্কারও আমাদের সীমা। লেখক সেই সীমার মধ্যে ধৃত। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন লেখক আসেন যাঁরা পুরাতন প্রথা সংস্কারের গণ্ডী ছিন্ন করে নূতনের প্রবাহ আনেন। তাঁদের আহ্বানেই সেই গান—বাঁধ ভেঙ্গে দাও—কিংবা ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।

বার বার মানুষের সমাজকে নূতন নূতন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে—সেই নূতন পথে যাত্রার দিকনির্ণয় করেন সাহিত্যিক লেখক

চিন্তাবিদ, তখন তাঁদের রচনায় কোনো মতবাদের প্রচার থাকলেও তা সমাজকে এগিয়ে দেয়। যেমন টলস্টয় বা গোর্কি—রুশ বিপ্লবের তাঁরাই পুরোধা। আবার যখন পুরানো মূল্যবোধগুলি জীর্ণ হয়ে গেলেও কোনো ক্ষমতাশালী লেখক নূতন পথের সন্ধান দিতে পারেন না তখন সেইখানে তাঁর পরাজয়। যখন দলনী বেগম বলেন 'ঈশ্বরের বিচারই বিচার আমি অন্য কোনো বিচার মানি না।'—তখন বঙ্কিম এক পা এগিয়ে যান। অর্থাৎ সমাজের বিচারের উর্ধ্বে সত্যের নির্দেশকে মর্যাদা দেন। যখন চণ্ডীদাস বলেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য' তখন বহুকাল পূর্বে জন্মেও নূতন যুগের কথা বলেন, আর যখন ঈশ্বরগুপ্ত বাঙালীর মেয়েকে বিদ্রূপ করে বলেন, 'আর ক'টা দিন সবুর কর পাবেই পাবে দেখতে পাবে, আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।' তখন ঐ একটি লাইনেই তাঁর মানবদ্রোহিতা প্রকাশ পায়। সমাজের সবচেয়ে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত যে মানুষ তার প্রতি ব্যাঙ্গোক্তি প্রমাণ করে তাঁর সঙ্কীর্ণতা। লেখক কোনো মতের প্রচার করছেন কিনা তার উপর সাহিত্যের গুণাগুণ নির্ভর করে না। মতের প্রচার করলেই শিল্প ধর্ম সার্থক হয় না—মতটা কি তার উপরই রচনার মূল্য। লেখক যা বলেছেন তা কত বেশী মানুষের উপযোগী—তার ব্যাপ্তি কতটা এবং তা দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে সর্বকালের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কিনা মহৎ সাহিত্যের সেই মাপকাঠি, সেইটেই কষ্ঠিপাথর।

বঙ্কিমের রচনায় কোনো কোনো স্থানে সেই কষ্ঠিপাথরে সোনার দাগ পড়ে কোথাও বা তা লৌহ শৃঙ্খলের ঝনঝনানি শোনায়।

দত্তা ও গোরা

'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন্ তবে অবশ্য লিখিবেন।'

"যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থ সাধন যাহার উদ্দেশ্য সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধরা মহাপাপ।"

বঙ্কিমের এই মন্তব্য অবিচল সত্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমি দত্তা ও গোরা এই দুটি প্রসিদ্ধ উপন্যাসের আলোচনা করব। আমাদের বাল্যকালে শুনতাম—'গোরা'র ছায়া পড়েছে 'দত্তা'র উপরে। শরৎচন্দ্রের একটি প্রসিদ্ধ সবল উপন্যাস দত্তা। তিন বাল্যবন্ধু বনমালী জগদীশ ও রাসবিহারী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করল। বাল্যকালে তারা অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিল। বড় হয়ে বনমালী গ্রামের লোকের দুর্ব্যবহারে শহরে চলে গেলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করে বিত্তশালী হলেন ও জমিদারী বাড়ালেন। দেশে তার জমিদারী দেখাশুনো করতেন রাসবিহারী। রাসবিহারার এক ছেলে। ওদিকে জগদীশরা ছিলেন বিরাট জমিদার কিন্তু তিনি ছন্নছাড়া হয়ে গেছেন। জুয়া ও মদে তার সর্বস্ব গেল। শেষ পর্যন্ত পরম সুহৃদ বনমালী তাকে প্রচুর টাকা ধার দিয়ে দিয়ে রক্ষা করতেন। এই ঋণভার মাথায় নিয়েই তিনি মারা গেলেন। জগদীশের এক ছেলে নরেন, ডাক্তার। বনমালীর এক কন্যা বিজয়া। বনমালী মনে মনে ঠিক করেছিলেন নরেনের সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ দেবেন। এদিকে রাস-বিহারীরও তাই উদ্দেশ্য। তিনি চেষ্টা করছেন জমিদারের একমাত্র কন্যা বিজয়ার সঙ্গে বিলাসবিহারীর বিবাহ দিয়ে জমিদারী ও বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত হস্তগত করবেন। তিনি বনমালীর কাছাকাছি থাকেন; পুত্র বিলাসবিহারীর সঙ্গে ইতিমধ্যে বিজয়ার আলাপ পরিচয় হয়েছে এবং বিলাসকে একরকম ভালোও লেগেছে। বিবাহ স্থির হচ্ছে—এমন সময়

বনমালী মারা গেলেন ও মৃত্যু সময়ে তার পরম স্নেহের পাত্রী একমাত্র কন্যাকে বলে গেলেন যে দেনার দায়ে বন্ধুর সম্পত্তি যেন বিজয়া বিক্রি না করে। কিন্তু বিজয়া তখন বিজ্ঞ চতুর রাসবিহারীর হাতে। রাসবিহারী জানতেন বনমালীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বিজয়ার সঙ্গে জগদীশের পুত্র নরেনের বিয়ে হয়। রাসবিহারী তাই দেনার দায়ে তার বাড়ি কিনে নিয়ে তাকে দেশছাড়া করতে উদ্যত।

এই ঘটনার নানা ঘাতপ্রতিঘাতে বিজয়ার সঙ্গে সরলচিত্ত নরেনের প্রেম এবং পূর্ব সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে তাদের বিবাহ। এই গেল দত্তার কাহিনী। এখন দেখা যাক গোরার কাহিনীটি কী রকম। গোরা একজন আইরিশম্যানের ছেলে। মিউটিনীর সময় ঘটনাচক্রে একজন সরকারী কর্মচারী বাঙালী ব্রাহ্মণের ঘরে তাকে জন্ম দিয়ে তার মা মারা যান। কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ী তার পালক পিতা মাতা। এদের ঘরে মানুষ হয়ে ক্রমে গোরা একজন সংস্কার পরায়ণ হিন্দু হয়ে উঠল। তার দেশপ্রেম ও হিন্দু সংস্কার যেন একই অঙ্গে প্রবাহিত। যা কিছু দেশজ গোরা তার সংরক্ষণে ব্যাগ্র। ব্রাহ্মদের উপরে সে ক্ষিপ্ত। কারণ তার ধারণা ব্রাহ্মরা ইংরেজের অনুসরণকারী সমাজদ্বেষী। কিন্তু উদার চরিত্র ব্রাহ্ম পরেশ বা তার পালিত কন্যা সুচরিতা গোরাকে আকর্ষণ করে কিন্তু গোরা ব্রাহ্মদের ঘৃণা করে এই তার সমস্যা। গোরার একজন গোঁড়া ভক্ত অবিনাশ। এদিকে গোঁড়া ব্রাহ্ম পানুবাবুর কাছে সুচরিতা বাগদত্তা। এর মধ্যে আবার সুচরিতার মাসী হরিমোহিনী এসে উপস্থিত। তিনি প্রথমে অত্যাচারিতা বঞ্চিতা বিধবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও ক্রমে নিজেই একজন জবরদস্ত অভিভাবকে পরিণত হয়ে মধুর স্বভাবা সুচরিতাকে জব্দ করে বন্দী করে ফেলতে চাইছেন। এইসব ঘটনা স্রোতে যখন উপন্যাসের গতি দ্রুত বয়ে চলেছে তখন গোরা হঠাৎ জানতে পারল যে সে জাতিতে আইরিশ—এই পরমপ্রিয় ভারতভূমির সে কেহ নয়; সে হিন্দু নয়, ব্রাহ্মণ নয় এমন কি ভারতীয়ও নয়; এখন এই দুই কাহিনীর মধ্যে মিল আছে তা না হলে পাঠকের মনে দীর্ঘদিন ধরে এ আলোচনা চলত না। এই সাদৃশ্যগুলি দেখা যাক—পানুবাবু একজন

গোঁড়া ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা তার মধ্যে মূর্ত্ত, তাছাড়া তিনি ভণ্ড। যথার্থই তিনি সত্য ধর্ম ও ন্যায়ের জন্য চেষ্টিত নয়, মুখে ধর্মের বুলি বলে স্বার্থসাধনে চেষ্টিত। স্বার্থ হচ্ছে সুচরিতার পাণিগ্রহণ। ওদিকে দত্তাতে বিলাসবিহারী ও তার পিতা রাসবিহারী দুজনেই এই একই চরিত্রের মানুষ। এঁদের ধর্মকথার আড়ালেও স্বার্থের খেলা। সে স্বার্থ হচ্ছে সম্পত্তি ও বিজয়াকে গ্রাস করা। এদিকে বিজয়া নরেনকে ভালোবেসে জালে পড়া পাখীর মত ছটফট করছে।

দয়াল উদার চরিত্র ব্রাহ্ম হলেও তিনি বিজয়ার হিন্দুমতে বিবাহ দিয়েছেন। এই অংশে তিনি কতকটা পরেশবাবুর মত। পরেশবাবুও স্বীয় কন্যা ললিতাকে গোরার বন্ধু বিনয়ের সঙ্গে হিন্দুমতে বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন। মোটামুটি চরিত্রগুলির এই মিল। কিন্তু চরিত্রগুলোর মিল সত্ত্বেও দুটি কাহিনীর অন্তর্বর্ত্তী চিন্তাপ্রবাহ একেবারে দুই রাজ্যের।

অনেকে আজকাল বলেন শরৎচন্দ্রের লেখা বেশি প্রগতিশীল। রবীন্দ্রনাথের রচনার চেয়েও তাতে 'প্রগতির' অংশ কিছু বেশি। আলোচ্য কাহিনী দুটি থেকে আমরা সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। আমি পুনর্বার বলছি আমরা সেই সব রচনাকেই মহৎ বলব যার মধ্যে কালোত্তীর্ণ কোনো তত্ত্ব থাকে। তাকে প্রগতিশীল বলব যার গতি ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত এবং সেই সাহিত্যই সুসাহিত্য যা মানুষকে এক করে। এক করে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষকে। এক করে দূর ও নিকটের মানুষকে। শরৎচন্দ্রের দত্তা পড়লে বোঝা যায় যে কতগুলি বিষয়ে তাঁর মতামত পশ্চাৎমুখী। তার মধ্যে মেয়েদের ভূমিকা অন্যতম। যেমন প্রতিটি মেয়ের কর্তব্য হচ্ছে নিজে অভুক্ত থেকে পুরুষমানুষকে খাওয়ানো। এরকম একটি ঘটনার বর্ণনা সকলেই লিখতে পারে, কারণ এ সে সময়কার প্রচলিত বিধি কিন্তু শরৎচন্দ্রের এটি মতও বটে— একবার নয় বার বার তিনি এ কথা লিখেছেন। বিজয়া বলছে "বাবা বলতেন, সে দেশের ভারি দুর্ভাগ্য যে দেশের মেয়েরা অভুক্ত থেকে পুরুষদের খাওয়াতে পারে না সঙ্গে বসে খেতে হয়। আমিও ঠিক তাই বলি।"

এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মমেয়েরা এই তুষ্কর্ম করেন বলে তাদের নিন্দা। বিজয়াও ব্রাহ্ম কিন্তু শরৎবাবুর নায়িকাদের এই বিশেষ গুণটি থাকবেই। এমনকি 'শেষ প্রশ্নে'র অতি আধুনিক চরিত্র কমলও এইভাবে খাওয়ান পদ্ধতিতে নারীত্বের উৎকর্ষ দেখাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকটি নারী চরিত্রের মোটামুটি কাঠামো একই। তা অভিমানের পুটুলি, পুরুষের সেবায় সতর্ক।

এই কাহিনীর চরিত্রগুলি সবাই ব্রাহ্ম। কাজেই বিজয়ার সঙ্গে নরেনের হিন্দুমতে বিবাহ সম্ভব। বিজয়া নরেনকে জিজ্ঞাসা করছে, আপনি কি জাত মানেন ? নরেন উত্তর করছে, মানি বই কি। হিন্দু-সমাজে যে জাতিভেদ আছে একের সঙ্গে অপরের বিবাহ হয় না, একি আপনিও মানেন না ?

অর্থাৎ হিন্দুসমাজের জাতিভেদ সম্বন্ধে নরেনের মত কতকটা গোরার মতই যেন শোনাচ্ছে কিন্তু তুজনের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অনেক।

দত্তা উপন্যাসে যে দ্বন্দ্ব তা স্বার্থের সংঘাত। তা একেবারেই প্রাত্যহিক জীবনের দ্বন্দ্ব কিন্তু তার মধ্যে একটি উঁচু তারও অবশ্য বাঁধা আছে নরেনের নির্লিপ্ততায়—নরেন ও বিলাসবিহারী পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু তুজনের মূল্যবোধের অসীম প্রভেদ। নরেনের কাছে টাকাপয়সা জমিদারী লাভের স্বার্থ দ্বন্দ্ব একেবারেই পরিত্যাজ্য। ওদিকে বিলাসবিহারী ও তস্য পিতা রাসবিহারী তুজনে মিলে কেবল তারই চেষ্টা করছেন। নরেন উদার, কিন্তু রাসবিহারীরা সঙ্কীর্ণচিত্ত। আমরা শুনেছি শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁর অন্য রচনায়ও এর কিছু কিছু নিদর্শন আছে তবে দত্তায় তা উগ্ররকমে দেখা গেল। ব্রাহ্ম সমাজের সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার কথা দত্তায় খুব ভাল করে দেখান হয়েছে। দেখান হয়েছে কিভাবে সত্য ধর্ম আদর্শ, কর্তব্য ইত্যাদি বুলির পিছনে স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে কিন্তু কোথাও হিন্দুসমাজের কুসংস্কার ইত্যাদির উল্লেখ পর্যন্ত নেই। একে বলে একদেশদর্শিতা। যদিও বামুনের মেয়ে প্রভৃতি অন্যান্য উপন্যাসে হিন্দুসমাজের উৎকট প্রথা সংস্কারের চিত্র দেখান হয়েছে। শরৎচন্দ্র কুলীনের বহু বিবাহ সমর্থন করেন না ঠিকই

কিন্তু খাওয়া-ছোঁয়ার জাত বিচার মনে হয় তাঁর সব নায়ক নায়িকারাই মানে। অন্তত বিপ্রদাসের মত উদার চরিত্র সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন নায়কও মানেন। এমনকি বিপ্লবী সব্যসাচীকে খাওয়াবার সময় ক্রিশ্চান ঘরে মানুষ ভারতী স্নান করে পট্টবস্ত্র পরে আসে। ব্রাহ্মসমাজে ভণ্ড প্রচুর থাকতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের দান কী অস্বীকার করা যায়? ব্রাহ্মসমাজ কি কোনো প্রগতির দিকে নিয়ে যায়নি? পল্লীসমাজের 'রমার' অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন ঘটালো কে? ব্রাহ্মসমাজ কি সমগ্র সমাজকে এগিয়ে নিতে কিছুই করেনি? কেবলি সাম্প্রদায়িকতার চেষ্টা করেছে? গোরাও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে উগ্র, সে গোঁড়া হিন্দু, তার শিষ্য অবিনাশ আর এক কাঠি উপরে। অবিনাশের হিন্দুত্ব এক সঙ্কীর্ণমনা সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত। গোরার হিন্দুত্ব তার দেশপ্রেম থেকে উদ্ভূত। পানুবাবু সঙ্কীর্ণমনা সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম আর পরেশবাবুও ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ রূপায়িত। এ বই-এ একদেশদর্শীতা নেই, লেখকের পক্ষপাতিত্ব নেই। সব ধর্মের মধ্যেই যা যথার্থ তা সকল মানুষের জন্য আর সেই ধর্মাচরণকেই সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে খণ্ডিত করে ক্ষুদ্র মানুষ।

মহৎকাব্যের যে লক্ষণ গোরায় অন্তসলিলা তা হচ্ছে একটি মহৎ বক্তব্য। সমস্ত উপন্যাসটি একটি উঁচু তারে বাঁধা। এই গ্রন্থের নরনারী কেবল নিজেদের সুখ-দুঃখ নিয়ে ভাবছে না—তাদের সুখ-দুঃখ তাদের চারপাশের বৃহৎ সমাজের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে গ্রথিত। আনন্দময়ী এক আশ্চর্য চরিত্র। গৃহবধূ এবং অন্তপুরবাসিনী নারী, যার চারিদিকে প্রথা সংস্কারের দেয়াল, তার চরিত্রে উদ্দীপ্ত জীবন্ত বিশ্ববোধ এক অসাধারণ কল্পনা। এই যে প্রাত্যহিক ঘটনা সমাবেশে আন্দোলিত বিক্ষুব্ধ সংঘাতে মুখরিত কতগুলি জীবন তা কেবল সাংসারিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রূপ নিচ্ছে না—তার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সমস্যা সর্বমানবের সমস্যাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এই কারণেই এই বই দেশের ও কালের সীমারেখা পার হয়ে গেছে গোরা যখন লেখা হয় তখন বিবেকানন্দ বাংলাদেশের হৃদয়াকাশে উজ্জ্বল। অনেকে বলেন রবীন্দ্রনাথ কখনো বিবেকানন্দর কথা লেখেননি।

আমাদের যতদূর মনে হয় গোরার চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার যুগ্মরূপকে প্রকাশ করেছেন—ঘটনা সংস্থানেও মিল আছে। নিবেদিতা আইরিশ মহিলা, গোরাও আইরিশ। আইরিশ জাতি অনেক-দিন থেকেই স্বাধীনতার প্রতীক চিহ্ন হয়ে উঠেছিল। গোরার হিন্দুয়ানী, দেশপ্রেম সম্ভূত। হিন্দুর প্রথা সংস্কারের নানারকম যুক্তিহীন কদাচার, তার জাতিভেদ ইত্যাদি পাশ্চাত্য দেশে নিন্দিত। ইংরেজ তাকে অবজ্ঞা করে এই সব কারণ দর্শিয়ে গোরা তাই সমস্ত কুসংস্কারগুলির ভিতরও যুক্তির প্রয়োগ করে আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে চায়। "আমার দেশের সবকিছুই আমার কাছে পবিত্র।" অতি সতেজ দীপ্তিমান দেশপ্রেম বিবেকানন্দকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল। হিন্দুর সমস্তকিছুই তাঁর কাছে এক নূতন অর্থে অর্থবান হয়েছিল। যে বিবেকানন্দ যুক্তিবাদী বৈদান্তিক—যাঁর হিমালয়ে প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত মঠে (মায়াবতীতে) কোনো মূর্তিপূজা হয় না—কোনো বিগ্রহ রাখা নিষিদ্ধ, তিনিই আবার অন্যত্র কালিপূজা করেন। যিনি মুচি-মেথরকে ভাই বলে আহ্বান করেছেন, তিনিই আবার নিবেদিতাকে দিয়ে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালান। বিবেকানন্দের মধ্যে কোনো পরস্পরবিরোধী ভাব কি রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য হয়েছিল? বিবেকানন্দর যুক্তিবাদী মন যা দেখে তাঁর দেশপ্রেমিক মন কি তার বিরুদ্ধে যায়?

গোরা নীচ জাতির রান্না খায় না তাই নাপিতের ঘরে আহার না করে সে চলেছে নিকটবর্ত্তী একমাত্র ব্রাহ্মণ মাধব চাটুজ্জের বাড়ির দিকে। কিন্তু মাধব দুর্বৃত্ত, প্রজাপীড়ক তহসিলদার। পুলিশের নির্যাতনের সহায়ক।

তাই যদিও 'ক্ষুধায় তৃষ্ণায় গোরাকে অভিভূত করিয়াছিল কিন্তু দুর্বৃত্ত অন্যায়কারী মাধব চাটুজ্জের অন্ন খাইয়া তবে জাত বাঁচাইতে হইবে একথা যতই ভাবিতে লাগিল ততই তাহার অসহ্য বোধ হইল।...তাহার মনের মধ্যে বিষম একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সে ভাবিল পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে একি ভয়ংকর অধর্ম করিতেছি।'

এইরকম সত্যদর্শন গোরায় ছত্রে ছত্রে আছে। তাতে কাহিনীকে ছাপিয়ে বই বক্তব্য প্রধান হয়ে উঠছে কিন্তু গল্পের রস ক্ষুণ্ণ হয় নি।

পানুবাবুর ব্রাহ্ম সাম্প্রদায়িকতা সুচরিতাকে পীড়া দিয়েছিল। দেখা গেল হরিমোহিনীর হিন্দু দেশচারের বেড়িও বড় কম নির্যাতক নয়—এই দুই সঙ্কীর্ণ ভূমির মধ্যে আনন্দময়ী যেন মহাকাশের অসীমতা নিয়ে এলেন। তিনি সেই নারী যিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণের গণ্ডি পার হয়ে মানব মহিমা প্রকাশ করেছেন। সত্যের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়ী এক আশ্চর্য সৃষ্টি। গোরার জাত্যাভিমান যখন চূড়ান্তে পৌঁছেছে, জেলের মধ্যে অস্পৃশ্যর ছোঁয়া খেয়েছে বলে গোরা যখন হিন্দু সংস্কার মতে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছে তখনই কৃষ্ণদয়ালের মৃত্যুশয্যায় গোরা জানতে পারল সে নিজেও অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ। একটি প্লটের মধ্যে দিয়ে, ঘটনা সংস্থানের মধ্যে দিয়ে একটি মহৎ বাণী উচ্চারিত হল। যা অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেও তেমন উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হত না।

গোরা ভারতীয়। হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের সমস্ত সংস্কার-গুলিকে সে দেশের জিনিস বলে আঁকড়ে ধরে আছে। মাঝে মাঝে সে বুঝতে পারে জাতিভেদে বিচ্ছিন্ন, কুসংস্কারে জীর্ণ এই হিন্দু সমাজের ত্রুটি কোথায়। সে বুঝতে পারে হিন্দুসমাজ নিজের চারদিকে একটি অচলায়তনের দেয়াল তুলেছে। খাওয়া ছোঁওয়া বিধিনিষেধ সে একটি নিষেধেরই রূপ। সর্বত্রই না, হাঁ কোথাও নেই। তা সত্ত্বেও সে একটি কাল্পনিক আদর্শ ভারতবর্ষ মনে ভেবে নিয়েছিল। তাই গোরা বলছে "আমাদের ধর্মতত্ত্বে যে মহত্ত্ব আছে, ভক্তিতত্ত্বে যে গভীরতা আছে, শ্রদ্ধা প্রকাশের দ্বারা সেইখানেই আমার দেশের হৃদয়কে আমি জাগ্রত করতে চাই। যেখানে তার সম্পদ আছে সেইখানে তার অভিমানকে আমি উদ্যত করে তুলতে চাই। আমি তার মাথা হেঁট হতে দেবো না। নিজের প্রতি তার ধিক্কার জানিয়ে নিজের সত্যের প্রতি তাকে অন্ধ করে দেব না...।"

মনে হয় এইরকম প্রতিজ্ঞা ছিল বিবেকানন্দেরও। কিন্তু সত্য কি? কোনো দেশের কোনো ধর্মের এমন কোনও বিশেষ সত্য কি আছে যা

সব মানুষের গ্রহণযোগ্য নয়? গোরার দেশপ্রেমের মধ্যে বিশ্ববোধ খণ্ডিত। গোরা তার ভ্রম বুঝতে পারল তার পিতার মৃত্যুশয্যায় যখন কৃষ্ণদয়াল বললেন যে গোরা তাঁর শ্রাদ্ধাধিকারী নয়। ব্যাকুল গোরা আনন্দময়ীকে জিজ্ঞাসা করল, "মা তুমি আমার মা নও?" সেই মুহূর্তে গোরা বুঝতে পারল যে সে ব্রাহ্মণ নয়, হিন্দু নয়, এমনকি ভারতীয়ও নয়, সে মুক্ত হয়ে গেল বিধিনিষেধের বেড়া থেকে। তার কাছে আর ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানের বেড়া রইল না—তখন সবাইকে সে গ্রহণ করতে পারে, সকলের ছোঁয়া সে খেতে পারে এই মুক্তির আনন্দের মধ্যে গোরা তাঁর জননী আনন্দময়ীর কথাগুলি বুঝতে পারল যে শিশুকে কোলে নিলেই বোঝা যায় যে মানুষের জাত নেই। অর্থাৎ ভালবাসলে বোঝা যায় মানুষের জাত নেই। বিশ্বমানবতার বাণী এমন করে একটা গল্পের মাধ্যমে আর কে কোথায় বলেছে? গোরা, হিন্দুসংস্কারে আবদ্ধ তিলক কাটা পট্টবস্ত্র পরা গোরা তখন মুসলমান আয়ার হাতে জল পান করে মুক্তির আনন্দ লাভ করল।

একদিক থেকে গোরার যুক্তিতে হিন্দু সমাজের সমস্ত বিধিনিষেধ ধর্মকর্মের আচারপরায়ণতার চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা করে দিলেন লেখক। তারপরই গল্পের প্লটের উন্মোচনে সেই প্রাসাদের ভিত্তিই নড়ে গেল—গোরার সবলে ঘোষিত যুক্তিগুলি চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। কোথায় রইল তার হিন্দুত্ব অভিমান, তার ব্রাহ্মণত্বের গর্ব।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সোভিয়েট দেশগুলিতে গোরা বইটির সমাদরের কথা···।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবে যোগ দিতে সোভিয়েট দেশগুলিতে গিয়েছিলাম। হাঙ্গেরিতে বালাতন ফুরেড নামে স্বাস্থ্য নিবাসে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল। ১৯২৬ সালে ঐখানে রবীন্দ্রনাথ একটি লিন্ডন গাছের চারা পুঁতেছিলেন। সেই গাছ এখন ডালপালা ছড়িয়ে একটি সতেজ বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তার নীচেই মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় কেহ কেহ রবীন্দ্রকাব্য থেকে আবৃত্তি করছিল। একটি যুবক প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে আবৃত্তি করলেন।

কিছুক্ষণ শুনবার পর বুঝতে পারলাম যে সে গোরা বই থেকে আবৃত্তি করছে। আনন্দময়ী ডাক্তার ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারলাম গোরা থেকে সেই অংশ আবৃত্তি করা হচ্ছে যেখানে কৃষ্ণদয়াল গোরাকে বলছেন, 'তুমি আমার শ্রাদ্ধাধিকারী নও' এবং গোরা বুঝতে পারল যে সে এঁদের সন্তান নয়। ভদ্রলোক প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আবৃত্তি করে গেলেন। ইতিপূর্বে কখনও কাউকে এতক্ষণ ধরে গদ্য আবৃত্তি করতে শুনিনি।

এর পরে সোফিয়াতে ও অন্যান্য অনেক জায়গাতেই গোরার আবৃত্তি ও গোরা সম্বন্ধে আলোচনা শুনলাম। আলোচনাগুলি রুশ ভাষায় হওয়ায় সঠিক বুঝতে পারিনি। সে জন্য আমি আমার সঙ্গিনী দোভাষী মারিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের দেশে গোরার এত সমাদর কেন?" ও বইত, ভারতবর্ষের একান্ত ঘরের কথা। ভারতবর্ষের অতীত সংস্কারের আলোচনা। এ তোমাদের ভাল লাগে কি করে?" তার উত্তরে সে আমাকে বলেছিল, "গোরা একটা আশ্চর্য বই। এতে আমরা গোটা ভারতবর্ষকে পাচ্ছি। পাচ্ছি তার অতীতকে, এবং পাচ্ছি তার বর্তমান ও ভবিষ্যতের অভ্যুদয়কে। অতীত ভারত কি বলেছে এবং নবীন ভারত কি চাইচে তা সবই আমরা এ বই থেকে বুঝতে পারছি। তা ছাড়া মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে জাত ধর্মের গণ্ডি কত তুচ্ছ তা একটা প্লটের মাধ্যমে এরকম করে কেউই দেখায়নি। আনন্দময়ী বলছেন, 'শিশুকে কোলে নিলেই বোঝা যায় মানুষের জাত নেই।' এ সত্য যদি ইউরোপিয়ান মেয়েরা বুঝতে পারত তাহলে কি ছয় মিলিয়ান ইহুদী গ্যাসচেম্বারে প্রাণ দিত? এই মানুষের ঐক্যের কথা তোমাদের কবি একটি গল্পের প্লটের মধ্যে এমন করে প্রকাশ করেছেন যা বোধহয় জগতের আর কেউ করেননি?

মারিয়ার কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম কোন সাহিত্যের মধ্যে যখন একটি মহৎ সত্য উচ্চারিত হয় তখন তার আবেদন লেখকের নিজের দেশের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, দেশে দেশে বিভিন্ন মানুষ তার নিজ নিজ জীবন ও সমস্যার মধ্যে সে সত্যটিকে দেখতে পায় ও

নিজের মতন করে তাকে গ্রহণ করে।

এইখানে একটা কথা বলছি—গোরার পরিশিষ্ট অংশ আমার ভাল লাগেনি। মনে হয় যেন সমস্ত বইটার সঙ্গে ওর সঙ্গতি নেই। বিশ্ব-চেতনার উদ্বোধনের পরে হঠাৎ ভারতবর্ষ কথাটি যেন কিরকম খাপ খায়নি। যাই হোক আমি শুনেছি স্বয়ং লেখকের মুখেই। নিবেদিতার প্রবল অনুরোধে উনি বাধ্য হয়ে ওই অংশটুকু লিখেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক অনেক খ্যাতিমান মানুষদের কতখানি পার্থক্য ছিল।

ভারতে ইংরেজী ভাষা

সম্প্রতি ভাষা আন্দোলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে, তার মধ্যে একটি পুরানো প্রশ্ন নতুন করে আলোচিত হচ্ছে। প্রশ্নটি ভারতবর্ষে ইংরেজীর স্থান। ইংরেজের স্থান নয়, তাদের স্থানচ্যুত করা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভাষাকেও সমুদ্র পারে ফেরত দেওয়া কর্তব্য কিনা এ নিয়ে তর্ক উপস্থিত হয়েছে। বর্তমান ভাষা আন্দোলন একটি ত্রিভূজের আকৃতি নিয়েছে। ভবিষ্যৎ সর্বভারতীয় ভাষারূপে হিন্দী, বিভিন্ন প্রদেশের মাতৃভাষা ও ইংরেজী, এই তিনটি বাহু বিস্তার করে সমস্যা সম্প্রতি বহ্বাস্ফোটে রত।

অবশ্য একটি বিষয়ে প্রায় সকল পক্ষই মোটামুটি একমত যে মাতৃ-ভাষাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিক্ষার বাহন' এবং উপযুক্ত বাহন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু প্রদেশের রাষ্ট্র পরিচালনা শাসন ও বিচার প্রভৃতি সমস্ত কাজ মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্পন্ন না করলে সেই যুক্তির পরিণতি হয় না। চৌদ্দটি প্রাদেশিক ভাষার যথাবিহিত উন্নতি হিন্দীকে রাষ্ট্র-ভাষারূপে গ্রহণ করলে ব্যহত হবে, এ সম্ভাবনা প্রবল হওয়াতেই ভাষা সমস্যা এমন জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দীকে সর্বভারতীয় প্রধান ও জাতীয় ভাষারূপে গণ্য করলে মাতৃভাষার সঙ্গে কি বিরোধ ও সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, তা নিয়ে নানা স্থানে আলোচনা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সে সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা না করে কেবলমাত্র ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতার বিচার করব। যদিও দেশের একটি বড় অংশ ইংরেজী ভাষা শিক্ষা, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের জ্ঞান আহরণের সার্থকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। এমন কি এ আলোচনা নূতন করে উত্থাপন করা পুরনো যুক্তিরই রোমন্থন ছাড়া কিছু নয়, তবু অনেক পুরনো কথা নতুন করে উচ্চারণের প্রয়োজন হয় যখন দেখি নানা কু-যুক্তি, ধারালো জাত্যাভিমান বা রাষ্ট্রনৈতিক কূটবুদ্ধির দ্বারা সহজ কথাগুলি জটিল হয়ে উঠছে।

যারা এদেশে ইংরেজী ভাষার স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ হানিকর মনে করেন,

তাঁদের যুক্তিগুলি একে একে বিবেচনা করা যাক। এসম্বন্ধে তাঁদের প্রধান ও প্রথম কথা এই যে, ইংরেজী বিদেশী ভাষা। ভারতের মত একটি নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ বিদেশী ভাষাকে, বিশেষ শত্রুপক্ষীয়ের ভাষাকে স্থান দেবে কেন, মর্যাদা দেবে কেন! তাছাড়া এখনও ধারণা আছে ইংরেজই রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য এই ভাষা জোর করে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে এবং তার ফলে ইংরেজী শিক্ষায় আমাদের ক্ষতিই হয়েছে, উপকার হয়নি। কি ক্ষতি? সেই ক্ষতির কথাটি ইংরেজী ভাষা রক্ষার বিপক্ষে দ্বিতীয় এবং প্রবল যুক্তি। ক্ষতি এই যে, তা জনসাধারণের কাছ থেকে, অধিকাংশ দেশবাসীর কাছ থেকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে পৃথক করেছে। সেই শিক্ষিত গোষ্ঠী আভিজাত্যে ও বিদ্যার অভিমানে অসংখ্য অগণ্য জনসাধারণের থেকে পৃথক ও দূর হয়ে গেছেন। তৃতীয় যুক্তিও এরই সঙ্গে আসে যে, ভারতবর্ষের সমস্ত লোক কখনো এই বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারবে না। ইংরেজী ভাষা দেশের প্রত্যেকটি চাষী মজুর কামার কুমার বুঝতে ও বলতে পারবে না এবং আজকের দিনে যারা 'কাজ করে', তাদের শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ রেখে, তাদের দূরে রেখে দেশের উন্নতির চিন্তা মুষ্টিমেয় উন্নাসিক শিক্ষিত শ্রেণীর ভ্রমাত্মক কল্পনা মাত্র। ইংরেজী ভাষাকে ভারতীয় ভাষার মধ্যে ভারতবাসীর জীবনে স্থান দেবার বিরুদ্ধে এই তিনটিই মোটামুটি প্রধান যুক্তি। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই সবকটি প্রশ্নই প্রায় একশ বছর পূর্ব থেকে আলোচনা হয়ে এসেছে। ইংরেজী ভাষা যখন প্রথম বাংলা দেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করতে শুরু করে, মোটামুটি এইসব সন্দেহই তখন চিন্তাশীল স্বদেশের হিতকামী মহারথীদের মনে জেগেছিল, এ প্রসঙ্গে তাঁরা বিশদ আলোচনা করেছিলেন।

ইংরেজী ভাষা যে বিদেশী শাসকেরা জোর করে শাসন ব্যাপারের সুবিধার জন্য আমাদের ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন, এধারণা সত্যমূলক নয়। বাংলা দেশেই প্রথম ইংরেজী শিক্ষা প্রসার লাভ করেছিল। বাঙ্গালী হিন্দু সাগ্রহে সানন্দে এই ভাষার সাহায্যে নূতন দিগন্তে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। ইতিহাসের সামান্য একটু আলোচনা করলেই জানা যায়,

ইংরেজী শিক্ষা সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিলেন শিক্ষাব্রতী ও মানুষের হিতার্থী কয়েকজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি। ইংরেজ শাসকবর্গ মুসলমানের জন্য আরবি, ফার্সি ও হিন্দুর জন্য সংস্কৃত কলেজে পুরাতনপন্থী সংস্কৃত শিক্ষারই ব্যবস্থা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। হিন্দু মুসলমান উভয়কে একই শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্রে আধুনিক যুক্তিবাদী চিন্তার উদার ভূমিতে মিলিয়ে দেওয়া তাঁদের স্বার্থের বিরোধী কাজই হয়েছিল। অবশ্য ইংরেজী শিক্ষা ব্যাপক প্রসারের ফল কতদূর মূল প্রসার করবে ও কি পরিণতি লাভ করবে, সে সময়ে তা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। হিন্দু-মুসলমানের পৃথক পুরাতনপন্থী শিক্ষা ব্যবস্থায় যিনি চরম অশুভ দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি বিদেশী শাসকের প্রতিনিধি নন, তিনি আধুনিক ভারতের অগ্র-দূত। বিজ্ঞান চিন্তার পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়। এ সম্বন্ধে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর চিঠিখানি পড়লে সবিশেষ জানা যাবে।

রামমোহন রায় ইংরেজী শিক্ষা প্রার্থনা করেছিলেন। নানা ইংরেজ পুরুষ এই কাজে রামমোহনের সহায় ছিলেন সন্দেহ নেই এবং বাঙ্গালী ও ইংরেজের মিলিত চেষ্টাতেই সম্পূর্ণ এই নূতন বিদেশী ভাষা একটি প্রবল বেগবান উৎসমুখে বাংলা দেশে ধীরে ধীরে নূতন পলিমাটি বহন করে নূতন জ্ঞানের বীজ বপনের যোগ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে সমস্ত বিদেশীরাই ব্রতী, মানুষের হিতার্থে নিবেদিত প্রাণ। ইংরাজের সাহায্যে ইংরেজী ভাষার প্রচার হয়েছে এই যুক্তিতে যদি ঐ ভাষাকে বর্জন করতে হয়, তবে হিউম জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলে ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বাগ্রে তুলে দেওয়া উচিত। ইংরেজজাতির মধ্যে যে অংশ সাম্রাজ্য-লোলুপ, যে অংশ বিজিতের চিরনতির উপর নির্ভরশীল, সেই অংশ কখনই ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন করেনি। ইংরেজের যে অংশ স্বার্থবুদ্ধির উপরে বিজয়ী মনুষ্যত্ব, সেই অংশই রাজা রামমোহনের সহকারী।

যদি সিপাহী বিদ্রোহকে ইতিহাসের ভোজবাজি খেলিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে, জাতীয় সংগ্রাম বলে প্রচার করা হয়, তাহলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু কোনো নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক একথা বলতে নিঃসংশয় নন। এটা লজ্জার কথাও বটে যে, একশ বছর লেগেছে সেই যুদ্ধের ফল ফলতে।

সিপাহী বিদ্রোহকে এতকাল আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে জানতাম না, যদিও সেই যুদ্ধের কোনো কোনো নায়কের বীরত্বে আমরা গর্বিত ছিলাম, তাই সিপাহী বিদ্রোহ বাদ দিলে যথার্থ জাতীয়তা বোধ ও স্বাধীনতার স্পৃহা প্রথম জেগেছিল বাংলা দেশেই। ইংরেজ রাজত্ব ছেদনের মূলে আছে প্রধানতই বাঙ্গালীর মন এবং ইংরেজী ভাষার সাহায্যে নূতন শিক্ষাই তার সবচেয়ে ধারাল কুঠার।

ইংরেজী ভাষা এক সময়ে জনসাধারণ থেকে একটি শিক্ষিতগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল, সে কথা অমূলক নয়। ইংরেজী শিক্ষা বাঙ্গালীর তথা সমগ্র ভারতীয়ের অনুশাসিত কূপমণ্ডূক দৃষ্টির সামনে যে উদার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র খুলে দিয়েছিল, যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠায় জ্ঞানের যে নূতন সৌন্দর্য বিকাশ এদেশের লোকের কাছে সহসা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে কুসংস্কার ও নানা প্রকার মূঢ়তায় আকীর্ণ জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁরা যেন একটি পৃথক গোষ্ঠী হয়ে যুক্তি প্রতিষ্ঠার "উচ্চ মঞ্চে" আরোহণ করেছিলেন সন্দেহ নেই। তখন ইংরেজী জানা ভাই-এর সঙ্গে ইংরেজী না-পড়া ভাই-এর আন্তরিক প্রভেদ জাতিভেদের চেয়েও দৃঢ় ও গভীর হয়েছিল। বস্তুত এ ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়। একে তো ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে সুবিধাবশত ইংরেজী শিক্ষিতেরাই বড় বড় সরকারী পদ পেতে লাগলেন। তখন হয়ত এক ভাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে শুধু ইংরেজের সঙ্গ বা ইংরেজ সরকারে চাকরি নয়, ইংরেজী সাহিত্যের নন্দনবনে প্রবেশের অধিকার পেলেন এবং রাষ্ট্রীয় অধীনতা ভোগ করলেও তাঁদের প্রতিদিনের জীবনে মনুর নানা শাসন, মূলো এবং বেগুন ভক্ষণের উপযুক্ত সময় নিয়ে দুশ্চিন্তার, সমুদ্র যাত্রার অবৈধতার, অশ্লেষা-মঘা ও ত্র্যহস্পর্শের সীমাহীন অসংখ্য ক্ষুদ্র অথচ প্রচণ্ড অধীনতা থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন। আর এক ভাই যে ইংরেজী শেখেনি, সে গ্রামের দাওয়ায় বসে হুঁকো হাতে এতটুকু ছিটে বেড়া ঘেরা সমাজের বিধিনিষেধের চোরাবালিতে হাবুডুবু খেতে লাগল। রাষ্ট্রীয় অধীনতা উভয়েরই সমান থাকা সত্ত্বেও চিন্তার স্বাধীনতা একজনকে ক্রমে ক্রমে স্বাধীন ও সবল করে তুলেছিল। বলা বাহুল্য,

এই ভেদ প্রথমে অতি প্রকট হয়েছিল এবং শ্রেষ্ঠত্বাভিমান কোনও কোনও লোককে গর্বিত ও মোহগ্রস্থ করে থাকবে। যখন ইংরেজী শিক্ষার অভিমানে অবিনয়, ঔদ্ধত্য তাদের দেশের মর্মস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, তখনও ইংরেজী শিক্ষার ফল ফলাবার সময় হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সমাজ' প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে ইংরেজী যে জানে এবং ইংরেজী যে জানে না, তাদের মধ্যে একটা জাতিভেদের মতো দাঁড়াচ্ছে। অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্ছে। একজনের চিন্তা, চিন্তার ভাষা, বিশ্বাস এবং কাজ আর একজনের সঙ্গে বিস্তর বিভিন্ন।......এইজন্যে সমাজে স্ত্রী শিক্ষা ক্রমশই প্রচলিত হচ্ছে, কারও বক্তৃতায় নয়, কর্তব্য জ্ঞানে নয়, আবশ্যকের বশে।'

বস্তুত শিক্ষিতে অশিক্ষিতে যে জাতিভেদ ঘটে, সে কি কেবল ইংরেজী শিক্ষার বেলাতেই সত্য? যখন সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তখনও কি শিক্ষিতের গণ্ডি পৃথক ছিল না? শুদ্ধ সংস্কৃতভাষী ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ পুরুষের সঙ্গে শূদ্র ও চণ্ডালের পার্থক্য ছিল না? সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কি মূর্খের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ জানতেন না এবং যদি কোনো মন্ত্র বলে হিন্দী ভাষাকে সংস্কৃত বা ইংরেজীর মত একটি পরিণত ভাষা-রূপে সৃষ্টি করা যেত, যদি অজ্ঞাত তথ্য ও নূতন নূতন জ্ঞানের বাণীতে তা পূর্ণ হয়ে উঠত, তাহলে কি হিন্দীভাষী ও অহিন্দীভাষীর মধ্যে সেই রকমই জাতিভেদ সৃষ্টি হত না? বস্তুত জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে সমস্ত বৈষম্য একেবারে দূর করে দেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই কল্পনার বিষয়, সাধ্যের বিষয় নয়। বিশেষত এস্থলে বৈষম্য সৃষ্টির মূলে আছে শিক্ষা ও অশিক্ষা, কোনো বিশেষ ভাষা নয়। সেজন্য শিক্ষাকে দায়ী করা যায় না, ঠেকান যায় না, শিক্ষার প্রসার প্রার্থনা করা যায়। বস্তুত ইংরেজী শিক্ষা যখন বিস্তার লাভ করল, তখন ক্রমে ক্রমে তার বিপুল বল চিন্তার ক্ষেত্র প্লাবিত করে মাতৃভাষার মধ্যে প্রবেশ করল, তখন তা যথার্থই দেশের জিনিস হয়ে উঠল এবং নূতন জ্ঞানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কত-গুলি লোককে যা উদ্ধত ও উন্নাসিক করেছিল, তাই বহু লোককে

চিন্তাশীল দেশপ্রেমী করে তুলল। একথা বিবেচনা করা প্রয়োজন, মাতৃভাষার উন্নতি করেছিল কারা? পুরনো শিক্ষায় শিক্ষিত সংস্কৃত পণ্ডিত বা মাদ্রাসার মোল্লারা নয়। যাঁরা দেশকেও জানেন, বিদেশকেও অনুসন্ধান করেন, তাঁরাই। তাঁরা সংস্কৃতও জানতেন, দেশের জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্নও ছিলেন না, তাঁরা দেশকে অবজ্ঞা করলেন না, আবিষ্কার করলেন। যে দেশ নানা জঞ্জালের স্তূপে ঢাকা পড়েছিল, ইংরেজী শিক্ষার নূতন জ্ঞানের আলোতে তাকে দেখলেন। কত আপাতমূঢ় প্রথার অর্থ পাওয়া গেল, কত সংস্কারের মূল খুঁজে পেয়ে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা হল, অসঙ্গত নিয়মের কারাদণ্ড বিধান অগ্রাহ্য করে, মনুর শাসন, শাস্ত্রের দোহাই অতিক্রম করে তাঁরা সমাজে প্রথার চেয়ে বুদ্ধিকে বড় স্থান দিলেন। মনুষ্যত্বের উজ্জীবন হল তাঁদেরই জীবন সাধনায়। এলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, অরবিন্দ। এঁরা কেউই ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা দেশের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন উন্মুলিত হননি। যাঁরা ইংরেজী শিক্ষা করেননি এইরকম বৃহৎ জনসংখ্যা সর্বদাই ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আজকের নূতন ভারতবর্ষ তাঁদের রচনা নয়। আজকের জাতীয়তাবোধ সাহিত্য বিজ্ঞান সমাজ, এ সমস্ত যাঁরা গড়েছেন, স্বাধীনতার যুদ্ধে নেতৃত্ব করেছেন, তাঁরা সেই ইংরেজী না-পড়া জনসমাজের মানুষ নন। আজকের ভারত ইংরেজী শিক্ষকেরই সাধনার ফলে এবং উল্টোদিক থেকে ভাবলে যাঁরা ইংরেজী শিক্ষা পাননি, সেই বিপুল জনসংখ্যা থেকে ক'জন লোককে আমরা দেশের চিত্তে এমন প্রতিষ্ঠিত, দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত দেখতে পাই? দেশ এবং বিদেশকে, ঘর এবং জগৎকে মিলিয়ে দেখবার শিক্ষা না পেলে আজকের দিনে কোনো শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতে পারে না, এসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং হিন্দী বা কোনো প্রাদেশিক ভাষা দ্বারাই সেকার্য সাধনীয় নয়। এই সম্পর্কে একশ' বছর আগে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত উদ্ধৃত করছি—

"আমরা ইংরেজী বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এদেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরেজী শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত রত্নপ্রসূতি ইংরেজী ভাষার যত অনুশীলন

হয়, ততই ভাল। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরেজীতে না বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত এক পরামর্শী একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরাজীর দ্বারা সাধনীয়, কেননা এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, গান্ধারী ইহাদের সাধারণ মিলনভূমি ইংরেজী ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর ইংরেজী চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখনো ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান, অনেক সুখে সুখী। যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে তাহা মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। আমরা সিংহের চর্মস্বরূপ হইব মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব।······যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গলা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নাই। যদি কেহ এমত মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিত-দিগের বোঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোনো মঙ্গল নাই, সমস্ত দেশের লোক ইংরেজী বুঝিতে পারে না। কস্মিন কালে বুঝিবে এমত প্রত্যাশা করা যায় না। বাঙ্গলায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখনো বুঝিবে না বা শুনিবে না।" ('বঙ্গ-দর্শন') শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী ও মাতৃভাষার এই সামঞ্জস্য বিধান আজও আমাদের বাঞ্ছনীয়। বর্তমান কালে বোধহয় এমন বেশী শিক্ষিত মূর্খ নেই যে, মাতৃভাষার অজ্ঞতায় গৌরববোধ করবে। আসল কথা সকল অবস্থারই বিকৃতি আছে, সেইগুলিকেই প্রাধান্য দিয়ে ব্যবস্থা করা যায় না, বিকৃতিগুলি মানব চরিত্রের অসম্পূর্ণতায় বুদ্ধির দুর্বলতায় ঘটে, কি উপায়ে তার সংশোধন হয়, সেইটাই বিচার্য। মাথা ধরে বলে

মাথাটা কেটে ফেলা যায় না, ইংরেজী শিখে কোনো কোনো লোক দাম্ভিক হয়েছে বলে ইংরেজী শিক্ষাকেও বর্জন করা যায় না এবং যেমন ইংরেজী ভাষা কখনো সমস্ত ভারতবাসী 'বুঝিতে পারে না, পারিবে না', তেমনি রাষ্ট্রীয় মতলবে সৃষ্ট, পরিভাষা আকীর্ণ, জীবনের সঙ্গে অসংলগ্ন, একটি কৃত্রিম ভাষা কখনই ভারতবর্ষের অগণ্য অসংখ্য জনসাধারণ বুঝিতে 'পারে না, পারিবে না।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতামতের শেষ অংশ সম্বন্ধে আগেই কিছু আলোচনা করা গেছে, যখন ইংরেজী শিক্ষা কেবলমাত্র মুষ্টিমেয়ের সুখসুবিধা, চাকরি ও বিদ্যা গর্বের চাষ করেই সমাপ্ত হত, তখন এইরকম ইঙ্গবঙ্গগোষ্ঠী সৃষ্টি হবার দিকে একটি ঝোঁক পড়েছিল। কিন্তু যখন ইংরেজী শিক্ষাব ফল দেশের মর্মে গভীরভাবে প্রবেশ করতে লাগল, তখন সে গোষ্ঠী দুর্বল হয়ে পড়ল। মাতৃভাষার চর্চা তাঁরাই শুরু করলেন ইংরেজী শিক্ষার ফলে যাঁদের মধ্যে নূতন নূতন ভাব মাতৃভাষার মাধ্যমে পথ খুঁজতে লাগল। শাস্ত্রের অনুশাসনে খণ্ডিত বুদ্ধির জড়তা কেটে গেল, তাঁদের প্রসারিত দৃষ্টিতে জ্ঞান হল বিঘ্নবিহীন। ইংরেজী শিক্ষা কেবল সরকারী চাকরি জুটিয়েই ক্ষান্ত হল না। মনুর মুখে তুড়ি মেরে মনকে সাত সমুদ্র পার করে নিয়ে গেল। আর বঙ্কিমচন্দ্র যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, সেই কথাটিই স্মরণ করে রাখবার মত নয়।

রবীন্দ্রনাথ একমাত্র মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করবার স্বপক্ষে প্রবল ও অকাট্য যুক্তিগুলি বিস্তারিত আলোচনা করে সেই সঙ্গেই বলছেন: 'এ প্রসঙ্গে একথা স্বীকার করা চাই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার সম্মানের আসন বিচলিত হতে পারবে না। তার কারণ এ নয় যে, বর্তমান অবস্থায় আমাদের জীবনযাত্রায় তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আজকের দিনে য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান সমস্ত মানবলোকের শ্রদ্ধা অধিকার করেছে। স্বাজাত্যের অভিমানে একথা অস্বীকার করলে অকল্যাণ।' বস্তুত আজকের যেসব তর্ক, বহুপূর্বেই তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হয়ে গেছে এবং মহা মহা মনীষীদের যা মত তা উল্টে দেবার মত নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। অসঙ্গত কারণ অবশ্য আছে।

সে হচ্ছে এই যে বর্তমানে রাষ্ট্রতন্ত্রের লাগাম যাঁদের হাতে, তাঁরা নতুন নতুন সমস্যার অশ্ববাহনে তাঁদের কীর্তিকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে চান। আরও একটা কারণ এই যে, দেশের যেগুলি প্রধান এবং সত্যকারের সমস্যা, যেমন অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, দুর্নীতি দূরীকরণ, বেকারীর রোজগারের ব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক কঠিন ও দুরূহ কর্তব্য থেকে মনকে সহজেই সরিয়ে দিতে সুবিধা পাওয়া যায়। যে কাজ আগে করণীয়, সে কাজ কঠিন ও ত্যাগ সাপেক্ষ বলেই এই অকাজের সৃষ্টি।

এমন কথাও শোনা যায় যে, বিদেশে যদি প্রচারিত হয় যে, ইংরেজী-কেই আমরা সর্বভারতীয় ভাষার কার্যে নিযুক্ত করেছি, তবে আমাদের সম্মানের হানি হবে। কিন্তু ইংরেজী যদি আজ সমস্ত বিশ্বের দরবারে আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা পায়, তবে দৈবদুর্বিপাকে যখন এই একটি সুবিধা আমরা পেয়েছি, তখন সেটি প্রত্যাখ্যান করে নতুন করে ফ্রেঞ্চ বা রাশিয়ান শিখতে হবে ইংরেজী ভাষার সঙ্গে এমন ঝগড়া আমাদের নেই। বস্তুত কোন দেশ কি করেছে, তারই উপমা খুঁজে বেড়ানর চেয়ে আমাদের পক্ষে কি উপকারী, তারই চিন্তা করা ভালো। যদি ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষবশত বা স্বদেশে গৌরববশত কোনো দেশীয় ভাষাকেই এই মর্যাদা দিতে হয়, তবে এমন কোনো ভাষাই সে স্থান দাবী করতে পারে যে ভাষা ঐশ্বর্যে, উৎকর্ষে সেই মর্যাদার উপযুক্ত হয়েছে। অন্তরের গভীর ঐশ্বর্যে যে ঐশ্বর্যময়ী তাকে উপেক্ষা করে স্যাকরার দোকানে গয়নার ফরমাশ দিয়ে যে সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করছি, তাতে দীনতাই প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দী যে অধিকসংখ্যক ভারতীয়ের মাতৃভাষা একথা প্রমাণ হয়নি এবং রাষ্ট্রভাষার জন্য যে ভাষা তৈরি করবার ফরমাশ হয়েছে, সে কোনো কুলী মজুরের বোঝবার ভাষা নয়। সমগ্র ভারতবাসীর তুলনায় যে ক'জন মুষ্টিমেয় লোক সেই ভাষাভাষী তাদের অনেকখানি সুবিধা করাই এই পক্ষপাতী-ব্যবস্থার লক্ষ্য। কোনো দক্ষিণী চাষী মজুর বা বাঙ্গালী ওড়িয়া অসমীয়া চাষী মজুর ভারতবর্ষের কোটি কোটি সে ভাষা স্কুলে স্কুলে না শিখে বুঝতে, বলতে

পারবে না। শুধু উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় 'কুলী বোলাও' 'সামান' উঠাও 'জলদি কর' জাতীয় যে দু একটা বাজার হিন্দী শব্দ বোঝে, তারই দৌলতে ঐ ভাষাকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন বিছিয়ে অন্যান্য প্রদেশের ভাষাগুলিকে পঙ্গু করতে হবে? নিজের মাতৃভাষা ভাল করে শিখতে পারাই সাধারণ সমস্ত লোকের পক্ষে যথেষ্ট। নিরক্ষরতা দূর করে জনসাধারণকে মাতৃভাষা শেখানই আজ প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া দরকার। দেশের অগণিত জনসাধারণকে যে কোনো বিদেশী ভাষা শেখানই অসাধ্য। এটা কত দিনে সম্ভব হবে যে বাঙ্গলা দেশের সমস্ত চাষী শুদ্ধ হিন্দুস্থানী বলতে বুঝতে ও লিখতে পারবে। যে অধ্যবসায়ে এই অসাধ্য সাধন হবে, সে অধ্যবসায় ঐ একটি অসম্পূর্ণ ফরমাশী কৃত্রিম ভাষা শিক্ষায় খরচ করে আমাদের চাষী মজুরদের কোন পরমার্থ লাভ হবে। বস্তুত মাতৃভাষাই সাধারণভাবে আপামর জনসাধারণের শিক্ষার উপযুক্ত বাহন হওয়া উচিত। দেশের প্রত্যেক লোক নিজের মাতৃভাষাটি জানতে লিখতে পড়তে পারবে, এর চেয়ে বেশী পৃথিবীর কোনোও দেশই চাইতে পারে না। আন্তর্প্রাদেশিক বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করবেন বা শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি যাঁরা পার হয়ে আরো অগ্রসর হবেন, শুধু তাঁদেরই মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ভাষা ভালো করে শিখতে হবে, যে ভাষার সাহায্যে তাদের কাজগুলি সুসম্পন্ন করা যায়। একটি বৃহৎ ভাষা শিখলেই যদি এসব উদ্দেশ্য সফল হয়, দেশের মধ্যেও কাজ চলে বিদেশেও প্রবেশ করা যায়, তার চেয়ে সুবিধা আর কি আছে। এমন অদ্ভুত যুক্তিও শোনা যায় যে, ইংরেজ রাজত্বেই যখন ইংরেজী ভাষা মুষ্টিমেয় লোক শিখেছিল, তারাই যখন শেখাতে পারেনি, তখন এখন সে শিক্ষা ব্যাপকভাবে হতে পারবে না। ইংরেজ আমাদের শিক্ষার জন্য খুব বেশী চেষ্টিত ছিল না। যখন শতকরা নব্বই জন ছিল নিরক্ষর, তখন এ প্রশ্ন অবান্তর। তা সত্ত্বেও যেটুকু ইংরেজী শিক্ষা এসে পড়েছিল, তারই সুবাতাসে মাতৃভাষাগুলি সঞ্জীবিত হয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করেছিল। হিন্দীর সে সাধ্য নেই যে, সে নব নব চিন্তার

ধারক ও বাহক হয়ে নানা দেশের মানুষকে শক্তি, বীর্য ও বুদ্ধিতে উজ্জ্বল করে অমৃতপায়ী করে। এমন তর্কও উঠেছে যে, রাষ্ট্রভাষার কাজের জন্য একটি উৎকৃষ্ট বা সমৃদ্ধ ভাষার প্রয়োজনীয়তা নেই, কোনক্রমে কাজ চলে যায়, এমন একটি যন্ত্র হলেই হল। আমার মনে হয়, মানুষের জীবন ও কর্মকে যাঁরা অত্যন্ত খণ্ডিত করে দেখেন, এ তাঁদেরই কথা। ভাষা ও ভাবের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ এবং রাষ্ট্র শাসন ও পরিচালন ব্যাপারে ভাবের কোনো স্থান নেই একথাও অশ্রদ্ধেয়। বিশেষত রাষ্ট্র ভাষার মারফত দেশ-বিদেশের সঙ্গে সংযোগ দেশ-বিদেশে নানা পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের বাণীকে পৌছে দেওয়ার কাজে রাষ্ট্রভাষার প্রকাশ শক্তির অনেকখানি গুরুত্ব আছে নিশ্চয়। এমন কি সরকারী ফাইল, রিপোর্ট, বিচারের রায়, সমস্ত রকম আবশ্যকীয় লেখার মধ্যেই সত্য ও তথ্যের যথাযথ সুসংবদ্ধ যুক্তিযুক্ত সমাবেশ ভাষার মাধ্যমেই ঘটে এবং ভাল মন্তব্য ও হিজিবিজি মন্তব্য লেখার মধ্যেই কর্মচারীর দক্ষতা, পরিচালন ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধির উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। সমৃদ্ধ ভাষাব প্রয়োজন শুধু কবিতা লেখবার জন্য নয়, জীবনকে সমৃদ্ধ করবার জন্য। চিন্তা মনন ও বুদ্ধিকে খেলাবার জন্য সমৃদ্ধ ভাষা যে সাহায্য করে এতে সন্দেহ নেই। যেমন সমৃদ্ধ ভাব ভাষা সৃষ্টি করে, তেমনি নতুন নতুন চিন্তার সম্পদে সম্পন্ন ভাষা মানুষকে চিন্তা করতে, ধারণা করতে, কল্পনা করতে শেখায়। একথা বলা যায়, সরকারী দপ্তরে মন্তব্য লিখতে ক'টি শব্দর প্রয়োজন, কিন্তু মন্তব্যকারী যে চিন্তা করবে, নানা সিদ্ধান্তে নানা সমস্যার, নানা কাজের পরীক্ষা করবে, তখন সে চিন্তা করবে কোন ভাষায়, সেই ভাষার শক্তির উপর তার বিবেচনা শক্তি, সেই ভাষার দীনতার উপর তার চিত্তের দীনতা নির্ভর করবে। বস্তুত মাতৃভাষাই একাজের প্রধান সহায় হলে মঙ্গল, কিন্তু যদি কোনো জাতির সম্পন্ন মাতৃভাষা না থাকে, তবে অন্য যে সম্পন্ন ভাষাটি তাঁর আয়ত্ব, গভীর ও ব্যাপকভাবে চিন্তা করতে গেলে তার সেই সম্পন্ন ভাষাই তার ভিতরে কাজ করবে, যে ভাষা থেকে নানা চিন্তার খোরাক সে সংগ্রহ করেছে। তারপর ক্রমে ক্রমে সেই চিন্তা মাতৃভাষার মধ্যে

সঞ্চারিত হবে অলক্ষ্যে, অগোচরে। এই ভাবেই ইংরেজী ভাষার ভাব সম্পদ বাংলা সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সমস্ত মানুষই চিন্তার ক্ষেত্রে আপন প্রয়োজন অনুসারে ভাষা তৈরী করে নিতে পারবে বা কমিশন বসিয়ে কতগুলো শব্দ জোগাড় করে নিলেই সে কার্য সাধিত হবে, এ সম্ভব নয়। যে সমস্ত ভাষা সেই সেই ভাষাভাষী মনীষীদের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ, প্রবল ও শক্তিশালী হয়েছে, সমস্ত মানুষেরই আছে তাতে উত্তরাধিকার। দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দী ভাষাভাষীর মধ্যে ভাষা সৃষ্টি করবার শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে বেশী গুণী জন্মগ্রহণ করেননি। তাই বলেই যে আজ হিন্দীভাষীরা মানুষের সেই ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবেন ও সমগ্র দেশকে বঞ্চিত করতে চেষ্টিত হবেন, এ কোন্ মূঢ়তা! 'যেখানেই যে তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞ যাগ আমি তার লভিয়াছি ভাগ'—এই হচ্ছে মানুষের কথা। তা না হলে য়ুরোপের শক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে স্পর্ধা করে দেশাভিমানের খাতিরে আমরা তো বাতি জ্বালান বন্ধ করতাম, টেলিফোনে কথা বলতাম না, ট্রেনে না চড়ে গরুর গাড়িতেই যাতায়াত চলত। যদি বলা যায় তাতে ক্ষতিটাই বা কি! বহু যুগ তো ওমনি করেই বেশ কেটেছিল, অন্তত রেল কলিশান হয়ে অপঘাতের ভয়টাতো কমত। বস্তুত এই যুক্তিই তাঁদের যাঁরা বলেন, ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমাদের নৈতিক চরিত্র শিথিল, স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য-চারিণী হচ্ছে। যা হোক সমাজকে রক্ষা করবার জন্য অচলায়তন গড়বার স্বপক্ষে আজ আর বেশী লোক উদ্‌গ্রীব নন এবং এক মুখে 'পূজার্হা গৃহ দীপ্তয়ঃ' বলে স্তব পাঠ করতে করতে অন্য মুখে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার বিধান দেবার মতো নৈতিক বল আজ ইংরেজী শিক্ষার ফলে অনেকেরই শিথিল হয়ে গেছে। তবু মাঝে মাঝে আমাদের রক্ষণশীল স্বভাবের ধারাটা নূতন ভঙ্গীতে প্রকাশ পায়।

যে ক্ষুদ্র দেশাভিমানের যুক্তিতে একটি ভাষাকে এখন সকলের উপর চাপিয়ে দেবার কৌশল করে একটি সম্প্রদায় নিজেদের সুবিধা করে নেবার চেষ্টায় আছেন, সূর্যসারথী অরুণের মত তার আজও সৃষ্টিই সম্পূর্ণ হয়নি এবং সম্ভবত অরুণের মতই সে দিগন্তে একবার তার মুখ

দেখিয়েই বিলীন হয়ে যাবে, কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে যে কটি সম্পূর্ণতর ও ভাবের পূর্ণতর বাহনরূপে উপযুক্ত ভাষা আছে তাদের ঘাড়ে পড়ে তাদের বধ করে যাবে। জৈবিক প্রয়োজনের সঙ্গে মানুষের সমস্ত কর্মোদ্যোগ জড়িয়ে থাকে—যে ভাষাশিক্ষা রোজগারের কাজে লাগবে না, কেবলমাত্র শখের চর্চায়, ক'জন সেদিকে মন দেবে? তাছাড়া এতে হিন্দীভাষীর সঙ্গে অন্য প্রদেশের লোকের যে অসাম্য সৃষ্টি হবে, সে অসাম্য চিন্তার ক্ষেত্রে, প্রতিভার ক্ষেত্রে নয়, সে অসাম্য কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট একটি সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে বলেই অসন্তোষ ঘনিয়ে তুলবে। আমি কেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলাম না—এ নিয়ে খুব কম লোকেই ঝগড়া করে। কিন্তু আমি বামুন নয় বলে চাকরি পেলাম না বা আমি হিন্দীভাষীর মত হিন্দী জানি না বলে উন্নতি হল না, এ অত্যাচার ক'দিন সহ্য হয়? ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে বা সর্বদাই শিক্ষার প্রসারে, উন্নততর শিক্ষাবিধানের চেষ্টায় যে অসাম্য ঘটে, সে স্থায়ী নয়; তার যাত্রা মঙ্গলের দিকে, সাম্যের দিকে, কিন্তু ধনের পদের, সম্প্রদায়ের জাতির যে অসাম্য মানুষ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করে, তার পরিণাম অমঙ্গলে, কলহে, বিচ্ছেদে, ধ্বংসে। হিন্দীভাষী সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধা সুযোগ সৃষ্টি করে আমরা নতুন একটি বিচ্ছেদের বীজ বপন ছাড়া অন্য কোনো মঙ্গল সাধন করতে পারব না।

বিজ্ঞানের বুজরুকি

কোনো দেশে দুচার দিনের জন্য ভ্রমণে গিয়ে সে দেশ সম্বন্ধে অপ্রিয় মন্তব্য করা উচিত নয় বলেই আমি মনে করি। বিশেষত যখন সে মন্তব্যে কোনো সুফল ফলবার আশা নেই। নিজের দেশের সমস্যাগুলিরই যখন সমাধান করবার সাধ্য নেই সেখানে অন্য দেশের উৎপাত নিয়ে দুশ্চিন্তার দরকার কি? তবু স্বীকার করতে হবে রাজনৈতিক বা ভৌগোলিকভাবে দেশে দেশে দূরত্ব যতই থাকুক, মানুষে মানুষে যোগ তো এই গতিবান সভ্যতা বাড়িয়ে তুলছে ক্রমাগতই—কাজেই এক দেশের উৎপাত অন্য দেশে গিয়ে পৌঁছতে বেশি সময় লাগে না। এক দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির ছোঁয়াচ যেমন অন্য দেশ বাঁচাতে পারে না। কোনটা সৎ কোনটা অসৎ কোনটা কতটুকু নেব বা নেব না, সে বিচারের অবকাশও থাকে না। তাই এক দেশের সমস্যা সম্বন্ধে অন্য দেশের উদ্বেগ হওয়া অযৌক্তিক নয়। বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষে সমৃদ্ধ আমেরিকায় যে দুটি জিনিস আমার স্বল্প দিনের ভ্রমণে বিশেষ করে লক্ষ্য হল, তা হচ্ছে চিকিৎসা সঙ্কট ও যুব বিদ্রোহ। এখানে আমরা চিকিৎসার বিষয়ই আলোচনা করব। চিকিৎসা সংকট এদেশেও ঘটে, রাজশেখর বসু বহুদিন পূর্বেই তার সুবিস্তৃত কাহিনী লিখেছেন। 'ডাক্তারের পাল্লায়' পড়া কথাটিও ব্যবহার হয়। কিন্তু সেটা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ওদেশে তা দেখে ভীত হয়েছি। আমেরিকায় ডাক্তাররা ধনী। স্বামী স্ত্রী যদি দুজনে ডাক্তার হন কিংবা একজন ডাক্তার একজন এনাস্থেটিস্ট তা হলে তো সুখ স্বর্গ। তাহলে তাদের বিস্তৃত লনের মধ্যে বিরাট বাড়ি—তাহলে তারা মাঝে মাঝে মেইডও রাখেন, ২।৩ খানা গাড়ি তো চড়েনই। এনাস্থেটিস্টরা ডাক্তারদের চেয়েও বেশি রোজগার করেন। আর যদি একজন সাইকিয়াট্রিষ্ট হন ও অন্যজন এনাস্থেটিস্ট তাহলে তো তাঁরা কোনো ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের মতই চালচলন করতে পারবেন। সাইকিয়াট্রিস্টদের ব্যবসার কথাই আমাকে বিশেষভাবে পীড়িত করেছে,

কারণ অচিরে এই ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশেও বেড়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ মানসিক রোগের কোনো বীজাণু নেই, ডেটল ঢেলে তাকে নষ্ট করা যায় না। পশ্চিমে হাওয়ায় যে ভাব উড়ে আসে তাকে দূর করে কার সাধ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়—' মানুষের দুর্দশা নিয়ে কিন্তু ডাক্তার-দের ব্যবসায়ের অধিকার উন্নত দেশগুলিতে এখনও নির্বাধ। ডাক্তারী আমেরিকায় একটি ইণ্ডাষ্ট্রি এবং ডাক্তারদের রাজনৈতিক 'লবি' এত জোরালো যে একে টলাবার সাধ্য নেই কারু। কেনেডি কিছু চেষ্টা করতে গিয়েছিলেন বিশেষ সফল হননি। অবস্থা এমন যে কোনো লোকেরই সাধ্য নেই নিজ ব্যয়ে চিকিৎসা করে অথচ সেদেশে বিনা পয়সায় চিকিৎ-সার ব্যবস্থা নেই! তাই হেল্‌থ ইনসিওরেন্সের জটাজাল ছড়ানো আছে। ইনসিওর করা থাকলে অনেকখানিই ইনসিওরেন্স কোম্পানী দিয়ে দেবে যদিও সেটা প্রিমিয়ামের হার অনুযায়ী স্থির হবে কতটা দেবে। কোন চিকিৎসায় কত খরচ পড়বে আগে থেকে বলা শক্ত। হাসপাতালের মর্জি—একবার হাসপাতালে নামটি লেখালে শেষ পর্যন্ত কি দায়ে পড়তে হবে তা আগে থেকে অনুমান করবে কে? খুব সাধারণ নিরুপদ্রব একটি প্রসব হতে খরচ পড়ে ১০০০ ডলার, যদি একদিন পরই প্রসূতি বাড়ি চলে যায়। কোনো অপারেশন হলে ঐ খরচ ৭/৮ হাজার ডলার পর্যন্ত পৌঁছয় অনায়াসে। ইনসিওরেন্সের খরচ দরিদ্র ও ধনীর একই। কাজেই দরিদ্রের পক্ষে চিকিৎসাটা মারাত্মক ব্যয়সাধ্য। দাঁত ও চোখের রোগ আবার ইনসিওরেন্সের আওতায় পড়ে না। তাই দন্ত চিকিৎসক ও চক্ষু চিকিৎসক সর্বস্বান্ত করে ছাড়তে পারে এবং করেও। অল্পদিনের জন্য ওদেশে গেলে ইনসিওর করা মুস্কিল, অবশ্য মুস্কিল কিছুই নয়—হয়ত টেলিফোনেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে কিন্তু টাকা চাই তো! শুনেছিলাম কোনো ভারতীয় ছেলে পড়া সেরে গৃহমুখী হবার আগে ঠ্যাং ভেঙ্গে হাসপাতালে যায়। তারপর সেরে উঠে একবছর কাজ করে হাসপাতালের ঋণ শোধ করে তবে দেশে ফেরে। এটা অত্যুক্তি তবে রুগীরাও প্রতিশোধ নেয় কম নয়। ডাক্তারের ভুল ত্রুটী

রেহাই পায় না—মোটা টাকার দাবীতে মামলা ঠুকে দেয়। ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা লেগেই আছে—ভুল বড়িটি দিয়ে ফেললে আর রক্ষে নেই—অনেক সময় রোগীর আত্মীয়বর্গের প্রতিশোধ স্পৃহা বা সন্দেহও এ প্রবণতা বাড়ায়—ভুল হয়েছে কিনা সেটাতো প্রমাণ সাপেক্ষ। এ অবস্থায় ডাক্তারদেরও মোটা টাকা ইনসিওর করতে হয় মামলার খরচ ও গুণাগারের খরচ হিসাবে। ইনসিওরেন্সের বেড়াজাল ডাক্তার ও রুগী উভয়কেই জড়িয়ে রেখেছে। এমন একটা অবস্থায় ডাক্তার ও রুগীর মধ্যে যে সৌহার্দ্য ও মানসিক সংযোগ অভিপ্রেত, তা হতে পারে কি?

চরক সংহিতায় আছে যে চিকিৎসক রুগীর কাছে বসে তার আত্মাকে দেখতে পায় না তিনি কখনো সুচিকিৎসক হতে পারেন না। শুনেছি ডাক্তার নীলরতন সরকার ঘরে ঢুকে টাইফয়েডের গন্ধ পেতেন, নিউমোনিয়ার গন্ধ তাঁকে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার পথ বলে দিত। পরীক্ষা করা হত, তবে তার জন্য চিকিৎসা সুরু করতে দেরী হত না। রুগীর বাড়িতে অসুবিধা থাকলে পথ্য তৈরা করে নিয়ে যেতেন। আজ ডাক্তার ও রুগীর আত্মিক সম্পর্ক কোনো দেশেই হয়ত গড়ে উঠবার সুযোগ নেই কিন্তু মামলা মকদ্দমা ও অর্থ নিষ্কাষণের চাপে পড়ে ওদেশে রুগীর মনের কি অবস্থা দাঁড়াতে পারে তা অনুমেয়। অবশ্য ধনী ব্যক্তিরা এ আলোচনায় তেমন সায় দেন না। বলেন, 'না, ইনসিওরেন্স তো আছে তত ভয় নেই,' কিন্তু মধ্যবিত্তেরা রীতিমত ভয়ে ভয়ে থাকেন।'

ডাক্তার ও রুগীর মধ্যে যে আত্মীয় সম্পর্ক ক্ষাণ তার চেয়ে মারাত্মক কথা হচ্ছে আত্মীয়ও আত্মীয় নয় এবং এই সমস্যার উপর নির্ভর করেই সাইকিয়াট্রিস্টদের পসার জমে উঠেছে। সাইকিয়াট্রিস্টরা তাদের অক্টোপাশের শুঁড় সাধারণ মানুষের হৃদয়ে মগজে প্রবেশ করিয়ে রক্তপান করছে বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের দেশেও মনোবিদরা আছেন কিন্তু পুরোপুরি মানসিক রুগীদেরই তাঁদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাও সহজে নয়। মানসিক রোগে কেউ ভুগছে বা পাগল হচ্ছে কিংবা হয়েছে এটা অগৌরবের বিষয় বলেই আমরা মনে করি এবং অসুস্থ স্বজনকেও সহজে বা প্রকাশ্যে মনোবিদের কাছে নিয়ে যেতে চাই

না। সেটা অবশ্য ভ্রম। কিন্তু তাই বলে ঘরের সমস্যা নিয়ে ক্রমাগত ডাক্তারের কাছে দৌড়ান আমাদের অস্বাভাবিক লাগে। বস্তুত সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়া ওদেশে একটা ফ্যাশান।—"আমার ডাক্তার বলেছে" কথায় কথায় নিজের জীবনের সমস্যা সম্পর্কে ডাক্তারের হিতোপদেশের উল্লেখ করতে কারু সংকোচ দেখলাম না। এ সম্বন্ধে দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমার বক্তব্য কিছুটা পরিষ্কার হবে। আমার বন্ধু দম্পতি অতি সজ্জন ও সত্যবাক। বয়স দুজনেরই পঁচিশ-ছাব্বিশ—পলি আর জন। পলির বাবা তিনবার বিবাহ করেছে, মা দুবার। কাজেই বাপের বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কমই। একদিন শুনলাম ওর মা ওর ছোটবোনকে নিয়ে আসছেন। ভদ্রমহিলা দু'শ মাইল দূর থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছেন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা সিনথিয়াকে ডাক্তার দেখিয়ে জেষ্ঠ্যাকে দেখে বাড়ি ফিরে যাবেন। তাঁরা তো এলেন, সিনথিয়া ঘরে ঢুকে ছোটখাট অভিবাদন সেরেই শোবার ঘরে চলে গেল ও শুয়ে রইল। ওর মা বললেন, এইমাত্র ওর গর্ভপাত করা হয়েছে। ঘণ্টা দুই তিন বিশ্রাম করে বাড়ি ফিরে যাবে। এত সহজে একজন অপরিচিত ব্যক্তির সামনে কথাটা বললেন যে তার বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল আমার। যদিও সত্য সব সময়ই শ্রদ্ধার যোগ্য তা স্বীকার করি তবুও ভাবতে লাগলাম, এই কথাটা শোনাবার এতই কি দরকার ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "পলি, সিনথিয়া আঠার বছরের মেয়ে। এই মেয়ের প্রথম সন্তান নষ্ট করলে কেন তোমরা? ঐ ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দিলে কি হতো?"—"ভালো হতো না। সে ভার নেবার যোগ্য নয়, দায়িত্বজ্ঞান নেই।"—"এটা তো পৌরাণিক কথা বলছ। এখানে তো সকলেই নিজের নিজের দায়িত্বভার বহন করছে—সে ছেলে যখন রাজি ছিল তখন একি অন্যায়।" পলি চিন্তিতভাবে বললে, "আমিও তাই ভেবেছিলাম কিন্তু মা ওদের ডাক্তারের (সাইকিয়াট্রিস্ট) কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, ডাক্তার বললেন, দুজনেই যখন অপরিণত তখন এ সন্তান রাখলে ফল ভালো হবে না।"—"কী সর্বনাশ পলি, তোমরা কি প্রেমে পড়বার আগেও ডাক্তারের পরামর্শ নাও নাকি?" ওকে আমি তখন

কুন্তীর গল্প বললাম—"কুন্তী কর্ণকে বলছেন—'ত্যাগ করেছিনু তোরে সেই অভিশাপে—পঞ্চ পুত্র বক্ষে করে তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন'—আঠার বছরের মেয়ের প্রথম সন্তান ডাক্তারের আপ্তবাক্যে কেউ নষ্ট করে ?" পলি নিজেকেই সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগল—এ মেয়ে অত্যন্ত অপরিণত, ওর কিছু মনেই থাকবে না, ওতো ভারতীয় নয়, ও কুন্তীও নয়।

আমেরিকাবাসী ভারতীয়রাও এ ফাঁদে পড়েন। এয়ারপোর্টে নেমে দেখি শ্রীযুক্ত মান্নান আমায় নিতে যেতে এসেছেন। এয়ারপোর্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় তিরিশ-চল্লিশ মাইল পথ। হু হু শব্দে গাড়ি চলেছে—অল্পক্ষণ চলবার পরই তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"আমি আমার ব্যক্তিগত কষ্টের কথা আপনাকে বলতে পারি কী ? আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না তো ?" আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে জানালাম যে—আমিও আমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা বলে আমার বন্ধুদের উৎপীড়িত করতে অভ্যস্ত। তিনি বলতে লাগলেন, "আমার তো আপনাকে নিজের বাড়িতেই নিয়ে যাবার কথা কিন্তু কি দুঃখের বিষয় আপনাকে গেস্ট-হাউসে উঠতে হচ্ছে। আমার স্ত্রী অসুস্থ। একটা এক বছরের বাচ্চা নিয়ে আমি একা ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি।"—"খুব দুঃখিত হলাম শুনে, তিনি কি হাসপাতালে ?"—"না তিনি এখন একটা আলাদা ঘর নিয়ে আছেন।"—সে কি রকম অসুখ! চমকে উঠলাম আমি। তিনি বললেন, "সাইকিয়াট্রিস্ট বলেছেন তাঁর ব্যক্তিত্ব আমার দ্বারা অবদমিত হয়ে গিয়েছে, তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশের জন্য এখন তাঁর একা থাকা দরকার।"

আমি তো প্রমাদ গণলাম। মান্নান থেমে থেমে বলতে লাগলেন, তাঁর গলা ধরে যেতে লাগল। বুঝতে পারলাম একজন মাতৃসমা ভারতীয় নারীকে পেয়ে তিনি অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছেন। কারণ কাউকে না বলে তিনি এই দুঃখভার বহন করতে পারছিলেন না। জানতে পারলাম তিনি একজন আমেরিকান সপ্তদশীকে আট বছর আগে বিয়ে করেছিলেন। এতদিন ভালই চলছিল, বছরখানেক আগে তাঁদের একটি কন্যা হয়েছে। মেয়েটির জন্মের পরই মা অসুস্থ হয়ে পড়ে ও

হাসপাতালের কিছুটা চিকিৎসা বিভ্রাটে তার মনটা অতি বিষণ্ণ হয়ে থাকে। ধরা যাক মেয়েটির নাম স্যালি—স্যালির ধারণা জন্মায় যে মনের এই বিষণ্ণতার কারণ হচ্ছে সেই শৈশবের বঞ্চনা যা এতদিন মনের গভীরে অবদমিত হয়ে ছিল। তিনি বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শমত একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যান। মনোবিদ মহাশয় পরামর্শ দিয়েছেন, তিনি যেন স্বামীর ঘর ছেড়ে যান—একে সেই শৈশবের বঞ্চনা তার উপর স্বামীর প্রভুত্ব, এ অবস্থায় মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে তাঁকে সম্পুর্ণ একা থেকে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের চেষ্টা করতে হবে। আমি বিস্ময়াভিভূত!—জিজ্ঞাসা করলাম, "সত্যিই আপনি প্রভুত্ব করেন নাকি?"—"দেখুন বিয়ের পর প্রথম দিকে কিছু কিছু করেছি ঠিকই। আমি ভারতীয়, ছোটবেলা থেকে দেখেছি বাড়িতে বাবার কথাই খাটে—আমিও আমার ইচ্ছা খাটিয়েছি, কিন্তু উনি তো তখন কিছু বলেননি—আজ এতদিন পরে জানতে পারছি কর্তৃত্ব করার ঝোঁকে কি অন্যায়টা করে ফেলেছি।"

এমন উদ্ভট কথা শুনে আমার তো হাসিই পাচ্ছিল, যদিও ব্যাপারটা খুবই করুণ তাই বললাম, "যদি কিছু না মনে করেন তো বলি, সন্ধান করে দেখুন এর মধ্যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি আছেন কিনা।"

ভদ্রলোক হাসলেন, "আমি তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। তাকে একবার দেখলেই বুঝবেন কোনো রকম মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া, ছলনা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।"—"তাহলে তাঁকে একবার পাঠিয়ে দিন, আর কর্তৃত্ব করা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখুন।" অবশ্য একথা বলা বাহুল্য ছিল, কারণ তিনি তো স্ত্রীর জিদের কাছে নতি স্বীকার করে তার আলাদা বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেই দিয়েছেন। অনেক খরচ পত্রও করেছেন এজন্য। এটাই তো নতি স্বীকার, কর্তৃত্ব নয়। ভদ্রলোক এতটুকু বাচ্চা নিয়ে হয়রাণ হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু স্যালি দেখাশোনা করবেন না মনে করে ওর কাছে দিতে রাজী নয়। সকালে মেয়েকে নাইয়ে খাইয়ে বেবি সীটারের কাছে রেখে যান—সস্তার বেবি সীটার আছে যারা বাড়ি আসে না তাদের নিজেদের বাড়িতে একসঙ্গে চার

পাঁচটি ছেলে রাখে। বিকেলে কাজ থেকে ফেরবার পথে শিশুটিকে নিয়ে আসেন তারপর রান্না, খাওয়ান, বাসন মাজা কাপড় কাচা সবই আছে। ভৃত্য তো ত্রিসীমানায় নেই। এদিকে মা তখন একা বাড়িতে ব্যক্তিত্ব বিকাশ করছেন এবং এতেও কুলাচ্ছে না তিনি স্থির করেছেন অনেক দূরে দেশের অন্যপ্রান্তে চাকরী নিয়ে চলে যাবেন এবং একলা থাকবেন।

সন্ধ্যাবেলা স্যালি দেখা করতে এলেন। এক পলক দেখেই বুঝলাম মান্নানের কথা কত সত্য। একেবারে নিষ্পাপ পবিত্র সৌন্দর্য—। মুখে বিষণ্ণতা মাখান। অনেকক্ষণ ধরে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। যতদূর বুঝতে পারলাম, এখনও সে তার স্বামীর বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল কিন্তু তার বক্তব্য, "উনি বড় অসহিষ্ণু।"—"তা তুমিও তো অসহিষ্ণু হচ্ছ। Two wrongs do not make one right।" —"না, আমি অসহিষ্ণু নয়, খুব বুঝে শুনে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই একাজ করছি। তুমি জান না আমার ছেলেবেলাটা কি ভীষণ কষ্টের ছিল।"—"তাতো বুঝলাম, কিন্তু সে তো অনেক আগের কথা, এখন সেই পুরানো দুঃখের রোমন্থন করে কি হবে? তোমার এমন বিদ্বান অনুরক্ত স্বামী, অত সুন্দর একটি মেয়ে, তুমি শৈশবে কষ্ট পেয়েছ, তাই তোমার তো বোঝা উচিত তোমার মেয়েটি যেন তোমার মত কষ্ট না পায়।"—"আমার ডাক্তার বলেছে আমি যদি মেয়ের কথা ভেবে নিজের জীবনটা নষ্ট করি, অবদমিত করি, আমার আত্মপ্রকাশ রুদ্ধ হয় তবে একদিন হয়ত আমি ঐ মেয়ের উপরই হিংস্র হয়ে উঠব, প্রতিশোধ নেব। সেটাই কি ভালো হবে?"

এই স্যায়না-পাগলকে কি বোঝাব আর? মনে হচ্ছিল ওর মাথা-টাকে বেশ করে ঝাঁকুনি দিই যাতে ওর সহজ বুদ্ধিটা মনোবিজ্ঞানের কবল থেকে বেরিয়ে আসে। আমি বললাম, "তুমি আর ডাক্তারের কাছে যেয়ো না! তোমার তো কোনো ব্যামো নেই, কেন শুধু শুধু ডাক্তারের কাছে যাও?" স্যালি যে উত্তর দিল সে উত্তর অন্যের কাছেও শুনেছি—"আমি তো চিকিৎসা করাতে যাই না, পরামর্শ করতে যাই।

আমার কথা বলতে যাই—অন্য কে আছে আমার কথা শুনবে, শুনবার সময়ই বা কার আছে?”—“কেন তোমার স্বামীই আছেন,—তিনিই শুনবেন। স্বামীকে বকো রাগারাগি কর, যা খুশি কর। মারতে পর্যন্ত পার তবু তাকে ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। তারই কাছে বসে কান্নাকাটি করে তোমার দুঃখের কথা বলো।”

স্যালি কেমন এক অন্যমনস্ক মুখ করে কফির পেয়ালায় চামচ নাড়তে লাগল। আমি বুঝলাম, এ শিবের অসাধ্য রোগ—তাছাড়া আমি তো মনোবিদ নই মনের রোগ সারাবার ছাড়পত্র কৈ।

পলিও একদিন আমায় বলেছিল—“এই সাইকিয়াট্রিস্টরা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, পয়সা নিয়েও তো আমাদের কথাটা এরা শোনে—নইলে কার কাছে মানুষ মন খুলবে?”—“কেন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব নেই?”—“কার দায় পড়েছে অন্যের জন্য মাথা ঘামাতে। এটাতো তোমাদের দেশ নয় যে ভাইবোন মা-বাবা খুড়ো-খুড়ী সবাই মিলে সমস্যা সমাধানে জুটে পড়বে।”—“কেন এদেশে কেউ কি কারু কথা ভাবে না?”—“কেউ না, কেউ না। কার সময় আছে?”—“কেন তুমি তো ভাব—এই তো আমার জন্য কত করলে, আমার কত সমস্যার সমাধান করলে, এটা হল কি করে?”

পলি চিন্তিত হয়ে পড়ল। নিজের সত্তার সঙ্গে যেন একটা নূতন পরিচয় হল তার। আমার তো ভয়ই করতে লাগল আবার মনোবিদের কাছে না ছোটে একজন ভারতীয়ের জন্য সে কেন এত করল তার পিছনের মনস্তত্ত্বটা কি জানতে, তাহলে তো বিপদ ঘটবে আমারই।

মনোবিদদের আর একটি কাহিনী শুনলে বোঝা যাবে বর্তমানের বিজ্ঞান সমৃদ্ধ পাশ্চাত্যদেশে এঁদের বাক্য ভারতে গুরুবাক্যের মতই অলঙ্ঘ্য! একটি সমৃদ্ধ পরিবারে আমি পাঁচছয় দিন ছিলাম। মা বাবা দুজনেই বড় চাকরী করেন। বিকেলে রোজ একটি পাচিকা এসে রান্না করে দিয়ে যায়, এতটাই সমৃদ্ধ তাঁরা। দুটি ছেলে, বড়ছেলে ববের বয়স কুড়ি, ছোট প্যাট্রিসের আঠার।

বব এসে খাবার টেবিলে বসল। অবিন্যস্ত লম্বা চুল ও দাড়ি, বেশ

নোংরা জামাকাপড়। বললে, ‘ক্ষিদে পেয়েছে’—। (I am hungry) মা তাড়াতাড়ি খাবার গরম করে দিলেন। কাঁটা দিয়ে একটু মুখে তুলে কাঁটা সরিয়ে রাখল তারপর বিকৃত মুখভঙ্গী করে বললে, ‘আমার ক্ষিদে নেই’। মা খোসামোদ করতে লাগলেন, “কি খাবি বাবা, ডিম দিয়ে দুটো রুটি ভেজে দিই ?”—“দাও”। রুটি ভাজলেন মা। এক টুকরো খেয়ে কাঁটা নামিয়ে রেখে ছেলে উঠে গেল—“I am not hungry।” বিমর্ষ মুখে মা খাবারগুলি ফেললেন, বাসন ধুলেন, চোখে জল আসতে লাগল তাঁর, বললেন, “ওর কোনো বিষয় কোনো motivation নেই—কলেজে পাঠাই, যেতে হয় তাই যায়। এখন ছুটি আছে তিনমাস। কিছু করবে বলে বিশ্বাস নেই।” ছেলে ততক্ষণে গায়ে একটা শার্ট চাপিয়ে বেরিয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছে সে কথা জিজ্ঞাসা করার সাহস বাপ-মার নেই। কখন ফিরবে তাও না। সেদিন বব ফিরল রাত্রি সাড়ে বারটায় তারপর রাত দুটো অবধি টেলিভিশন দেখল ও পরের দিন বেলা সাড়ে বারটা অবধি ঘুমালো। ওর মাকে বললাম ছেলেকে জাগিয়ে দাও না, এত বেলা অবধি ঘুমাচ্ছে। সে তো অবাক—“না-না তাহলে রাগ করবে। তুমি তোমার ছেলেকে জাগাতে ?”—“আমার ছেলেকে সাতটা না বাজতে ঘুম থেকে ঠেঙ্গিয়ে তোলাই তো আমার চিরকালের অভ্যাস। যতদিন বেঁচে থাকব করব।”—“তাতে কিছু হবে না ?” “কখনো কখনো কিছুটা গজগজ করতে পারে, আর হবে কি ?”

যে ক’দিন ছিলাম এই ছেলে নিয়ে দেখলাম ওর মা এমিলির চিন্তার অন্ত নেই। কোনো দিন ঠিক মত খাবে না কোনো কাজ করবে না—তদুপরি গার্লফ্রেণ্ডের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, সে চলে গেছে প্রায় দু মাস অথচ এখনও আর-একটা গার্লফ্রেণ্ড আসছে না। এটাও ওর মাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।—“মেয়েটা খুব ভালো ছিল, আমার খুব পছন্দ হয়েছিল।”—“কেন ঝগড়া হল জিজ্ঞাসা কর না তোমার ছেলেকে।”—“জিজ্ঞাসা তো করি, ও বলে, মেয়েটা খুব হার্টলেস্, পারহ্যাপস্ সি ডিড নট ওয়ান্ট টু স্লিপ উইথ হিম।”

এই ববকে নিয়ে একদিন আমি সারাদিন নিউইয়র্ক শহরে ঘুরবার

পরিকল্পনা করলাম, "বব, সারাদিন আমি রাস্তা চিনব না তুমি সঙ্গে চল তো।" বহু কষ্টে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে রওনা হলাম। বাস থেকে নেমেই বলে, "মৈত্রেয়ী (বয়স্ক লোককে নাম ধরে ডাকতে ওরা অভ্যস্ত) আই এ্যম টায়ার্ড আর ইউ ?" আমি তো অবাক। এই তো বেরুলাম, এর মধ্যেই বব টায়ার্ড হবে কেন ? কোনো মতে তাকে নিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌছন গেল—নিউইয়র্ক টাইমসের আপিসে একজন সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দরজা পর্যন্ত পৌছেই বব বলল, "আমি ভিতরে যাব না দরজার কাছে বসে 'ক্রসওয়ার্ড' করছি—ও আই এ্যম সো টায়ার্ড।" আমাদের দেশের একটি কুড়ি বছরের কলেজে পড়া ছেলে স্টেটসম্যান-এর সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে পেলে খুশীই হত কিন্তু বব্‌রা ক্লান্ত, অতিশয় ক্লান্ত ! আমি জোর করেই তাকে নিয়ে ঢুকলাম। সম্পাদক তো একজন লম্বা চুল ময়লা জামা পড়া বিদ্রোহী বালক দেখে মহা সমাদরে তাকে বসাল। দেখলাম যৌবনের খুব দাপট, সবাই সন্ত্রস্ত। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বব বললে, "তোমরা এত কথা বল কি করে, এত লোককে চেনই বা কি করে ?—কত কি ভাববার আছে তোমরা তো খুব ভাবতে পার, ভেরি ইনটারেষ্টিং !" সেদিন তিনটি সাক্ষাৎকার ছিল কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই সে প্রবেশের মুহূর্তে ক্লান্ত এবং অনিচ্ছুক হয়ে পড়ল, শেষবার তাকে আর ঢোকানই গেল না। দরজার বাইরে মাটিতে ব'সে ক্রশওয়ার্ড করতে লাগল। বাড়ি ফিরেই অবশ্য ছেঁড়া সার্টের উপর আর একটা ছেঁড়া সার্ট ঝুলিয়ে (সার্ট ছেঁড়া অর্থের অভাবে নয়—ঐটাই ফ্যাশান বলে হয়ত ভালো শার্টটাই ছিঁড়ে নিয়েছে) বেরিয়ে গেল রাত ১টায় ফিরবে। ওর মা সারাদিনের বৃত্তান্ত শুনে বলতে লাগলেন, এত যদি ক্লান্ত তবে আবার বেরুল কেন ? অথচ ভদ্রমহিলার সাহস নেই ছেলেকে কিছু বলেন। আমাকে বলতে লাগলেন, "বব কিন্তু আগে এরকম ছিল না, বছর দুই থেকে একেবারে গোল্লায় গেছে। এ সমস্ত ঘটল ওর ছোটভাই প্যাট্রিসকে ওর ঘর থেকে সরিয়ে নেবার ফলে। ওদের দুই ভাইতে খুব ভাব ছিল। প্যাট্রিসের তো দাদা অন্ত প্রাণ। দাদা যা বলবে, যা করবে তাই চমৎকার, দাদাই

ওর দেবতা। দাদার সব বন্ধুবান্ধবরাই ওর বন্ধুবান্ধব। ব্যাপার দেখে আমাদের মনে হল প্যাট্রিসও এখন বড় হচ্ছে, এভাবে দাদার ছায়ায় ছায়ায় থাকলে তো ওর ব্যক্তিত্ব বিকাশ হবে না। তখন ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিলাম।" শুনেই আমি চমকে উঠেছি। "মনোবিদ নাকি ?" "হ্যাঁ খুব ভালো ডাক্তার। তিনি বললেন, সামনের ছুটিতে বব্‌কে কোনো দূর দেশে পাঠিয়ে দিয়ে প্যাট্রিসের ঘর আলাদা করে দাও আর সেই সময়ে ওর নূতন বন্ধুবান্ধব যাতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখ। ববের থেকে ওকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দাও। করলামও তাই। তাতে খুব ভালো ফল ফলেছে—প্যাট্রিসের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে। ওর নূতন বন্ধুবান্ধব হয়েছে—এখন সর্বদাই দাদাকে অগ্রাহ্য করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বব টেকসাস থেকে ফিরে এসে রেগে আগুন—কেন আমার ভাইকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছ—আমরা দু ভাই এক ঘরে থাকতাম, তোমার কি ক্ষতি হয়েছিল তাতে ? সেই যে বেগড়াল মৈত্রেয়ী, ওকে আর ঠিকই করতে পারলাম না।"

আমি তো বিস্ময়ে স্তম্ভিত। খাল কেটে কুমীর আনার ইংরেজিটা মনে পড়ল না, নইলে বলতাম তুমিই তো খাল কেটে ঘরে সাইকিয়াট্রিস্ট ঢুকিয়েছ! আমি ওকে লক্ষ্মণ ও ভরতের গল্পটা বললাম। রাত্রি একটা পর্যন্ত রামায়ণ শুনিয়ে পূণ্য করলাম। আমাদের দেশে ভাতৃভক্তি ও প্রেমের আদর্শটা কি বলবার চেষ্টা করলাম। স্বামী-স্ত্রী পিতা-পুত্র সব সম্পর্কে এরকম একটা চূড়ান্ত আদর্শ এবং অনেক ক্ষেত্রেই তার জন্য কোনো একপক্ষ চূড়ান্ত দুঃখ ভোগও করে কিন্তু তাতে কি তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ ক্ষুন্ন হয় ? ভরত যদি কৈকেয়ীর পরামর্শ মত জাঁকিয়ে রাজত্ব করত ও চোদ্দ বছর পরে রামকে আর ঢুকতেই না দিত, তা হলেই কি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ বেশী হত ?

পৌরাণিক কাহিনী কিন্তু প্যাট্রিস যদি তার নিজের চেয়েও ববকে একটু বেশি ভালবাসত তাহলে তার ব্যাক্তিত্বের কোনো ক্ষতি তো হতই না বরং তার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তির প্রকাশ হত। সেটা হত যা হয়েছে তারচেয়ে সুন্দরতর।

ভদ্রমহিলা মুষড়ে পড়লেন। বার বার বলতে লাগলেন, "আমি তো ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছি—এণ্ড হি ইজ এ ভেরি গুড় ডক্টর, ভেরি গুড্ ইনডিড।"

আমাদের দেশের গুরুবাক্য তাগা তাবিজ চরণামৃত ওঝা প্রভৃতির চেয়েও মারাত্মক এই বৈজ্ঞানিক আপ্তবাক্যের প্রভাব। ভয়ে ভয়ে ভাবতে লাগলাম, পশ্চিক দিক থেকেই তো চিন্তার বাতাস মনোরাজ্যে ঝড় তুলেছে ক্রমাগত, কাজেই এদেশে এ সব আসতে কতক্ষণ! তারপর যদি বিজ্ঞানের ভেক ধরে আসে তবে তাকে আর নড়ায় কার সাধ্য। শত্রুপক্ষের হাতে এতো একটা অস্ত্র। কারু সংসার ভাঙ্গতে চাইলে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে একবার সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে পারলেই হবে, তাহলে ভালোবাসার বন্ধনগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না।

অন্তর্মোঙ্গলিয়া

১৫ই মে ১৯৫৪ তে তৃতীয়বার চীনে এসে পৌঁছলাম। দুবার খুব ভালভাবে আমার চীন ভ্রমণ করা হয়ে গেছে। তৃতীয়বার আসবার কোনই দরকার ছিল না—তবে বৃদ্ধ বয়সে দেশ ভ্রমণের নেশা আমায় পেয়ে বসেছে। কিছুদিন থেকে শুনছি চীনে খুব বড় পরিবর্তন এসেছে, দেশটা একেবারেই ওলট পালট হয়ে গেছে। অনেকে বলছেন, চীন আমেরিকা হয়ে গেছে, মেয়েরা সাজগোজ করছে, কর্মীরা কাজ করছে না ইত্যাদি। কিন্তু আমি তো এসব দেখতে যাচ্ছি না। মাও সে-তুঙের ছবি ক'খানা টাঙ্গানো আছে ক'খানা খোলা হয়েছে বা ক'টা মেয়ে লিপস্টিক লাগিয়েছে ওসব দেখতে এত দূর থেকে আসার আমার দরকার নেই। অতীতে যা ভালো দেখেছিলাম তা বলেছি, আবার বলার মতো যদি কিছু দেখি তবে অবশ্যই বলবো। পরের দেশের নিন্দা করবার সাধ নেই আমার। কারণ বাইরে থেকে দেখে সবকিছু বোঝা যায় না। দু'চার দিন ঘুরে গিয়ে অনেকে অনেক মন্তব্য করেন যা হয়ত একেবারেই কল্পনাপ্রসূত। চীনা মেয়েদের পোষাকে আমেরিকান ছোঁয়াচ লেগেছে এটা সত্য নয়। চীনের রাস্তায় রাস্তায় আজ হাজারে হাজারে জাপানী, কোরিয়ান, থাই প্রভৃতি নানা জাতির মানুষ ঘুরছে, তাদের পোষাকের বৈচিত্র্য তো থাকবেই—তার মধ্যে আমাদের পক্ষে কে চীন কে অ-চীন তা চেনা শক্ত। এসব পরীক্ষা করতে আমি আসিনি। আমি এসেছি একেবারে ব্যক্তিগত কারণে। প্রথমত শুনেছিলাম, আমার চীনা বন্ধু-বান্ধবরা আমার খোঁজ করছেন, তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও সৌহার্দ্য বিনিময়ের খুবই লোভ ছিল, দ্বিতীয়ত আমার বই 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' চীনা ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে। তাই আকাঙ্ক্ষা ছিল সে বিষয়ে ভালোমত খোঁজ নেওয়া। কারণ কে অনুবাদ করছেন জানতে পারিনি। পরে যখন শুনলাম অধ্যাপক চি-সি লিন যিনি রামায়ণ অনুবাদ করেছেন তিনিই এ বই অনুবাদ করছেন, তখন আর ভয় রইল না। তাছাড়া

সবচেয়ে বড় ইচ্ছা ছিল একবার ইনার মঙ্গোলিয়া যাবার। এর আগের বারও এচেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তখন সাইবেরিয়ার কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে স্টেপ্পি কাঁপছিল, তাই ডাক্তারের অনুমোদন পাওয়া যায়নি। চেঙ্গিস খাঁর দেশে যাবার শখ কেন হয়েছিল জানি না। হয়ত কোনো দুর্গম স্থানে যাবার লোভ সকলের মনেই থাকে। কিন্তু সে সুযোগ সকলের হয় না। অন্তত আমার এতদিন হয়নি। আমার গুরু অল্প বয়সে লিখেছিলেন—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন' কিন্তু তখন তাঁর মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পরে সত্তরোর্দ্ধ বয়সে একটা নড়বড়ে প্লেনে চেপে তিনি বেদুইনদের কাছে পৌঁছেছিলেন এবং তাদের তাঁবুতে একসঙ্গে এক প্রকাণ্ড থালায় ভোজন করেছিলেন। যেদিন ওঁরা রওনা হবেন তার আগের দিন রাত্রে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম খড়দহে। সেদিন তাঁর জ্বর ছিল আর তখনকার প্লেন বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। তাই আমার কেবল মনে হচ্ছিল এত বয়সে এই ঝুঁকি নেবার দরকার কি ?

কিন্তু কবি যে লিখেছেন "আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী" সে তো মিছে কথা নয়—তাঁর মনের এই ভাব হচ্ছে আন্তর্জাতিকতার মানসিক ভিত্তিভূমি অর্থাৎ মানুষকে জানবার ইচ্ছা, তাকে তার বিচিত্র রূপে দেখবার ইচ্ছা।

মনে হচ্ছে গুরুর সেই গানের বাণী আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। এই বৃদ্ধ বয়সে কেবলি বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে—'ওগো সুদূর বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী'। চীন দেশে প্রথমবার যখন যাই তখন সে দেশ ছিল অচেনা ও মনের দিক থেকে সুদূর।—সেবার ওই দেশের রাজনীতি ব্যবস্থাপনা ও বহু দ্রষ্টব্য স্থান, জনসাধারণের উদ্যোগ, চিকিৎসা ও শিক্ষা বিষয়ে জানতেই খুব ব্যস্ততার মধ্যে দিন কেটেছিল ও মূল্যবান খবর যতটুকু পারি সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বার থেকেই ভাবছি দুর্গম কোথাও যাব—দূরে আরও দূরে। এখন যা বয়েস তাতে কারও পক্ষপুটে ভর না করে সাইকেল চড়ে তো আর দেশ ভ্রমণে যেতে পারি না। তাই ভাবলাম আবার যখন যাওয়ার

নিমন্ত্রণ পেয়েছি তখন এবার ইনার মঙ্গোলিয়াতেও যাব। আউটার মঙ্গোলিয়া রুশদের অধীনে। দেশটা দুভাগ করেছে একটা নদী। তার দুই তীরে বন্দুক উঁচিয়ে দুইদেশের সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে একদা পরমমিত্র দুই সমাজবাদী দেশের চরম ভেদের প্রকাশ স্বরূপ। দুঃখের বিষয়।

অন্তর্মঙ্গোলিয়া অটোনমাস স্টেট অর্থাৎ সেখানে স্বায়ত্তশাসন, যেমন সিকিমে। ছোটবেলায় ইতিহাস ও ভূগোল পড়ে যেসব দেশের নাম শুনেছি, যেসব জায়গার বর্ণনা শুনেছি তা চোখে দেখলে কীরকম অভিভূত হতে হয়—হাঙ্গেরীতে "রিভার দানিউব" দেখে আমার সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

ইনার মঙ্গোলিয়ার কথা ভাবতেও আমি তেমনি শিহরিত হয়ে উঠলাম।—সে তৃণভূমি বা স্টেপ্পি যেখানে চেঙ্গিস খাঁ তলোয়ার হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, যাঁর বংশধর বাবর ভারতের ইতিহাসে একটি শ্রদ্ধেয় নাম। তৃতীয়বার নিমন্ত্রণ পেয়েই তাই এই আব্দারটি পেশ করেছিলাম। যেহেতু আমি এখন একা একা ঘোরাফেরা করতে পারি না, তাই আমি কাউকে নিয়ে যেতে চাইলে এঁরা তাকেও নিমন্ত্রণ করেন,—সেক্রেটারী হিসাবে। বৃদ্ধ বয়সকে এরা বড় সম্মান করে। আমার যে বয়স হয়ে গেছে এটাই তো আমার একটা মস্ত বড়ো গুণ—এরকম কোথাও দেখিনি। অন্য দেশে বৃদ্ধরা ওল্ড ফুল। এখানে ছেলেমেয়ে মা-বাবাকে না দেখলে সামাজিক নিন্দা তো আছেই, সরকারী শাসনও আছে। কোর্টে নিয়ে গিয়ে ছাড়ে। বয়সের সুবিধা পূর্ণভাবে ভোগ করলাম আমি।

আমার সঙ্গে এসেছিলেন বিড়লা ইণ্ডাসট্রিয়াল মিউজিয়ামের ডিরেক্টর সমর বাগচী। বেলা তিনটে নাগাদ হংকংয়ে পৌছলাম আমরা। চাইনিজ ট্রাভেল এজেন্সি আমাদের টিকিট কিনে রেখেছিল। প্লেন দেরীতে আসায় একটুও সময় পেলাম না আমরা। দৌড়াদৌড়ি করে ট্রেনে উঠে পড়লাম। এবার ট্রেনে উঠে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ট্রেনের কামরাটি লেসের পর্দায় সুসজ্জিত, টেলিভিশান চলছে—এসব আগে

দেখিনি। কাউলুম থেকে ক্যানটনের মধ্যে নোংরা ময়লা ঝুপড়িওলা যে জায়গাটা ছিল, সেখানে এখন বিরাট বিরাট বহুতল গৃহ, ফ্যাক্টরী প্রভৃতি সমৃদ্ধ সভ্যতার চিহ্ন। শুনলাম এই অংশটা এখন চীন প্রজাতন্ত্রের অধীনে এসেছে। আগে এটা নো-ম্যান্‌স ল্যাণ্ড ছিল। ক্যানটনের সঙ্গে এখন সম্পূর্ণ এক হয়ে গেছে বাড়িগুলো। ক্যানটনে ফ্রেণ্ডশিপ এসোশিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও একটি ইণ্টারপ্রেটার ছেলে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। দুখানা এয়ার কণ্ডিশান গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের তাতে তুলে তারা তৎক্ষণাৎ এয়ারপোর্টে নিয়ে এলেন, তারপর আমরা পিকিং রওনা হলাম। সর্বদাই এরকম হয়। পিকিং বা বেইজিং থেকেই সব ব্যবস্থা করা হয়।

পিকিংয়ে পুরনো বন্ধু লি আমাদের ভার নিল। আরও অনেকের সঙ্গে দেখা হলো সেখানে।

পিকিংয়ের চারদিকে এবার আর নতুন বিশেষ কিছু দেখলাম না। তবে হোটেলে হোটেলে প্রচুর বিদেশীর সমাগম, আর চোখে পড়ল রাস্তার মোড়ে মোড়ে, টেলিভিশনে, ভোগ্য বস্তুর বিজ্ঞাপন। আগে ভোগ্য-পণ্য বিক্রয়ের জন্য কোন প্রতিযোগিতা ছিল না—উপযোগী জিনিস লোকে ইচ্ছেমত কিনত। এখন একটু লোভ দেখান হচ্ছে, এটা বোঝা গেল। চাষবাসের ক্ষেত্রেও ইনসেন্‌টিভ দেবার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে। কোন কোন চাষী এত সমৃদ্ধ হয়েছে যে, কীটঘ্ন ছড়াবার জন্য তারা প্লেন কিনছে। অবশ্য ঐ প্লেনগুলি কমিউনের সকলের।

এছাড়াও অনেক চাষী মিলে ক্যানটনে একটি বড় হোটেল করেছে। হোটেল একটা বড় ইণ্ডাস্ট্রি। ফেরার পথে সোয়ান হোটেল নামে একটা বড় হোটেলে আমরা ছিলাম সেটা আমেরিকার বড় হোটেলের প্রতি-স্পর্ধী সন্দেহ নেই। এই সমৃদ্ধি ভাল কি মন্দ, সে মীমাংসা করার সাধ্য আমার নেই। তবে আদর্শ যদি ঠিক থাকে আর সুবুদ্ধি থাকে, তবে সমৃদ্ধি মন্দ কি? যাহোক চীনা মানুষের কোন পরিবর্তন আমি দেখিনি। দলে দলে ছেলেমেয়েরা জিনস্‌ পরে ইয়ার্কী দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা কোথাও আমার চোখে পড়েনি। শহর বা গ্রাম সর্বত্রই

সাইকেল একমাত্র বাহন। পূর্বের মতই সাইকেল চড়ে কাজে যায় সমস্ত কর্মক্ষম নরনারী। দোকানপাট খুব বেশী বাড়েনি। আমার পূর্ব পরিচিত বিজ্ঞ ব্যক্তিটি আমাকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনেক কথাই বললেন, সে সব কথা অন্যত্র লিখব। এখন ইনার মঙ্গোলিয়া সম্বন্ধে কিছু লিখছি। পিকিংয়ে চারদিন কাটিয়ে আমরা একটা ছোট প্লেনে ইনার মঙ্গোলিয়ার রাজধানী হোয়েহট-এ পৌছলাম। এদেশের প্রত্যেকটি নামের একটি মানে আছে। হোয়েহট—মানে সবুজ শহর। এ প্রদেশের লোকসংখ্যা মাত্র ২৪ মিলিয়ন। এয়ারপোর্টে আমাদের অভ্যর্থনা করতে এলেন ফ্রেণ্ডশিপ সংস্থার ভাইস প্রেসিডেণ্ট আর এক-জন কর্মী, দুজনেই মহিলা। ছোট প্লেন—টিকৃটিকে সিঁড়ি, তাঁরা যেন আমায় কোলে করে নামিয়ে নিলেন। ফ্রেণ্ডশিপ সোসাইটি সরকারী সংস্থা। এঁরাও সরকারী কর্মচারী। অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা এ সংস্থায় কাজ করেন।

হোয়েহট শহরটা ছোটই। মাত্র ১২ লক্ষ লোক বাস করেন এই শহরে কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে জমি অনেক বেশী। সমস্ত ইনার মঙ্গোলিয়ার আয়তন ১'৭৮ মিলিয়ন স্কোয়ার মাইল। শহর থেকেই দেশটা বেশ অনুর্বর মনে হলো। বহু যত্ন করে সারি সারি অসংখ্য গাছ লাগান হয়েছে এয়ারপোর্ট থেকে শহরে যাবার এবং শহরের মধ্যে সমস্ত রাস্তার দুধারে। এক মাপের গাছ সব। পপলার, পাইন, উইলো আর লোকাস্ট—এছাড়া কোন গাছ নেই, কোন পুরনো বা বৃদ্ধ বৃক্ষও চোখে পড়ল না। প্রশস্ত রাস্তার মাঝখানে দু সারি আর দুপাশে তিন চার সারি করে গাছ নানান বৈচিত্র্যে সাজান। প্রত্যেকটি রাস্তা এমন কি শহরের পুরনো রাস্তা ও গলিতেও এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ বা নোংরা নেই। নোংরা ফেলবার জন্য ইয়োরোপের মত সর্বত্র ঢাকনা দেওয়া বড় বড় ড্রাম বসান আছে। সব ময়লা সেখানে জমা হচ্ছে। একি আমাদের দেশে চলবে? যেখানে ম্যানহোলের ঢাকনা হামেশাই চুরি হয়ে যায় সেখানে এত দামী ড্রাম একটা রাতও থাকবে না।

একটু বিশ্রাম করে প্রথম দিনই আমরা এখানকার ন্যাচারাল হিস্ট্রি

মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। এখানে পিকিংম্যানের সময়কার আদিম অর্ধমানবের কংকাল, করোটি প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে দেখলাম। এ সব দেখলে শ্মশান বৈরাগ্যের উদয় হয়।

মঙ্গোলিয়ায় বহু উপজাতি, তাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। এদের কারো কারো লিখিত ভাষাও আছে। তবে এখন অনেকেই হান ভাষা জানে। উপজাতিদের পোষাক ভিন্ন ভিন্ন এবং বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তারা সকলেই এখন সাদাসিধে পোষাক পরে।

এ শহর নূতন। স্বাধীনতার পরই এর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। পুরনো স্টাইলের বাড়ি একটাও চোখে পড়ে না, সবই সাদামাটা চৌকো চৌকো মডার্ন বাড়ি। একটি লামা মন্দির ও একটি মসজিদও এখানে আছে। মসজিদটির কারুকার্য এ দেশীয় প্যাগোডা স্টাইলের, রঙ সবুজ। কিন্তু মসজিদ বলে চেনা যায়। আগে থেকে জানানো ছিল না বলে ঢোকা হলো না।

এখানে একটি মঙ্গোলীয় উপজাতি আছে 'হুই'—তারা মুসলমান। এদের একটি অল্পবয়সী ছেলে আমাদের সঙ্গে ডিনারে বসেছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইসলাম ধর্মের সে কিছু জানে কিনা। বিশেষ কিছু বলতে পারল না ছেলেটি। বলল, রমজানে সে উপোষ করে না।

কমিউনিজম আসার আগে লামা ধর্ম প্রচলিত ছিল মঙ্গোলিয়ায়। বৌদ্ধধর্ম ও আদিম তিব্বতী তন্ত্রাচারের মিশ্রণে লামাধর্ম তিব্বত থেকে এদেশে এসেছিল।

হোয়েহটের লামা মন্দিরটি খুব সুন্দর করে সাজানো হলেও কেমন মলিন ও শ্রীহীন। এখানকার লামারা পুরনো ইতিহাস বললেন। একটি প্রকাণ্ড উঁচু আসন দালাই লামার নামে উৎসর্গীকৃত, তার উপরে তাঁর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি রাখা আছে। এরা বোধহয় আশা করে তিনি একদিন এই আসনে এসে বসবেন।

সারা চীন জুড়ে বহু লামা মন্দির আছে, বৌদ্ধ মন্দিরও আছে। চীনের নানা লামা মন্দিরে তারাদেবী ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তিও দেখেছি, কিন্তু এখানে কেবলই বুদ্ধ মূর্তি।

একপাশে কাপড়ে জড়ানো অনেকগুলি তিব্বতী পুঁথি চোখে পড়ল। লামারা বললেন ওগুলি চিকিৎসা শাস্ত্র, ভেষজ, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ের গ্রন্থ। বুদ্ধমূর্তি প্রদক্ষিণ করে সামনে ধূপ জ্বালাবার ব্যবস্থা ও বাক্সে দক্ষিণা ফেলার ব্যবস্থাও রয়েছে এবং ব্যবহার হচ্ছে। বুঝলাম সব ধর্মই আছে এখানে, তবে ধর্মের উগ্রতা নেই, ধর্মান্ধতাও নেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে। ধর্মের হুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে আমাদের সমাজ যেমন বিষাক্ত হয়ে গেছে, তেমন হতে পারেনি। ধর্মের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এখানে। যেমন হুইরা কিছু কিছু মুসলমানী নিয়ম মানলেও এক বিবি থাকতে অন্য বিবি গ্রহণ করতে পারে না। পর্দা বা বোরখার চিহ্ন নেই এদেশে। আমরা তো এখনও মুসলমান মেয়েদের জন্য কিছুই করতে পারিনি!

চেঙ্গিস খাঁর একটি মূর্তি আছে এখানে। আমার ধারণা ছিল তিনি মুসলমান ছিলেন কিন্তু শুনলাম তিনি 'তাও' বা জ্ঞানী পুরুষ। একজন 'তাও' তাকে ধর্মকথা শোনাচ্ছেন এইরকম চিত্রই উৎকীর্ণ রয়েছে মর্মরে।

এখন হোয়েহট শহরের কথা বন্ধ করে বরং যে তৃণভূমি দেখতে এসেছি তার কথাই বলি। সকালবেলায় হোটেহট থেকে দুখানা গাড়িতে আমরা চারজন রওনা হলাম। এবার যেখানেই গিয়েছি চীন সরকার দুখানা করে এয়ার কণ্ডিশনড্ গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমাদের জন্য। এমন আন্তরিক সমাদরে আমরা অভিভূত ও বিস্মিত হয়ে ভেবেছি, আমি তো তেমন কেউকেটা কেউ নই তবে বোধহয় আমার বয়সের জন্যই এত সমাদর এঁদের। আমাদের সঙ্গে চাও নামে যে মেয়েটি এলেন সেরকম কোমল দরদী মেয়ে আমি কমই দেখেছি। আমাকে যেন তিনি মায়ের মত কোলে করে রেখেছেন! মেয়েটি ইনার মঙ্গোলিয়ার ফ্রেণ্ডশিপ সোসাইটির একজন বিশিষ্ট কর্মী।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা তৃণভূমির মধ্যে এসে পড়লাম।

প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন পথের দুপাশে সযত্নে লাগান পপ্‌লার, শহরে গ্রামে পথে পথে তরুশ্রেণীর শোভা। এটাতো গাছের দেশ নয় তৃণের দেশ তবু সর্বত্র কত যে সমান উচ্চ গাছের সারি, দেখলে আশ্চর্য হতে হয়।

পার্বত্য পথে দু ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে আমরা 'সিজি ওয়াংচি' নামে কাউন্টিতে এসে পৌঁছলাম। চীনে টুরিজম এখন একটি বড় ব্যবসা। তাই বড় বড় শহরে যেমন জমকালো হোটেল হয়েছে তেমনি গ্রামাঞ্চলেও দূর দূর প্রান্তে সর্ব সুবিধাযুক্ত অসংখ্য গেস্টহাউস হয়েছে। এই রকম একটি গেস্টহাউসে আমরা বিশ্রাম ও ভোজনের জন্য নামলাম। মিসেস্ চাও মিজি আমাদের মঙ্গোলীয়া প্রবাসের নিত্যসঙ্গিনী, ছুটোছুটি করে নিপুণভাবে আমাদের স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ভুরিভোজন ও শৌখিন লেপের নীচে বিশ্রামের ব্যবস্থা হলো। চীনে সব সাটিনের লেপ, চাষীর বাড়িতেও। সিজি ওয়াচিং শহরটি সাড়ে চার হাজার ফিট উঁচুতে, বেশ ঠাণ্ডা।

এখান থেকে আমরা হর্সমেনদের তৃণভূমির অভিমুখে চলতে লাগলাম। ক্রমেই মনে হতে লাগল—এলেম নূতন দেশে, যতদূর চোখ যায় ঘাসের তরঙ্গ। ঢেউ খেলানো মাটির ওপর ঘাস, শুধু ঘাস—একটিও বৃক্ষ নেই, গুল্ম নেই, লতা নেই, চোখকে কিছু আড়াল করে না। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'বেশি দেবার ইচ্ছাটা সম্ভবপরের শত্রু—কিন্তু অল্প দিয়েও কতজন পৃথিবীকে কৃতার্থ করেছে, যেমন তৃণ, বনস্পতির মত ফল ফুল সে দিতে পারে না বটে, তবে ধরণীকে মরুর আক্রমণ থেকে সেই তো রক্ষা করছে।' এই বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে এসে 'তৃণাদপি সুনীচেন' কথাটিও কবির প্রশংসা মনে হল। সামান্য টপ্‌সয়েলের উপর এই গুচ্ছ গুচ্ছ ঘাস কত প্রাণীর জীবন রক্ষা করেছে! মাঝে মাঝে যে মাটির বাড়িগুলি চোখে পড়ল তাও পবিত্র, পরিচ্ছন্ন। একদা অত্যন্ত নোংরা চীন আজ অতি সুমার্জিত—ধূ ধূ করছে আন্দোলিত তৃণভূমি, মাঝে মাঝে ভেড়ার পাল, মাঝে মাঝে ঊর্ধ্বগ্রীব উটের দল আমাদের দেখছে—সুন্দর কাঁচা কাঁকরের পথ, তাছাড়া মাঠের উপর দিয়েও গাড়ি চলেছে কখনো কখনো। এই অপরূপ দৃশ্যের মধ্য দিয়ে 'বায়ুনহুমান' নামে একটি গ্রাম বা প্রোডাকশন টিমে পৌঁছলাম আমরা। এখানকার অঞ্চলপ্রধান জামিয়া—আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করলেন। আমরা একটা গোলাকার তাঁবুর মধ্যে ঢুকলাম।

তাঁবুকে এরা বলে ইয়টি। ঘরের মাঝখানে ছোট ছোট টেবিল, চারপাশে কার্পেট। সেখানে আসন পেতে বসালেন। সামনে টেবিলে আহার্য বস্তু। পেয়ালা সাজানই ছিল, শৌখিন পোষাক পরিহিত জামিয়ার সুন্দরী কন্যা চা ঢেলে দিল। ঝলমলে পোষাক পরা টুকটুকে গাল-ফুলো সুন্দরী মেয়েটি যেন আরব্যউপন্যাসের পাতা থেকে উঠে এসেছে। এরা চা খায় তিব্বতীদের মত মাখন দিয়ে। মিলেট ও ময়দার টুকরো ভাজা দিয়ে—মন্দ লাগল না। জামিয়া তারপর যথারীতি বললেন স্বাধীনতার আগে অর্থাৎ ১৯৪১-এর আগে কী অবস্থা ছিল ও এখন কী কী উন্নতি হয়েছে দেশের। এই রকম সব ছোট ছোট স্থানে ইলেকট্রি-সিটি, টেলিফোন ও টেলিভিশানের ব্যবস্থা হয়েছে। বায়ুনহুমান স্থানটি ত্রিকোণ, তাই ঐ শব্দটির অর্থ সমৃদ্ধ ত্রিকোণ।

আগে সবাই যাযাবর ছিল, এখন সকলেরই বাড়ি হয়েছে। শীতে তৃণভূমির সন্ধানে তাঁবু নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে সবাই গ্রীষ্মে আবার ফিরে আসে। একটা তাবু খাটাতে পনের-বিশ মিনিটের বেশি সময় লাগে না। কাঠের রেলিং তৈরীই থাকে, সেইগুলি জুড়ে জুড়ে গোল কাঠামো তৈরী হয়। ছাতের জন্যও তির্যকভাবে কাঠ লাগানো হয়—তারপর সম্পূর্ণটা উটের লোমের ফেল্ট বা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ভিতরটায় যার যেমন সাধ্য শৌখীন কাপড় লাগায়। আমরা যে তাঁবুতে প্রথম অভ্যর্থিত হয়েছি সেটাতে সাটিন ও ব্রোকেড ছিল। যেটাতে রাত্রি-বাস করলাম সেটা ছিল সাধারণ কাপড়ের।

আগে চিকিৎসা করতেন লামারা। শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল শুধুই লামা তৈরী করা। জামিয়া নিজেও লামা ছিলেন, কিন্তু যা শিখে ছিলেন তা তাঁর কোন কাজে লাগেনি। কারণ শেখেননি কিছুই, অর্থ না বুঝে শুধুই মুখস্থ করেছেন। আমি জানি তিব্বতীরাও এমনি করত। জামিয়া জানালেন, ৮১ সাল থেকে যে নূতন 'ইনসেনটিভ' দেওয়া হচ্ছে তাতে সাধারণের অর্থাগম বেশি হচ্ছে। এটা শুধু পশু পালকদের নয় চাষীদেরও দেওয়া হচ্ছে। পূর্বে চাষীরা সরকার-নির্দিষ্ট সংখ্যক পশু উৎপাদন করত ও সরকারের কাছে বিক্রি করত। এখন নির্দিষ্ট

মাপের ও প্রকারের শস্য বা পশু সরকার বা কো-অপারেটিভকে দিয়ে উদ্বৃত্তটা নিজেরা বিক্রি করে উপার্জন করতে পারে।

জামিয়ার অভ্যর্থনা শিবির থেকে আমরা আধুনিক হর্সমেনদের বাড়ি দেখতে রওনা হলাম। জমির ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে কয়েক মাইল যেতেই দূরে একটা স্তূপের মত দেখা গেল—খুবই প্রাগৈতিহাসিক আকৃতির। তার গায়ে টুকরো টুকরো পাথর বসানো। জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওটার নাম 'আও বাও'—তৃণভূমিতে নানা জায়গায় অনেক আওবাও ছড়ানো আছে। বিশেষ দিনে এখানকার লোকেরা এর সামনে বলি দেয়। চেঙ্গিস খাঁর সময়ও এই প্রথা চালু ছিল। তিনিও যুদ্ধজয়ের পর বলি দিতেন। একবার একটা আওবাও ভেঙ্গে অনেক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল। আওবাওয়ের তিনদিকে তিনটি থামের উপর ত্রিশূল দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। এই বৌদ্ধ ও লামার দেশে মহাদেবের আয়ুধ ত্রিশূল কেন? প্রশ্নটা আমাকে বেশ ভাবিয়েছিল। পরে লামা মন্দিরেও ত্রিশূল দেখেছি। বুই আলি—যিনি বহুদিন ধরে চীনে আছেন, আমাকে জানান যে, সমস্ত সিল্ক রুটের নানা স্থানে এই চিহ্ন পাওয়া যাবে। সিল্ক রুট সেই প্রসিদ্ধ পথ, যে পথ দিয়ে মহাচীনের সঙ্গে ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য চলত। যে পথ দিয়ে চীনাংশুক আসত ও শত শত সওদাগর নানা পণ্য নিয়ে যাতায়াত করত। শুনলাম এখন যদিও মোঙ্গলরা কুসংস্কার মুক্ত তবুও অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আও-বাওয়ে বলি দিয়ে থাকে।

'আওবাও' পার হয়ে আমরা একটি গ্রাম্য বাড়িতে গেলাম। এই ছোট গ্রামটিতে দুটি মাত্র বাড়ি। আসলে এখানকার জনসংখ্যা খুবই কম। আড়াইশো স্কোয়ার কিলোমিটারে মাত্র তিনশো লোক বাস করে। দুটি তিনটি বাড়ি নিয়ে তিন চার মাইল ব্যবধানে দুটি গ্রাম দেখলাম। প্রচণ্ড বাতাস তাই উইণ্ডমিল বসিয়ে বায়ুপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রিসিটি করা হচ্ছে।

একটি ঘরে ঢুকে দেখলাম—চীনা কায়দায় প্রকাণ্ড বিছানা পাতা, বিছানার নিচ দিয়ে গরম জলের পাইপ চালিয়ে গরম রাখছে

বিছানা। এক কোণে লোহার উনুনে প্রকাণ্ড কড়ায় দুধ গরম হচ্ছে, তার থেকে ছেঁকে ছেঁকে সর খাওয়া চলছে। ঘরে টেলিভিশনও আছে। গৃহস্থ জানালেন, এখন তাঁদের আর কোন অসুবিধা নেই। নূতন প্রবর্ত্তিত ইনসেনটিভ ব্যবস্থায় কিছু নিজস্ব সম্পত্তিও হয়েছে তাদের। কমিউনকে দেবার পর যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তা তাদেরই। এই উদ্বৃত্তের জন্য তাই তারা খাটছে বেশি। স্ট্যাটিসটিক্ দিয়ে বোঝালেন, ১৯৮১ সালের পর তারা এখন অনেক সচ্ছল। কমিউনিস্ট দেশের এসব কথায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া চলে না—রেজিম বদল হলে আবার হয়ত নূতন কিছু শোনা যাবে। তাই চোখে যতটুকু দেখা যায় বিনা দ্বিধায় ততটুকুই মানতে হয়। একবার মাও সে-তুং নাকি বলেছিলেন—কেবল চর্ম চক্ষে সব দেখা যায় না টেলিস্কোপও লাগে, মাইক্রোসস্কোপও লাগে সবটা দেখতে।—তা এই দুই যন্ত্রের কোন সূক্ষ্মতম সংস্করণ হয়ত মানুষের মাথাতেই থাকে। আমিও তা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। ফেবরার পথে আর একটি গ্রামে একটি উইণ্ড মিল দেখলাম। লোহার স্তম্ভের উপর আড়াআড়িভাবে লাগানো পাখার মত কয়েকটি দাঁড় তীব্র হাওয়ার চাপে ঘুরছে। ঢেউ খেলানো ঘাসের মাথার ওপর দিয়ে শোঁ-শোঁ শব্দে পবনদেব তাঁর প্রচণ্ড লীলায় মেতেছেন। গাড়িতে বসে আমি এই দৃশ্য দেখতে লাগলাম। তিব্বতে যাওয়া হয়নি, তবে বোধহয় তার চেয়েও অগম্য স্থানে এসে পড়েছি যার বিস্ময় কাটতে চায় না।

এরপর আমরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট তাঁবুতে ফিরে এলাম। বাইরে আকাশের চাঁদটা যেন বড় কাছে এসে গেছে। তারাগুলি বড় বড় দেখাচ্ছে, পরিষ্কার আগুনের মতো জ্বলছে ব্রহ্ম হৃদয়। তাঁবুর ভেতরে চারদিক ঘিরে সুন্দর বিছানা সাজানো, মাঝখানে একটা উনান। থরে থরে সাজানো লেপের স্তূপ। এক একটা তাঁবুতে চার-পাঁচ জন শোওয়া যায়। কনকনে বাতাসে ঘুরে এসে উনানটা দেখেই মনে হলো একটু আগুন হয়ে ভালো হয়। কিন্তু এদেশে এখন গ্রীষ্মকাল, উনানের চিমনি-গুলি খুলে দেওয়া হয়েছে। সমর ইশারায় বলল, থাক। কিন্তু আমাদের বক্তব্য ওরা বোধহয় বুঝে ফেলল। একটু পরেই দেখলাম তাঁবুর

মাথার টুপিটা খুলে একটা টিনের চিমনি উনানের সঙ্গে লাগানো হচ্ছে। চিমনির ওপরের অংশটা তাঁবুর বাইরে বেড়িয়ে রইল। তাঁবুর ওপরের ফেল্টের ঢাকনাটা খানিকটা খোলা রইল, কার্বন-মনোক্সাইড্ জমে যাওয়ার ভয়ে বন্ধ করা হলো না। রাত্রের খাবার ব্যবস্থা দেখলে বিশ্বাস করা কষ্ট অশ্বজীবীরা এত সুখাদ্য খায়! খাবার টেবিলে সকলের স্বাস্থ্য কামনার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ে মঙ্গোলীয় রীতিতে নেচে নেচে গাইলো—'দূরদেশী বন্ধুরা তোমরা আনন্দ এনেছ, আমাদের এই তৃণভূমিতে স্বর্ণময়ুর এনেছ।'—শুনলাম স্বর্ণময়ূর অর্থ সমৃদ্ধি।

রাত্রে তাঁবুতে আমার সঙ্গে থাকলেন মিসেস চাও। সমর ও লী পাশের তাঁবুতে শুতে গেল। মাঝরাতে হঠাৎ খুব বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির ছাঁট মাথা মুখ ভিজিয়ে দিল। চিমনীর পাশে যে ফাঁকটা ছিল, সেই ফাঁক দিয়েই জল এসে সব ভিজিয়ে দিচ্ছিল। ঘোর অন্ধকার, উঠে বসে কী করব ভাবছি। চাও উঠে একটা বাতি জ্বাললো। তারপর আমাকে ধরে ধরে যে দিকটায় জল আসছিল না সেদিকে নিয়ে গিয়ে, তিনটে সাটিনের লেপ চাপিয়ে মাথার চার পাশে স্কার্ফ জড়িয়ে, গুছিয়ে দিল। রাত্রে তিন-চার বার উঠতে হলো চাও-ও আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠল, অতন্দ্র প্রহরীর মত।

এতখানি সেবা আমি আর কোনদিন কারু কাছে পাইনি মার কাছে ছাড়া। মায়ের সেবার হাতখানি যেন এই অপরিচিতার হাতের ভেতর দিয়ে আমার কপাল স্পর্শ করল। এই দূর দেশে এসে উপলব্ধি করলাম মানুষের মূল চরিত্র সর্বত্রই এক।

বাইরে হুহু করে বাতাস বৃষ্টিকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। মজবুত তাঁবুর অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবছি রবীন্দ্রনাথ যখন আরব বেদুইন হতে চেয়েছিলেন তার বহু পরে যখন তাঁর চলৎশক্তি নেই, যখন ভ্রমণ কাহিনী পড়েই পৃথিবীর নানান দেশের নানা বৈচিত্র্য অনুভব করছেন তখন লিখেছিলেন—

দক্ষিণ মেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহা জনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।

মানুষকে যিনি ভালোবাসেন তিনি নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে মানব ঐক্যকে খোঁজেন। আজ আমার কী সৌভাগ্য যে, এতদিনে এই সুদূর অগম্য রাজ্যে আসবার সুযোগ হয়েছে।

রাত্রের অন্ধকারে বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে একটি অতি পুরাতন সত্য নতুন করে অনুভব করলাম—মানুষ তার সুখ দুঃখ স্নেহ প্রেম নিয়ে সর্বত্রই এক। এই মহা জনশূন্যতায় বাঙালী মায়ের হৃদয় নিয়ে আমার মাথার কাছে বিনিদ্র আছেন যে রমণী তাঁর পোষাক পৃথক, ভাষা জানি না কিন্তু স্নেহে শ্রদ্ধায় সুন্দর সেই হৃদয়টি আমার অচেনা নয়।

গণতন্ত্র ও সংরক্ষণশীলতা

'ধর্মান্ধতা সাম্প্রদায়িকতা গণতন্ত্রের রূপায়নের অন্যতম বাধা' এই ছিল সম্প্রতি যুব উৎসবের আহুত জাতীয় সংহতি দিবসে একটি আলোচ্য বিষয়। বর্তমান ভারতে রাজনৈতিক মতদ্বন্দ্বে যে বিপর্যয়ের সূচনা দেখা যাচ্ছে তাতে গণতন্ত্রের রূপায়নের প্রধান অন্তরায়গুলি কি, তা ভাববার সময় এসেছে। এ কথা বোধহয় সকলেই স্বীকার করবেন যে, স্বাধীনতার বিশ বৎসর পর গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বহু বাগবিস্তার সত্ত্বেও জঙ্গী ফ্যাসিষ্ট মনোভাব ক্রম বর্দ্ধমান। ব্যাপক অরাজকতা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, জঙ্গী ফ্যাসীবাসের পক্ষে অনুকুল অবস্থা সৃষ্টি করছে। উগ্র জাতীয়তাই ফ্যাসিষ্ট নীতির উৎসাহক। জাতিপ্রেম বা সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য বা সাম্প্রদায়িক গর্ব—এ সবের ফলে এমন একটা ঐক্য ও শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে যাতে বিরুদ্ধ পক্ষকে নির্মমভাবে ধ্বংস করে ফেলতে কোথাও বাধে না। শিক্ষায় দর্শনে বিজ্ঞানে শিল্পে সঙ্গীতে উন্নত, মানবিক সম্পদে সম্পন্ন, জার্মানজাতি ঐ উগ্র সাম্প্রদায়িক অবুদ্ধির উন্মাদনায় কী হত্যালীলাতেই না সেদিন মেতে উঠেছিল! এ কাজ সম্ভব হয়েছিল সম্প্রদায়গতভাবে ইহুদীদের সম্বন্ধে যুগ যুগ সঞ্চিত ঘৃণার ইন্ধনে। একটি দেশের জনগণ সম্প্রদায়গতভাবে বিভক্ত ও বিদ্বিষ্ট থাকলে এ বিপদ ঘটার সম্ভাবনা সর্বদাই থাকে। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে আবশ্যকীয় অবস্থা হচ্ছে জনগণের মধ্যে ঐক্য, সর্বাঙ্গীন উন্নতি চেষ্টার একযোগী আগ্রহ।

জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যের প্রধান হন্তারক আজ সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতার নানা রূপ। প্রাদেশিকতাও তার অন্তর্গত। তবু এই উপমহাদেশের দুই যুধ্যমান মহা ধর্ম, যে ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ হীনতার তাড়নায় সর্বনাশের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সে বিষয়টিই বিশেষভাবে আলোচ্য।

ভারতবর্ষে প্রচলিত এইখানে উদ্ভুত বা বাহির থেকে আগত সবগুলি

ধর্মেরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংরক্ষণশীলতা। ধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য হলেও ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টভাবে অন্যান্য বহু বিষয়ে ভারতীয় মতের এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়।

আমরা বরাবর শুনে থাকি ভারতীয়রা ধর্মপ্রাণ, তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ধর্মের প্রভাব। বিশেষত হিন্দুদের তো কথাই নেই—তাদের স্নান আহার আহার্য বস্তু উৎসব ও নিত্যকর্মের অনেকগুলিই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। এবং ধর্ম যেহেতু অপরিবর্তনীয় সেইহেতু ধর্মের এই আনুষঙ্গিকগুলিও এতদিন সেই রকমই স্থায়ী মূল্যে মূল্যবান বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

হিন্দুধর্মের পরিপোষণের জন্য এই যে নানাবিধ সংস্কার অনুষ্ঠানে ও আচারে সমাজে প্রচলিত হয়েছে তার অনেকগুলির জন্যই শাস্ত্র নির্দেশ খুঁজে পাওয়া গেলেও আবার অনেকগুলিই স্থানীয় গুরু-পুরুত ঠাকুমা-দিদিমা মোড়ল-পীর ইত্যাদির নির্দেশেই শাস্ত্র হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস-প্রবণতা, নির্ভরপ্রবণতা, এবং আত্মশক্তি ও চিন্তার প্রতি অবিশ্বাসই এই ধরনের বহু বিচিত্র শাস্ত্র গড়ে ওঠার মূলে আছে। 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'—এই মন্ত্র বহু ভাবাবেগে উচ্চারিত হলেও যথার্থ প্রশংসনীয় ভাব কি না তা বিচার্য।

ভারতের দুটি প্রবল ধর্মসম্প্রদায়ই ধর্মকে আধ্যাত্মিকতা বা পারলৌকিক চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ রাখেনি, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কার্যের সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসন যুক্ত হয়ে ধর্ম ও আইন এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগুলি ঐতিহাসিক কারণে তার বিশেষ রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। অবশ্যই তার মধ্যে কতগুলি চিন্তা আছে যা চিরকালের জন্য সত্য কিন্তু আবার কতগুলি নিয়ম প্রথা ও তত্ত্ব বলা হয়েছে—যা সেই বিশেষ কালের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার থেকে জাত। জগতের সবগুলি উল্লেখযোগ্য ধর্মই বিজ্ঞানের যুগ আরম্ভ হবার পূর্বে কল্পিত ও শাস্ত্রবদ্ধ হয়েছে। বিজ্ঞান যে নূতন জগৎ আবিষ্কার করল, এই চির পরিচিত প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির যে বহুধা প্রকাশ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বিচার

ও যুক্তির পথে মানুষকে সত্যের যে রূপ দেখাল, সত্যকে চিনবার যে পথ নির্দেশ করল, তার ফলে মধ্যযুগীয় সমস্ত কল্পনার আমূল পরিবর্তন হতে বাধ্য।

যুক্তির চেয়ে বিশ্বাসকে বড় করে দেখবার পথ বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে প্রায় নষ্ট হয়ে গেল—যে কৃষ্ণ তর্কে মিলিয়ে যায় তাকে বিশ্বাসের মায়ালোকে খুঁজে বেড়াবার স্পৃহা বিজ্ঞানের যুগে তাই কমে গেল। তা সত্ত্বেও সমাজের মধ্যে যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল তার মূল অস্বীকার করতে না পারলেও, ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্যবশতই পুরো-পুরীভাবে সেই পরিবর্তন বা কোনো বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী একালের অধিকাংশ মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হলো না।

ভাবনা ও চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ যার উপর তার সমগ্র চরিত্রের ভিত্তি স্থাপিত, তাকে বিভিন্ন কোঠায় সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না তাই ধর্মীয় সংরক্ষণশীলতার সঙ্গেই জোট বেঁধে আছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেরও অনড় রক্ষণশীলতা।

রক্ষণশীলতা বলতে আমরা বুঝি সেই প্রকারের মনোবৃত্তি যা সব পরিবর্তনকেই সন্দেহের চোখে দেখে, যা যা কিছু হয়ে গেছে তাই চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়ে নূতনের প্রতি জিজ্ঞাসাকে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠতে দেয় না; শাস্ত্রবাক্য গুরুবাক্যকে অভ্রান্ত ও নিত্য বলে মেনে নিয়ে সমাজের চলচ্ছক্তিকে যা শৃঙ্খলিত, ক্রমে অনড় ও জড় করে ফেলতে চায়। সংরক্ষণশীলতা জন্মায় প্রধানতই স্থায়িত্ব লিপ্সা, অনিশ্চয়তার ভয় প্রভৃতি কারণ থেকে। অজ্ঞাত যা কিছু তাকেই আমাদের ভয়, তাই চির পরিচিত গৃহকোণই আমাদের অবলম্বন—এইটাই পিছুর টান, বলাকায় রবীন্দ্রনাথ সেই গতিহীন অনড় সমাজের কথাই বলছেন—

আমরা চলি সমুখ পানে,
কে আমাদের বাঁধবে
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

এই পিছুর টানে যখন সমাজের গতি নষ্ট হয়, অজানার ভয়ে যখন

সে প্রস্তরীভূত হয়—তখন তাঁর বাঁচা মরা সমান হয়ে যায়, সে জড়ের স্থায়ীত্ব লাভ করে। একটি বৃহৎ শিলাখণ্ড যুগ যুগান্ত পাহাড়ের বুকে স্থির থাকে। এক একটি জীবনের স্ফুলিঙ্গ চঞ্চল প্রাণের গতিতে মুহুর্মুহু ফুরিয়ে যায়। তবু প্রাণই কাম্য, জড়ত্ব কাম্য নয়। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ হিন্দু সমাজে জীবনাকাঙ্খাই তার জীবনে মৃত্যুকে ডেকে এনেছে। স্থায়ীত্বই চরম লক্ষ্য নয়, কোনো মতে টিকে থাকাটাও উন্নতি নয়। জগতে এমন বহু বানর গোষ্ঠী আছে যারা দীর্ঘকাল টিকে থাকা সত্বেও কোনোরূপ উন্নতির পথে এগুতে পারেনি। 'পিছুর টান' যে 'সামনের গতি'র বিঘ্নস্বরূপ একথা বিতর্কসাপেক্ষ নয়।

হিন্দু সমাজে মনুর যুগের রীতিনীতি আচার নির্দেশ আজও প্রচলিত আছে শুধু নয়, তার মূল এমনভাবে বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গ্রথিত যে তার হাত থেকে উদ্ধারের উপায় দেখা যায় না। উদ্ধার না হবার আরো কারণ এই যে, সংরক্ষণশীলতার সঙ্গে সঙ্গেই কতগুলি ব্যবসায়ী বৃত্তি প্রসার লাভ করে থাকে—মানুষের ভয় ও অন্ধ বিশ্বাসকে পুঁজি করে যে সব ব্যবসা গড়ে ওঠে তার প্রভাব শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রবল। এই vested interest-ই প্রগতির বাধা, গণতন্ত্রের শত্রু! অর্থনৈতিক কাঠামো বদলাবার চিন্তাতেও তখন এরা জুজুর ভয় দেখায়, রাজনৈতিক পরিবর্তনকেও তারা সর্বনাশের সূচনা বলে ঘোষণা করে। যদিচ পরিবর্তন অর্থই প্রগতি নয়, তবু পরিবর্তন ছাড়াও প্রগতি সম্ভব নয়, যুগের প্রয়োজন অনুসারে নূতন নূতন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষ পথের দিক পরিবর্তন করবে তবেই সে উন্নততর অবস্থার মধ্যে সার্থকতা লাভ করবার সুযোগ পাবে। কিন্তু ভারতের দুইটি মহাধর্মই পরিবর্তন বিরোধী, শুধু ধর্ম চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক জীবন ও দৈনন্দিন আচার অনুষ্ঠানেও তারা যুগ যুগ পূর্বের রীতি নীতিকে কড়া পাহারায় রক্ষা করতে চায়।

যদিও ইসলামের অভ্যুদয় এককালীন পুরাতন জীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে, অযৌক্তিক অনুষ্ঠানাদির বিরুদ্ধে, নূতন চিন্তা নূতন পথের

প্রদর্শক রূপেই হয়েছিল, তবু ক্রমে তা ধর্মের পাণ্ডাদের হাতে পড়ে একই রকম অনড়ত্ব প্রাপ্ত হয়ে ইসলামের অন্তর্নিহিত বিপ্লবাত্মক নীতিকে ধ্বংস করে ফেলেছে। ধর্ম রক্ষকদের শ্রেণীস্বার্থের কাছে ইসলামের বিপ্লবী শক্তি বহুদিন পরাভূত হয়েছে। এখন দুটি ধর্মেরই মূল বক্তব্য এই যে "একদা আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই অনাগত ভবিষ্যত পর্যন্ত আমরা স্থির থাকব—অনড় থাকব। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কোন নড়চড় সহ্য করব না।"

এই রকম মনের ভাব জাতীয় আন্দোলনের সুরু থেকেই নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মুসলিমদের মধ্যে ধর্ম সংস্কারপ্রিয় ইংরেজি শিক্ষা বিরোধী ওয়াহবি আন্দোলন পশ্চাৎমুখী মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। অতীত গৌরবের এক স্ফীত গর্বই এই সব আন্দোলনের মূলে—যদিও তাঁরা এগুলিকে ধর্ম সংস্কার ও প্রগতি রূপেই কল্পনা করেছেন। হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক ইংরেজি শিক্ষার ফলে বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করলেও —হিন্দু সমাজ সংস্কার চেষ্টায় যুক্তি বিচারের প্রয়োগ হলেও পিছুর টানও বড় কম ছিল না। যে সমস্ত ধর্ম সংস্কার বা সমাজ সংস্কার হয়েছিল পুরানো শাস্ত্র ঘেঁটে তার স্বপক্ষে সমর্থন জোগাড়ের প্রচেষ্টাই এই পশ্চাৎ মুখীনতার নিদর্শন। বহু যুগ পূর্বে রচিত শাস্ত্রে যে বিধি বিধান আছে তার পরিবর্তন যদি প্রয়োজন হয় তবে তার জন্য সেই শাস্ত্র থেকেই নির্দেশ খুঁজতে হবে কেন? বর্তমানেও গোহত্যা নিবারণ আইন করার আলোচনা প্রসঙ্গেও সরকারী তরফ থেকে শোনা গেল একদা হিন্দুরাও গরু খেত, অতিথির নাম ছিল গোঘ্ন. অতএব হিন্দুধর্মের সঙ্গে গোহত্যার বিরোধ নেই। বস্তুত অর্থনৈতিক দিক থেকেই এ প্রশ্ন বিচার্য। হিন্দুরা কবে কি করেছিলে কিংবা মুসলমানের কোরবানীর কি নির্দেশ আছে সে দিক থেকে নয়। মুসলমানদের বহু বিবাহ-নিরোধ আইন প্রণয়নের প্রসঙ্গও সেই একইভাবে দেখা যায়। গোঁড়ারা বলেন—শরিয়তের পরিবর্তন সম্ভব নয়. আধুনিক উদার মতাবলম্বীরা বলেন কোরাণে আছে চারটি স্ত্রীকেই সমান চক্ষে দেখবে এতো সম্ভব নয়, অতএব প্রকারান্তরে

কোরাণের বহু বিবাহ নিষিদ্ধই আছে। বস্তুত এখনও আমরা সে যুগেই বাস করছি যে যুগের কোনও শক্তিমান নর-বৃষ বলেছিল যে, লাইব্রেরি পুড়িয়ে দাও কারণ কোরাণে যা আছে তা তো কোরাণেই আছে, আর কোরাণে যা নাই তা থাকারও প্রয়োজন নাই।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ার পক্ষে এই পশ্চাৎমুখীনতাই সবচেয়ে বড় বাধা। এরই ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায় তার সমস্ত কর্মের প্রেরণা খোঁজে নিজ-নিজ অতীত ঐতিহ্যের মধ্যে, কোথাও সত্য কোথাও কাল্পনিক কোথাও বা অতিরঞ্জিত ভাবালুতায় এক স্বর্ণময় অতীতের গৌরবে পূর্ণ হয়ে যায়। অহংকারই ঘৃণার উল্টো দিক। হিন্দুরা অতীত হিন্দু গৌরবে ভরপুর—'ঘরেতে বসে গর্ব করি পূর্বপুরুষের আর্য তেজ দর্প ভরে পৃথ্বী থর থর'—আর যে মুসলমান জীর্ণ শীর্ণ কৃষ্ণবর্ণ তনু আজরাইলের গহ্বরে প্রবিষ্ট, সেও ভাবে মোগল রক্ত তার ধমণীতে টগবগ করছে এবং আওরংজীবের সে একজন সদ্য নিযুক্ত উকীল।

ধর্ম এবং ইতিহাস কোনোটাই উপেক্ষনীয় নয়। মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিকতার স্থানও আছে। স্থান আছে অতীতের বহু ধর্ম চিন্তার। বিজ্ঞানের যত আবিষ্কারই হোক Ten Commandments আজও সত্য, আজও সত্য নিষ্কাম কর্মের উপদেশ, কোরাণের নির্দেশিত সৌভ্রাত্র্য ও সাম্যের বাণী—প্রত্যেক মানুষ শুধু তার অতীত ধর্মের সঙ্গে নয় ইতিহাসের সঙ্গেও বাঁধা। তার জন্ম ইতিহাসের গর্ভে কিন্তু তার জীবন ভবিষ্যতে—মানুষ যেমন তার পূর্ণতার জন্য জরায়ুতে ফিরে যায় না তেমন অতীত ইতিহাসেও ফিরতে পারে না—সে ফেরাই মৃত্যু।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পূর্বে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে এক একটি ধর্ম গড়ে উঠেছিল, গড়ে উঠেছিল এক একটি নরগোষ্ঠির ইতিহাস—তার নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে। ক্রমেই ভূগোলের সীমারেখা মুছে যাচ্ছে, মানুষ মানুষের কাছে আসছে,—আমরা আজ সেই ইতিহাস রচনার মুখে যা সমগ্র মানুষের ইতিহাস, আজ আমরা সেই ধর্মেরই সন্ধানী যা সকল মানুষের গ্রহণযোগ্য।

বিশেষ সমাজের, বিশেষ কালের, বিশেষ স্থানের প্রয়োজনে উদ্ভূত

বিধি নিষেধ, আচার অনুষ্ঠানে বা শৃঙ্খলাবদ্ধ ধর্ম আজ মানুষের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। সেই কারণেই ধর্মনিরপেক্ষতা আজ আধুনিক রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্য নীতি। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি ইংরেজি সেকুলার (Secular) শব্দের অনুবাদ এবং অনুবাদে অর্থটি পরিস্ফুট নয়। বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে যার ইচ্ছামত শব্দটির প্রয়োগ করছে। কারো কারো মতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অর্থ—সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের সকল প্রকার আনুষাঙ্গিক আচার অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার সমেত সংরক্ষিত হবার অধিকার! অতএব ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সমাজ সংস্কার বা পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তন অচল! কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন সামাজিক প্রথা সংস্কার, আইন প্রভৃতির যুগোপোযোগী পরিবর্তন করবার জন্যই। সেকুলার শব্দটির অর্থ পার্থিব—পার্থিব বা জাগতিক ব্যাপারকে ধর্ম বা পারলৌকিক আধ্যাত্মিক ব্যাপার থেকে পৃথক করাই সেকুলারিজম্। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে যুক্তি বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা, তাকে শাস্ত্র বচন, গুরুপুরুত মোল্লাপীরের আপ্তবাক্যের বন্ধন মুক্ত করাই এর উদ্দেশ্য। তা নাহলে দেশের সর্বজনের পক্ষে প্রযোজ্য আইন প্রবর্তিত হতে পারে না ফলে সাম্যের বাণী ভ্রষ্ট হয়। গণতন্ত্রের মূল সূত্র সাম্য। মনুর নির্দেশ বা শরিয়তের নির্দেশ অনুসারে চললে সাম্যর ক্ষেত্র থেকে অনুন্নত জাতি ও স্ত্রীলোক বাদ পড়ে যায় এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্ম নির্দেশ অন্য সকল সম্প্রদায়ের উপর জবরদস্তি করতে থাকে। ফলে সাম্য বা গণতন্ত্রের মূলই জর্জরিত হয়ে যায়।

ভারতে সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই যখন এই জাগতিক সমস্ত ব্যাপারে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, যা কিছু আইন রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার সঙ্গে কোন ধর্মেরই গাঁটছড়া বাঁধা থাকবে না। একদা কোনদিন মনু কি বলেছিলেন বা প্রফেট কি বলেছিলেন তার যত মূল্যই থেকে থাক, আজ সেখান থেকে নির্দেশ না খুঁজে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের জন্য এক আইন, এক নিয়ম প্রবর্তিত হবে। কে গরু খায় কে খায় না, কার ধর্মে কোরবানি আবশ্যকীয়, কার ধর্মে গোহত্যায় মহাপাপ, সে প্রশ্ন না তুলে অর্থনৈতিক দিক থেকে তার বিচার হবে। অর্থনৈতিক

বৈজ্ঞানিক কারণগুলি বিচার করে সমস্ত মানুষের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র এক ব্যবস্থা নির্ভয়ে প্রচলন করবে—একটি নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়ে জনগণকে একাগ্র, এক মঙ্গলের অভিমুখী করবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য কথাটি যতই শ্রুতিমধুর হোক—এই বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু আচারে বিভক্ত, বিপরীত, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাহীন মনোভাবের উত্তাল তরঙ্গের উপর সূক্ষ্ম ভাবালু ফেনিল আবরণ বিছিয়ে যে ঐক্য, তা কোনো ঝড়ঝঞ্ঝার ধাক্কায় টিকতে পারে না, তা বারবারই ছিঁড়ে গুঁড়িয়ে যেতে চায়। ঐক্যের কথা অনেক শোনা গেল, শোনা গেছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথাও কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এ এক নড়বড়ে দেশ, যার সর্বাঙ্গে জোর মেলেনি, ছ্যাকরা গাড়ির চাকার মত তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি খুলে পড়তে চাইছে।

ঐক্যের প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করে না কিন্তু ঐক্য ঘটানর জন্য জীর্ণ অট্টালিকার উপর পলেস্তারা না লাগিয়ে তাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে নূতন ভিত্তিস্থাপন করতে হবে সে কথা চিন্তা করার সাহসই হবে না তাদের, যারা ভোটের আশায় সবরকম নিবুদ্ধিতার কাছে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। নবজাতক/পঞ্চম বর্ষ/১ম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজী

একই সময়ে একই দেশে দুজন এমন বিরাট যুগস্রষ্টার আবির্ভাব অভাবনীয় ঘটনা, তাছাড়া পরস্পরের খুব নিকটে এসেছিলেন এঁরা ; দেশের জাতীয় জীবনকে যুগোপোযোগী রূপ দিতে দুজনের সাধনা ও মননা যুক্ত হয়েছিল সামাজিক আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। সেজন্য এঁদের কর্ম ও জীবনের তুলনা সহজেই মনে আসে। কিভাবে এই দুই পুরুষোত্তম পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে ঐক্য বা বিরোধ কতখানি তা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে—সেই আলোচনায় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যকেই লক্ষ্য করেছেন অনেক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ। গান্ধী জীবনীর লেখক লুই ফিসার লিখেছেন—গান্ধী যদি হন ধান্যক্ষেত্র, রবীন্দ্রনাথ গোলাপ বাগান। কেউ বা বলেছেন, এঁরা দুজনে জীবনের দুই দিকে দাঁড়িয়েছেন যে দুটি পরস্পরের পরিপূরক, এথিকস্ ও এস্থেটিকস্—কিন্তু মংগল ও সুন্দর জীবনের দুটি পৃথক দিক নয়। একই সত্যের দুই ভাব। গান্ধিজী রাজনীতির মধ্যে এনেছেন কবিত্ব আর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রাজনীতি অনুস্যুত। যদি এই দুই সমসাময়িক ব্যাক্তির দুখানি ফোটোগ্রাফ একত্র দেখা যায় তাহলেও মনে হবে যেন তাঁদের মধ্যে পার্থক্য অলঙ্ঘ্য। যেন তাঁরা দুজন দুটি ভিন্নমুখী ভাবের দ্যোতক, যেন শিক্ষা সংস্কৃতি মূল্যবোধ ও মানসিকতায় দুজনে বিপরীত।

একথাও মানতে হবে যে কোনো কোনো সমস্যার সম্মুখে দুজনে একমত হতে পারেননি। সেই মতপার্থক্যগুলি বিভিন্ন ঘটনার তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। কিন্তু মূল গান্ধী নীতি—বলতে আমাদের মনে যে কতগুলি মূল্যবোধ স্থির হয়ে আছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—সত্যের জন্য সংগ্রামে অহিংস সাহসের প্রয়োগ। যুগ যুগ ধরে মানুষের ইতিহাসে সাহসকে দৈহিক বলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। বীর যোদ্ধার বীরত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে দৈহিক বলই প্রযোজ্য—'অহিংস সাহসের' ব্যাপক

প্রয়োগ ও 'অহিংস বারের' যুদ্ধ কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন ঘটনা। এ যুগে নৈতিক সাহসের দৃষ্টান্ত গান্ধিজীর একটি প্রধান দান।

দ্বিতীয়—জীবনের সর্বক্ষেত্রে অহিংসার ব্যাপক পরীক্ষা। তৃতীয়—সামাজিক পরিস্থিতিতে এই অহিংসারই প্রকাশ রূপে অসাম্য দূর করবার কার্যক্রম গ্রহণ—অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম। দারিদ্র্য, অশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গঠনমূলক বিবিধ কর্মপ্রবাহ ও সংগঠন। মানুষের মুক্তির জন্য সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টায় গ্রামকেন্দ্রিক পরিকল্পনা। এই সমস্ত কাজই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিবেক চেতনায় বিধৃত যে কতগুলি পরম ও চিরন্তন মূল্যবোধের দ্বারা, তার সঙ্গে দেশের ও সর্বমানব সমস্যার বিষয়ে তাদের উভয়ের চিন্তাধারার পার্থক্য ও সাজুয্য আলোচনা করলে তবেই এই দুই পুরুষোত্তমের চিন্তা ও বাক্যের গভীর ঐক্য বাগার্থের মতই সম্পৃক্ত বলে বোঝা যাবে।

অনেকে একথাও বলেন যে গান্ধিজী মূলত কর্মী, রবীন্দ্রনাথ কবি, সেখানেই তাঁদের প্রধান পার্থক্য—এটাও বিচার্য। রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েও কর্মী, তাঁর কর্ম দেশ ও বিদেশে পরিব্যাপ্ত। তিনি সাহিত্য ও কবিতা নিয়ে তুরীয়ানন্দে বিভোর হয়ে দিন কাটাননি। দেশের বিচিত্র সমস্যা, কি রাজনৈতিক কি সামাজিক, তাঁকে সততই উত্তেজিত করেছে—তিনি নির্দ্বিধায় হিত অথচ অপ্রিয় বাক্য বলেছেন। তাই এক্ষেত্রেও তাঁদের পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে বহিরঙ্গভাবে লক্ষ্য হলেও পূর্ণ সত্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধিজীর প্রথম যোগাযোগ ঘটে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মাধ্যমে। এই ইংরেজ পাদ্রী সেই ঘোর ইংরেজ বিরোধিতার দিনেও যে দুজনের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ সেতু হয়েছিলেন এও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর গভীর ঐক্যের দ্যোতক।

১৯১৩ সালে গান্ধিজী প্রবর্তিত দক্ষিণ আফ্রিকায় অভিনব সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অভিঘাত সারা বিশ্বের সাধুজনের মনে এক নতুন পথের নির্দেশ দেয়। তখন শান্তিনিকেতন থেকে এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন দক্ষিণ আফ্রিকায় ঐ কাজের সামিল হতে যান। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজকে লেখেন—

'You know our best love was with you, while you were fighting our cause in Africa along with Mr. Gandhi and others.'

গান্ধিজী সম্বন্ধে সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ।

কিন্তু এর বহু পূর্ব থেকে প্রথম জীবনের রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেন একজন তেমনি নেতার অপেক্ষায় ছিলেন যাঁর অন্তর সম্পদ, আত্মার শক্তি, পাশব বলের থেকে উত্তীর্ণ করে মনুষ্যত্বের পথে নেতৃত্ব দেবে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মকাল থেকেই ভারতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নানা ভাবে রূপ নিচ্ছিল। হিন্দু মেলায় ভারতের জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তিও ক্রমে কংগ্রেসের বিবিধ কর্মে ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত হয়েছে। এর মাঝে মাঝে বিস্ফোরকের মত সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা যার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি মনস্বী ব্যক্তিদের যে উদ্যম ছিল তা তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছে। যখন বাংলাদেশের হৃদয় ক্ষুদিরাম প্রভৃতির আত্মত্যাগ ও শৌর্যকে অবলম্বন করে উদ্বেলিত হয়েছে তখনও রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। সেই যুক্তি তাঁকে যে পথ দেখিয়েছে তা হিংসার পথ নয়।

পরশাসন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের প্রথম যে চিন্তা আমরা পাচ্ছি সে স্বদেশী বা বিদেশী শাসক সম্পর্কে নয়—শাসকের গাত্রবর্ণ সম্বন্ধে অন্যান্য সাধারণের মত উৎকণ্ঠিত তিনি প্রথম থেকেই ছিলেন না। শাসনের পদ্ধতি, শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ সম্বন্ধেই তিনি ভেবেছেন—ভেবেছেন মূল থেকে অর্থাৎ মানব চরিত্রের বিশেষ মূল্যবোধগুলিকে উজ্জীবিত করে মানব সম্বন্ধকে কলংকশূন্য স্বার্থশূন্য সম্প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে। কোনো সাময়িক প্রয়োজনে তিনি চিরন্তন সত্যগুলিকে খর্ব করতে রাজী নন।

তাই দেশে যখন রাজাপ্রজার সম্বন্ধ নিয়ে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে চিন্তার উন্মেষ ঘটছিল তখন প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ এই স্বাধীনতার একটি পূর্ণরূপ কল্পনা করছিলেন—সেই পূর্ণরূপের প্রতীকরূপে একজন দেশনায়কের মূর্তি বারবারই

তাঁর মনে আসা যাওয়া করেছে—সেই নেতা, যিনি নিজে কিছু চান না, যিনি সকলপ্রকার ক্ষুদ্র আসক্তি মুক্ত। যিনি তাঁর অন্তরস্থ নির্দেশ দৈববাণীর মত শোনেন আর নিঃসংসয়ে ঘোষণা করেন—পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ অথবা দীর্ঘ সাধনার শেষে যিনি বলতে সক্ষম—"আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ"—অর্থাৎ যিনি বলতে পারেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী'।

যখন ভারতবর্ষে কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছোটবড় নেতাদের নানা জাতীয় কোলাহল শোনা যাচ্ছিল বা সন্ত্রাসবাদের ক্রুদ্ধ রাজনীতি বহু লোককে উৎসাহিত উদ্বেলিত করে তুলছিল তখনও রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত আত্মস্থ বিবেকবাণী যে পথের নির্দেশ করেছে তা গান্ধিজীর পন্থারই পথীকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী ছিলেন তখনকার দিনের একজন তেজস্বিনী নেত্রী। বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন তাঁর আদর্শ এবং সে সময়কার সন্ত্রাসবাদী যুবকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল শোনা যায়। শুনেছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আগেকার দিন হলে তলোয়ারের সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ দিতাম। তাঁর বিবাহ হয়েছিল রামভুজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে—জালিয়ানয়ালাবাগের দুর্যোগের সময় যাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছিল পরে অবশ্য তা নাকচ হয়ে যায়। এই তেজস্বিনী মহিলা সে সময়ে বাঙ্গালীর শৌর্য বীর্য উদ্যমের প্রেরণা জাগাতে বীরাষ্টমী ব্রত পালনের উৎসব করেন ও প্রতাপাদিত্যকে দুই কারণে মহাবীর বলে আখ্যায়িত করেন। এক তিনি দিল্লীর বাদশাহকে অগ্রাহ্য করে তাঁর স্বাধীন সত্তার দৃঢ়ত্ব দেখিয়েছেন। দ্বিতীয়ত প্রয়োজনবোধে তিনি স্নেহ মায়া মমতা বিসর্জন দিয়েও কর্তব্যকর্মে অটল থেকেছেন। সন্ত্রাসবাদের কাছে তখন একটি বড় ধর্ম ছিল বিনা দ্বিধায় ক্রুরকর্ম করবার ক্ষমতা অর্জন।

কিন্তু শান্তি ও প্রেমের প্রতীক কবির বাণী অহিংসার মূল সত্য থেকে বিচ্যুত হতে রাজি নয়। উদ্বেল দেশপ্রেমের জোয়ার যখন এ রকম নানা কাজে উদ্দীপিত তখন তিনি 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকখানিতে প্রতাপাদিত্যের পৌরুষ ক্রুরতার

প্রতিরূপ বলে নিন্দা করেন। ১৯০৯ সালে এই নাটক রচিত হয়। ১৯০৫-এ বোমার মামলার পর সন্ত্রাসবাদীদের বীরত্বে সারা দেশে যখন বাহুবলের ও কর্মসিদ্ধির নীতি গৃহীত—তখন প্রতাপাদিত্যের জীবনে ক্রূরতার নিন্দা—রবীন্দ্রনাথের আত্মস্থ সত্যদৃষ্টির একটি বিশেষ পরিচয়।

বসন্ত রায়কে গুপ্তহত্যা করতে মন্ত্রীর দুর্বলতা দেখে প্রতাপাদিত্য বলছে—

"তুমি শিশু! খুন করাকে তুমি জুজু বলে জান। তোমার বুড়ি দিদিমার কাছে শিখেছ খুন করাটা পাপ। খুন করাটা যেখানে ধর্ম সেখানে না করাটাই পাপ। এটা তোমার এখনও শিখতে বাকী আছে যে মুসলমান আমাদের ধর্ম নষ্ট করেছে। তাদের যারা মিত্র তাদের বিনাশ না করাই অধর্ম। পিতৃব্য বসন্ত রায় নিজেকে ম্লেচ্ছের দাস বলে স্বীকার করেছেন। ক্ষত হলে নিজের বাহুকেও কেটে ফেলা যায়।"

বলাবাহুল্য গান্ধিজী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই কোনো অবস্থাতেই খুন করাটা ধর্ম বলে মানতে রাজি নন।

রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনিই নেতা—যার মধ্যে মানবোচিত সবগুলি গুণই সমাহৃত হয়েছে। প্রয়োজনের খাতিরে যে নিষ্ঠুর হতে পারে নিষ্ঠুরতা তার চরিত্রে যে বিকার ঘটাবে তা তার সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের পরিপন্থি—এমন মানুষের হাতে অন্য মানুষের ভার থাকা বিপদজনক। ন্যায়-অন্যায়ের একটি ধ্রুবত্ব ছাড়াও এই নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী, যিনি প্রজাদের মধ্যে জীবন সঞ্চার করছেন তিনি যেন গান্ধিজীরই প্রতিরূপ। সম্পূর্ণ অহিংস, সত্যে দৃঢ় ও মানব সত্যের অনুসন্ধানী এইরকম কতগুলি চরিত্র রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকগুলিতে বার বার দেখা দিয়েছে।

গান্ধিজী নানা উপলক্ষে বলেছেন—তার কোন শত্রু নেই তিনি ইংরেজের শত্রু নন—বরং তাঁর কাজ ইংরেজেরও মঙ্গল সাধন—ইংরেজের পরশোষণ নীতির তিনি সংশোধন চান, কিন্তু ইংরেজের অনিষ্ট করতে চান না। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে বসন্ত রায়ের মুখে রবান্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য বলেছেন—তলোয়ার যে এমন ভয়ানক জিনিস তাতেও শত্রুর শত্রুত্ব নাশ করা যায় না, কেমন করে বলব নাশ করা যায়? রোগীকে বধ করে যে

রোগ আরোগ্য করা সে কেমনতর আরোগ্য ? কিন্তু সঙ্গীত যে এমন মৃদু জিনিস তাতে শত্রু নাশ না করেও শত্রুত্ব নাশ করা যায়।"

বস্তুত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ গান্ধিজীর সংগ্রামই ছিল শত্রুত্বের বিরুদ্ধে, শত্রুত্ব বা বৈরীভাব নাশ করাই ছিল তাঁর মূল নীতি। তিনি এমনই সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়েছিলেন যেখানে প্রতিপক্ষ আছে কিন্তু শত্রু নেই।

এই 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি পরে যা 'পরিত্রাণ' নামে আবার লেখা হয়েছিল—দুটিতেই এমন অনেক বর্ণনা আছে যা বহু বৎসর পরের লবণ আইন আন্দোলনে মেদিনীপুরের অহিংস সত্যাগ্রহীদের কথা মনে পড়ায়।

প্রতাপাদিত্য হচ্ছেন 'গান্ধারীর আবেদন' নাটকে দুর্যোধনের মত—প্রভুত্বশক্তিরই প্রতীক, যিনি প্রজার হৃদয়ে প্রীতির আসন চান না, যিনি বলদর্পে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চান। দুর্যোধন বলছে—

> "প্রীতি দান স্বেচ্ছার অধীন।
> প্রীতি ভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন—
> সে প্রীতি বিলাক তারা পালিত মার্জারে
> দ্বারের কুক্কুরে আর পাণ্ডব ভ্রাতারে।
> আমি চাহি ভয়—সেই মোর রাজপ্রাপ্য।"

প্রতাপাদিত্যও এই চণ্ডশক্তির দ্বারাই রাজপ্রাপ্য আদায় করতে চান। তখন ধনঞ্জয় প্রজাদের বলেন, "রাজাকে গিয়ে বলবে—ঘরের ছেলে-মেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তাহলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে।"…অহিংস সত্যাগ্রহের একটি পূর্ণ চিত্র রয়েছে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও মাধবপুরের প্রজাদের বিদ্রোহের বর্ণনায়।

শুধু এ দুটি নাটকেই নয় ১২৯২ সনে লেখা রাজর্ষি উপন্যাসের মূল কাহিনীতেও অহিংসারই বাণী। বাংলাদেশ শক্তিসাধনার ক্ষেত্র—আর গান্ধিজীর চারপাশে ছিল জৈন ধর্মের আবহাওয়া। বাংলাদেশে বৈষ্ণব-রাও মাংসাহারী না হলেও মৎসাহারী। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পশুবলি অবশ্যই আপত্তিজনক। ত্রিপুরার রাজপরিবারের কাহিনী অবলম্বনে একটি স্বপ্ন দেখে রচিত এই উপন্যাসে মন্দিরে পশুবলির বিরুদ্ধে রাজা

গোবিন্দমানিক্যের চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ যে অহিংস, সংকল্পে দৃঢ়, কায়িক আঘাতের সামনে আত্মার শক্তিতে বিজয়ী, যে মানুষটিকে রূপ দিয়েছেন সেই আদর্শ-পুরুষের মধ্যে এক সঙ্গে রাজনীতি সমাজনীতি ও ধর্মের যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে, পরবর্তীকালে মহাত্মার জীবনেও আমরা তাই দেখছি। গোবিন্দমানিক্য দেখলেন পশুবলির রক্ত ও একটি বালিকার বেদনা। সেই বেদনাই তাঁকে চিরাচরিত ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে অধর্ম কোথায় তা দেখিয়ে দিল। এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত বিসর্জন নাটকে গোবিন্দমানিক্য একলা যুদ্ধ করছেন বহু শত্রুর সংগে—এই শত্রুরা কে? "নীচ স্বার্থ, নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্শ, অন্ধ অজ্ঞানতা, চির রক্ত পানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা।"—যে প্রথা ছাগ রক্তপাত বন্ধ হলে নর রক্তপাত ঘটাতে দ্বিধা করে না তারই দিকে ইঙ্গিত করে মনে পড়িয়ে দিলেন ধর্মের নামে কত রক্তস্রোত মানুষ বইয়েছে—তাই প্রেমময়ী অপর্ণার আহ্বান—"ও মন্দির ছেড়ে চলে আয়।"

ধর্মের নামে সম্প্রদায়ের নামে যে রক্ত ধর্মের অভিভাবকরা পাত করেছেন সেই রক্তপাতের অমোঘ যুক্তি রঘুপতির মুখে শোনা গেল—"পাপপূণ্য কিছু নাই। কেবা ভ্রাতা, কেবা আত্মপর! কে বলিল হত্যা কাণ্ড পাপ। এ'জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি প্রত্যেক পলক পাতে লক্ষ-কোটি প্রাণী চির আঁখি মুদিতেছে।···হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে কীটের গহ্বরে···হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে···চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে উর্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে মৃগসম। মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারে মহাকালী কাল স্বরূপিনী রয়েছেন দাঁড়াইয়া তৃষ্ণাতীক্ষ্ম লোলজিহ্বা মেলি—"

শক্তিপূজক মহাকালীর উপাসক বাঙালীর রাজনীতিক্ষেত্রে এই যুক্তি বার বার নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মানবধর্ম ভ্রষ্ট এই স্বার্থ সাধনের কুযুক্তি এমন একটা আইডিয়া বা ভাব হয়ে উঠেছিল যে তা অনেক সদ্‌গুণ বিভূষিত অন্যান্য শক্তিশালী মানুষেরও বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথও আইডিয়ার উপাসক কিন্তু তাঁর স্পষ্ট স্বচ্ছ দৃষ্টি দেখেছে যে জবরদস্তির দ্বারা যে জয় সে ভাবের বা আইডিয়ার জয় নয়।

"In my worship of ideas I am not a worshipper of Goddess kali—" এই মতে তিনি চিরকাল অটল—

রাজর্ষি উপন্যাস ও বিসর্জন নাটকে তাই এ যুক্তির সত্যকে উচ্চতর সত্য দিয়ে খণ্ডন করেছেন কবি। সে হচ্ছে স্নেহ দয়া, ক্ষমা অর্থাৎ মানবতার যুক্তি। এখানে রাজশক্তি ও পুরোহিত শক্তির যে রাজনীতির খেলা চলেছে সেখানেও রবীন্দ্রনাথের আদর্শপুরুষ গোবিন্দমানিক্য অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রাঘাত না করে হত্যায় উদ্যত নক্ষত্ররায়কে প্রেমে পরাভূত করে তার বিবেক উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন। গোবিন্দমাণিক্যের সেই আক্ষেপ—"জানিয়াছি দেবতার নামে মনুষত্ব হারায় মানুষ"—মনে পড়ায় ধর্মের নামে সম্প্রদায়ের নামে যে নরহত্যা মানুষের ইতিহাসে রক্তের কলংক চিহ্ন ফেলে গেছে এবং ক্রমেই ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে যা চণ্ডমূর্তিতে দেখা দেবে, বিশেষ করে এ কাহিনীর শেষ দিকে সাধু চরিত্র অহিংস কর্মী বিল্বনের উক্তি "না মহারাজ মানব হৃদয়ই প্রকৃত মন্দির। সেইখানেই খড়্গ শানিত হয় এবং সেইখানেই শত সহস্র নর বলি হয়। দেবমন্দিরে তাহার সামান্য অভিনয় হয় মাত্র।"

এই বিল্বন ও গোবিন্দমাণিক্য দুই জনের একত্রিত রূপই এক আদর্শ পুরুষের মূর্তি। বিল্বন কর্মী— রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকেই আদর্শ চরিত্রগুলি বঞ্চিত হতভাগ্য মানুষের সেবায় রত। তারা জাতিভেদের পরোয়া করে না। সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে নিচের তলার মানুষদের মধ্যে নানা কর্মে অক্লান্ত থেকে তাদের আনুগত্য লাভও এ সব কাহিনীতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"তিনি (বিল্বন) পীড়িত পাঠানদিগকে সেবা করিতে লাগিলেন—তাহাদিগকে পথ্য, পানীয় ঔষধ এবং তাহাদের মৃতদেহ গোর দিতে লাগিলেন। হিন্দুরা হিন্দু সন্ন্যাসীর অনাচার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল।"…

গান্ধী মহারাজকেও ভাঙ্গী কলোনীতে বাস করতে ও মুসলমানদের প্রতি সপ্রীতি ব্যবহার করতে দেখে হিন্দুরা কম আশ্চর্য ও ক্রুদ্ধ হয়নি।

বাল্মিকী প্রতিভাতে (১৮৯৭) ধর্মের নামে বলি ও ক্রূরবৃত্তির বিরুদ্ধে কবির বাণী প্রথমে অস্ফুট কাকলীর মত শোনা গিয়েছিল তা

ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে বিভিন্ন নাটক ও কাহিনীতে যে রূপ নিয়েছে তা স্পষ্টত একাধারে মানবধর্মের কাছে সম্প্রদায়িক ধর্মের শূন্যতা, সাম্য ভাবনা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ প্রভৃতি ভাবগুলিকে প্রকাশিত করেছে। গীতাঞ্জলীর অপমানিত কবিতাটিও তেমনি উল্লেখ-যোগ্য কবিতা। গভীর আবেগে স্পন্দিত এই অমোঘ ভাষণ হিন্দু ধর্মের একটি মূল আশ্রয় বর্ণাশ্রমের পরিণামের প্রতি ইঙ্গিত করেছে—

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

মানুষের প্রাণের ঠাকুরকে ঘৃণা করার অপরাধের প্রতি নির্দেশ করে কবির বাণী যেন অভিশাপের মত উত্থিত—

'বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।'

এই কবিতা বহু উচ্চারিত হলেও কোনো রাজনৈতিক নেতা, প্রথার বন্ধীত্ব মোচনের অভিপ্রায়ে তাঁদের সংগ্রামকে সমাজের গভীরে প্রবেশ করাননি।

পরবর্তীকালে যত স্বাধীনতাকামী নানাভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দেশের অগণিত পতিত বঞ্চিত অস্পৃশ্যদের জন্য তাঁরা এমনভাবে কেউ চিন্তা করেছেন তার প্রমাণ দেখিনা। সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত ইংরেজ বিতাড়ন তারপর সবই অনায়াস ও সহজলভ্য হবে অর্থাৎ স্বাধীনতার একটি খণ্ডিত অর্থই তারা ভেবেছিলেন। এক-মাত্র মহাত্মাজীই স্বাধীনতার পূর্ণ ছবিটিতে অগণিত অস্পৃশ্যের অনু-পস্থিতির অসামঞ্জস্য অনুভব করেছিলেন। দুর্ভাগা দেশের সবচেয়ে গভীর ক্ষত যেখানে, সেখানে তিনিই প্রথম সংগ্রামী যিনি আরোগ্যের প্রলেপ দিতে উদ্যোগী হলেন।

পরবর্তীকালে গান্ধিজীর যে স্বপ্নের ভারত তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের ভারত এক। যখন একদিকে মুসলিম রাষ্ট্র অন্যদিকে হিন্দু রাষ্ট্রের সংকীর্ণ চিন্তা দেশের বহু মানুষকে পেয়ে বসেছে তখন মহাত্মা যে জাতীয় চেতনার উদ্বুদ্ধ—ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করে গেলেন

সে রবীন্দ্রনাথেরই কল্পনার ভারত—যেখানে আর্য অনার্য হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেরই স্থান আছে। এমনকি ইংরেজও সেখানে অনাদৃত নয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে সব কাব্য গ্রন্থগুলির আলোচনা করলাম এ সমস্তই গান্ধিজীর ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে কর্মযজ্ঞ শুরু হবার পূর্বে রচিত। আদর্শ মানুষের যে ভাবরূপটি কবির মনে ক্রমেই স্ফুট হয়ে উঠছিল গান্ধিজী যেন তারই বিগ্রহ হয়ে আবির্ভূত হলেন।

কর্মী রবীন্দ্রনাথ হলেন গান্ধীপন্থী অথবা গান্ধী হলেন রবীন্দ্রপন্থী। মহর্ষি তাঁর কবিপুত্রকে জমিদারীর কার্যোপলক্ষে পাঠিয়েছিলেন বাংলা দেশের গ্রামে—জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সংস্কৃত আবহাওয়া থেকে সেই ম্যালেরিয়া জীর্ণ মূঢ় মূক অর্ধভুক্ত স্বদেশবাসীর বড় কাছা-কাছি এলেন কবি। সেখানেই জন্ম নিলো তাঁর গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা, চাষীদের জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপন, সমবায় শিক্ষা ও বিবিধ কর্মের হলো উদ্যোগ। সেখানেই প্রথম অনুভব করলেন যে চাষীর অর্জিত সম্পদে জমিদারের কোনো অধিকার নেই। শ্রীনিকেতনে এই পরিকল্পনা যে রূপ নিল—সে তার গ্রামমুখী অর্থনীতিরই একটি রূপ। সেখানে তাঁত বসল, নানা রকম কুটীরশিল্পের পত্তন হলো। গান্ধিজীর গঠনমূলক কর্মের সংগে ব্যাপকতার দিক থেকে ছাড়া এর আর কোনো বিভেদ ছিল না। কেবল একটি মাত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দুটি কর্মোদ্যোগের মধ্যে বৈপরীত্যের অনু-ভব ঘটাচ্ছে—সে হচ্ছে রুচির ভিন্নতা। গান্ধিজী চান কঠোর বৈরাগ্যের শুভ্রতা, বাহুল্যবর্জিত রূপশ্রী—রবীন্দ্রনাথ বলেন—প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে উদ্বৃত্তের মধ্যেই ঘটে মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, কাপড় তাঁতির হাতে বোনা হোক কিন্তু পাড়ের নক্সাটি একান্ত আবশ্যক। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ মাটির কুটিরে বাস করেছেন সানন্দে, কিন্তু সেই কুটিরের গায়ে আলপনার কারুকার্য তাঁর একান্ত প্রয়োজন। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্য বহু দূর বিস্তৃত।

অবশ্য অন্য দিকে পরিচ্ছন্নতার প্রতি গান্ধীজীর সদাজাগ্রত দৃষ্টি ও এক গভীর স্বচ্ছ সৌন্দর্য চেতনারই দ্যোতক।

বহুদিকে এই দুই বিরাট পুরুষের ঐক্য থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে

কর্মক্ষেত্রে যে মতদ্বৈধতাগুলি ঘটেছে সেগুলিও অসার্থক নয়—ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সমাজের ভিন্ন স্তরে তা কাজ করেছে এবং শেষের দিকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে গান্ধিজীর মধ্যে ক্রমে আমরা উভয়কেই পেয়েছি।

গান্ধিজী একদিকে দেশের অজ্ঞ মূর্খ অগণিত মানুষের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা, রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার চেষ্টা করছিলেন অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করছিলেন জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করতে—'যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি'—সেই মুক্তচিন্তার প্রবাহ বইয়ে দিতে—শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতে যে দুই শ্রেণী তৈরী হচ্ছে সেদিকেও তিনি অবহিত ছিলেন।

প্রধান মতদ্বৈধ দেখা গেল অসহযোগ আন্দোলনের সময়। রবীন্দ্রনাথ বললেন, আজ সর্বমানবের সহযোগিতাই আমাদের কাম্য অসহযোগ নয়। কারণ কবি ভুলতে পারেন না ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার।

"মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে—কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূত রূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোনো বিদেশী জাত এভাবে আসতে পারেনি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল। যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির প'রে। ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অংকুরিত বিকশিত হতে থাকে।"···এইখানেই গান্ধিজী ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার কেন্দ্রটি একটু দূর ছিল—রবীন্দ্রনাথ যে পরিবেশে জন্মেছিলেন, সেখানে হিন্দু সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডী, তার প্রথা সংস্কারের অচলায়তন, চিন্তার ক্ষেত্রে ভাঙতে শুরু হয়েছিলো। এই মনোবিপ্লবের হোতা ছিলেন রামমোহন, তাই বুদ্ধির মুক্তির জন্য রামমোহনের চিত্ত মহিমায় রবীন্দ্রনাথ অভিভূত ছিলেন। এই মুক্তির কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছিল এবং এই কাজে সর্বদিক থেকে অগ্রসর হচ্ছিলেন ঠাকুরবাড়ির

প্রতিভাধরেরা, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ। অপর দিকে মহাত্মাজ গোঁড়া রক্ষণশীলতার মধ্যে জন্মেছিলেন—রামমোহনের চিত্তশক্তির অভিঘাত সেখানে পৌঁছয়নি। অচলায়তনের পাথর একটি একটি করে সমাজের নানা ক্ষেত্র থেকে তাঁকেও সরাতে হয়েছে, সেটা করেছেন ক্রমে নিজ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে। ১৯২২ সালেও তিনি বলছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য একত্রে আহার বা আন্তবিবাহের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ তাঁকে শশঙ্কচিত্তে ধীরে ধীরে এগুতে হচ্ছে। এদিকে ১৯০৫ সালেও রবীন্দ্রনাথের পরিবারে ডোমজাতির পাচক রয়েছে সে সম্বন্ধে কোন চিন্তারই অবকাশ নেই। দ্বিজেন্দ্রনাথের বহু পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য মুনীশ্বর ছিল জাতিতে ডোম।

গান্ধিজীর জীবনেও ইয়োরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তির প্রভাব কম নয়। রাস্কিন, থুরো ও টলষ্টয়ের প্রভাবের কথা তো তিনি নিজে বার বার বলেছেনই, রাজনীতির ক্ষেত্রেও অসহযোগ বা 'বয়কট', বয়কটেরই অনুসরণ। উপবাসের প্রয়োগ রাজনীতির ক্ষেত্রে পশ্চিমেই প্রথম হয়েছে যদিও আত্মশুদ্ধির কারণে প্রায়োপবেশন ভারতেরই রীতি। গান্ধিজী নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে ধীরে ধীরে পথ করে নিয়েছেন। অসূয়াশূন্য স্বার্থশূন্য সত্যদৃষ্টির সামনে প্রতিপদে অচলায়তনের ইট একটি একটি করে খসে পড়েছে। প্রথম জীবনে তিনি হিন্দু সমাজের প্রথা সংস্কারের একটিও বন্ধনগ্রন্থি খুলতে ইতস্তত করেছেন তিনিই পরে শেষজীবনে অসবর্ণ বিবাহ, বিশেষত উচ্চবর্ণের সংগে হরিজন বিবাহ, একান্ত কাম্য বলেছেন এমন কি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহও তাঁর অভিপ্রেত মনে হয়েছে কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে এই যুক্তিবাদের প্রসার শুরু হবার আগেই রাজনৈতিক কারণে গান্ধিজীর পরিকল্পনাগুলি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্তের অনড়ত্ব, প্রথাবদ্ধতা ও সংস্কার মূঢ়তাকে আঘাত হানতে সচেষ্ট ও সদাজাগ্রত, তিনি চরকাকে একটি নূতন প্রতীক হয়ে উঠতে দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন। শংকার কারণও যে ছিল না তা বলি না। আজও দেখছি নানাবিধ দুষ্কর্ম করে ঠুঁটো

খদ্দর পরে সাধুত্বের ভান কিংবা সর্বরকমে গান্ধী অর্থনীতির বিরোধিতা করে সভাস্থলে চরকা কেটে রীতিরক্ষা চলছে। চিন্তা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে যা করণীয় তা না করে প্রথার অনুসরণ মানুষের মুক্তির অন্তরায়, চরকার দ্বারা যতটুকু উপকার তার চেয়ে তাকে বড়ো করে তুললে সেই বিপদ ঘটবে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের আশংকা; অপর দিকে সমগ্র দেশকে অর্থনৈতিক সূত্র ধরে একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীক দিয়ে সংঘবদ্ধ করা রাজনৈতিক কারণে অপরিহার্য মনে হয়েছিল গান্ধিজীর। দৈনন্দিন জীবনে দরিদ্রতম মানুষের সংগে সংশ্লিষ্ট চারকা একটি সর্বভারতীয় যোগ সূত্র হিসাবে জাতীয় সংগীতের মতই ঐক্যবোধ জাগাবে, একত্র কর্ম করার শক্তি দেবে—"সংগচ্ছধ্বম্" এর ভাবটি বেগ পাবে। হয়েও ছিল তাই। অগণিত মূঢ় মূর্খ দরিদ্র মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগী হবার একটি হাতিয়ার পেল যা একদিকে তাদের নিজ জীবন সমস্যার সংগে অন্যদিকে একটি বৃহৎ দেশব্যাপী আন্দোলনের সংগে যুক্ত করেছে। ব্যক্তি মানুষ তার ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের সংগে সমষ্টির লাভ লোকসানকে যুক্ত করতে পারছে—এই শিক্ষা এক কার্যকরী তালিম। স্বাধীনতা শব্দটি যা সহস্র সহস্র নরনারীর কাছে একটা শব্দ মাত্র ছিল তা অর্থবহ ও সত্য হলো সে অর্থ যতই সংকীর্ণ হোক। অন্য পক্ষে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টভঙ্গী যুক্তিনির্ভর। মহাত্মাজী যেখানে বার বার যুক্তির স্থলে 'সহজাত বিশ্বাসে' বেশী আস্থাশীল সেখানেই তাঁর সংগে ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য। মহাত্মাজি তাঁর সহজাত বুদ্ধি দিয়ে চরকা আন্দোলনের সংগ্রাম শক্তিকে বুঝেছিলেন, তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল তখনও রাষ্ট্রীয় মুক্তি—দেশের স্বাধীনতা। অন্য পক্ষে রবীন্দ্রনাথ মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির কথা ভাবেন। ভারতবর্ষের সম্পর্কে কুসংস্কার যুক্তিহীন প্রথা অন্ধভাবে শাস্ত্র বচনের অনুসরণ ঐগুলিই তাঁর কাছে মুক্তি পথের এক প্রধান অন্তরায়—তাই যখন গান্ধীজী বলেন য সকলে যদি এক বৎসর তাঁর উপদেশ পালন করে সূতা কাটে তবে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বাধীনতা আসবে এবং দেশের লোক যখন তার আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করে তখন রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হন। 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে তিনি

তাঁর প্রতিবাদ স্পষ্টভাবে বললেও এই রচনার প্রতি ছত্রে গান্ধিজীর প্রতি তাঁর অনুরাগ ও বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলছেন, "স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত। তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য; তাতে যেমন আশঙ্কা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচার বুদ্ধি চাই। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিধ তাঁদের ভাবতে হবে। যন্ত্র তত্ত্ববিদ্ যাঁরা তাদের খাটতে হবে। শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগাতে হবে।..."

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেও তথ্যানুসন্ধান পূর্বক পরিকল্পনা করা প্রয়োজন, তিনি বলছেন, "মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতএব এইতো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো—এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক?"

রবীন্দ্রনাথের কাছে যুগবাণী—যুক্তি বিচারের পথে সত্যকে প্রকাশ করছে—অপ্রমান্য ইনস্টিংকটের প্রতি তাঁর আস্থা নেই। অপর পক্ষে গান্ধিজী বার বার বলেছেন তিনি ইনস্টিংকটে নির্ভর করেন। এই প্রসঙ্গে বলি 'ইনস্টিংকট' কথাটিকে কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন 'দৈববাণী' —ও গান্ধিজী 'দৈববাণী'-তে বিশ্বাসী ছিলেন এমন একটা কথা আলোচনা করেছেন, গান্ধিজী যদি instinct শব্দটাই ব্যবহার করে থাকেন তবে ওটি একটি বৈজ্ঞানিক শব্দ, ওর মধ্যে দেবতা কোথায়? 'সহজাত বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি' যুক্তি দিয়ে বিচার্য না হলেও তার মধ্যে যুক্তি বা বিচার থাকে—মানুষের ক্ষেত্রে এই শক্তিই তার ক্রান্তদর্শনের ক্ষমতার উৎস। এটা কোনো অমানবিক অলৌকিক কাণ্ড নয়।

রবীন্দ্রনাথেরও যে কখনো কখনো এরকম 'ইনস্টিংকটের অভিজ্ঞতা ঘটেনি তা বলব না। প্রথম মহাযুদ্ধের আসন্ন উপলব্ধি বলাকার কবিতায় এণ্ড্রুজের কাছে চিঠিতে কি ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল এনণ্ড্রুজের রচনায় তা উল্লেখিত হয়েছে। সে অন্য প্রসংগ।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, বহুদিন ধরে আমাদের পোলেটিক্যাল নেতারা

ইংরেজী পড়া দলের বাইরে তাকাননি···(এখানে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র-নাথই প্রথম এই ধরনের স্বদেশীচর্চার অসারত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভায় বাংলায় ভাষণ দেন।) মহাত্মাগান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরীবের দ্বারে তাদের সংগে কথা কইলেন তাদেরি ভাষায়।'

এই ভাষা সব সময় নিখাদ যুক্তির ভাষা হওয়া সম্ভব ছিল না। অসমুদ্র হিমাচল বিপুল জনসজ্ঘকে উদ্বেলিত করে তুলতে গান্ধিজী আপন সহজাত বুদ্ধির নির্দেশে বহু স্থানে চালিত হয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিচক্ষণতা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দেশ ভাগের প্রারম্ভে ইংরেজের চাতুরীর সংগে মোকাবিলা করবার সময় দেখা গেছে। এই সহজাত বুদ্ধিই তাঁকে সাবধান করেছিল আসন্ন চক্রান্ত সম্বন্ধে। কিন্তু তখন তিনি তাঁর সহকর্মীদের সে বিষয়ে বিশ্বাস উৎপন্ন করতে পারেননি।

মহাত্মাজীর দুটি কথায় রবীন্দ্রনাথের আপত্তি প্রবল হয়েছিল— বিদেশী কাপড় অপবিত্র বা বিহারে অস্পৃশ্যতার পাপের শাস্তিরূপে ভূমিকম্প হয়েছে।

গান্ধী এখানে যে ভাষায় কথা বলছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে এটা অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রকে টেনে আনা।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এসব ক্ষেত্রে আধুনিক মানুষের মন রবীন্দ্রনাথের মতেই সায় দেবে। জহরলালেরও সায় ছিল সেই দিকে কিন্তু গান্ধিজী এমন অনেক কাজ করেছেন যেখানে যুক্তি পরাজিত হয়েছে কিন্তু তাঁর কর্মোদ্যোগ মোটামুটি সফল হয়েছে। ইংরেজের মত প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে প্রায়োপোবেশন. তেমনি একটি সার্থক অযৌক্তিক প্রয়োগ। এর বিপদ সম্বন্ধেও তিনি অজ্ঞ ছিলেন না যেজন্য বারংবার যে কোনো অজুহাতে অনুকরণ স্পৃহায় উপবাসের অস্ত্র ব্যবহার করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

বস্তুত গান্ধিজীকে যে এযুগের মানুষ তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারেনি তার একটি কারণ এই ভাষার দূরত্ব। তার ভাষা আবেগেরও নয় বিশ্লেষণেরও নয়—তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার বাহক মাত্র। যে পরি-

বেশে যে ভাষায় তাঁর চিন্তা লালিত তারই আশ্রয়ে তাঁর বাক্য রূপ নিয়েছে—তিনি বার বার ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থির রাখতে বলেছেন—আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষ একজন সর্বময় সৃষ্টিকর্তার ব্যক্তিস্বরূপে আস্থা রাখতে পারে না—কিন্তু কার্যকালে তিনি যখন বলেন 'সত্যই আমার ঈশ্বর' এবং জীবনে সর্বক্ষেত্রে সেই সত্যে অটল থেকে তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রমাণ দেন, তখন তাঁর ভাষা যাই হোক নাস্তিকও তাঁর কথার সত্যতা অস্বীকার করে না।

রবীন্দ্রনাথের সংগে গান্ধিজীর মতভেদের প্রসঙ্গ বহু আলোচিত কিন্তু এই প্রসঙ্গ বেশী গুরুত্ব পেয়েছে তাদের বাহ্যিক পার্থক্যের কারণে, অন্তরের দিকে, অনুভবের দিকে, সাংগঠনিক কর্মের দিকে, তাঁদের ঐক্যই গভীর. পার্থক্য শুধু প্রকাশভংগীর—এবিষয়ে সমগ্রভাবে বিশেষভাবে আলোচনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বই লেখা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে হিংসার প্রয়োগের পরিণাম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা গান্ধিজীর সংগে এক। উদ্দেশ্য ও উপায়, আদর্শ ও পথ উভয়ের সাম্য বিধান সম্বন্ধে উভয়েই নিঃসন্দেহ। বাংলাদেশের জনমত কোনোদিনই এমতের পোষক নয়। আজও নয়,—বিদেশী শাসকরা অন্তর্হিত তবু সামান্য সামান্য দলগত স্বার্থে দেশ রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন, শুভবুদ্ধি বর্জিত গণশক্তির উদ্‌ভ্রান্ত তাণ্ডবের সামনে দাঁড়িয়ে আজও বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে অহিংসার সত্য অস্বীকৃত।

কিন্তু এসম্বন্ধে গান্ধিজী ও রবীন্দ্রনাথের মত ছিল অভিন্ন। এবং গান্ধিজীর রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগের বহু পূর্বেই (১৯০৮ সালে) রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"একটি কথা আমরা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই অথচ তাহাতে করিয়া দেশের সমস্ত বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কিসের দোহাই দিয়া কোন সীমার মধ্যে সংযত করিবে? দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্‌খানে

ঠেকাইবে ?

দুঃস্বপ্ন যেমন দেখিতে দেখিতে অসংগত অসংলগ্নভাবে এক বিভীষিকা হইতে আর এক বিভীষিকায় লাফ দিয়া চলিতে থাকে তেমনি মঙ্গলবুদ্ধির অরাজকতার দিনে নিতান্তই সামান্য কারণে চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করিবার আয়োজন হয়। কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কুষ্টিয়ার নিতান্ত নিরপরাধ পাদ্রীর পৃষ্ঠে গুলিবর্ষিত হয়···বিভীষিকা অত্যন্ত তুচ্ছ উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মত্ততা মাতৃভূমির হৃদ্‌পিণ্ডকেই বিদীর্ণ করিয়া দেয়। এইরূপ ধর্মহীন ব্যাপারে প্রণালীর ঐক্য থাকে না প্রয়োজনের গুরু লঘুতা বিচার চলিয়া যায়। উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সুসংগতি স্থান পায় না—একটা উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। অদ্য বার বার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে···প্রশান্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা···এই বিকৃতিকে যে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই একবার প্রশ্রয় দিলে শয়তানের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখা হয়।···”

ক্ষুদিরাম প্রভৃতি তরুণের দল যখন প্রাণ হরণ ও প্রাণ ত্যাগের দ্বারা সমস্ত দেশের চিত্ত আবেগে মহিত করে তুলেছিল তখনও রবীন্দ্রনাথ তার এই মত দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন, “ফললাভ চরম লাভ নহে, ধর্ম লাভই লাভ। একথা যদি দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশ-হিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।”···

অহিংসার পথ ও ধর্মের পথ পরিত্যাগ করে যে কোন প্রকারে স্বাধীনতার জন্য যে সব স্বার্থত্যাগী বীর যুবক বালক অকৃতার্থ বাসনায় মৃত্যুর মুখে শেষ হয়ে গেল তাদের জীবন সত্যের প্রতি গভীর মমত্ব ও বেদনা বোধ ‘প্রশ্ন’ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, তা সত্ত্বেও কোনোদিনই এ পথের প্রতি তাঁর সমর্থন বা আস্থা ছিল না। সমস্ত দেশ জুড়ে যখন ‘অগ্নিযুগের’ অগ্নিদাহ জনমনকে উৎসাহিত উদ্দীপ্ত করেছে তখন তিনি লিখলেন ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাস। ঐ বইয়ের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়

তিনি যা লিখেছিলেন জনমতের উৎপাতে পড়ে তাঁকে পরের সংস্করণে তা বাদ দিতে হয়েছিল। চারঅধ্যায় সাহিত্য হলেও তার অন্তর্নিবিষ্ট কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, এক পক্ষে অনন্যসাধারণ সত্যনিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা রেখেও রবীন্দ্রনাথ মতপার্থক্যে অটল ছিলেন—সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে গান্ধিজীরও তেমনি মনোভাব বাংলাদেশে তাঁকে অপ্রিয় করেছে।

চার অধ্যায়ের ভূমিকায় আছে—

"তিনি (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়) ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী। অপর পক্ষে বৈদান্তিক—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী।···তিনি আমার সংগে আলোচনা কালে যে সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।···এমন সময় লর্ড কর্জন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হলেন······সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্ত মন্থনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন—স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ তীব্রভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিল। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা পন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্নাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল। এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সংগে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। মনে করেছিলুম হয়তো আমার সংগে তাঁর রাষ্ট্র আন্দোলন প্রণালীর প্রভেদ অনুভব করে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই।··· নানাদিকে নানা উৎপাতের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোর তেতালার ঘরে একলা বসেছিলাম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়।

কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলোচনার শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন, চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন—বললেন, 'রবিবাবু আমার খুব পতন হয়েছে'—স্পষ্ট বুঝতে পারলুম এই মর্মান্তিক কথাটি

বলবার জন্যই তাঁর আসা।"

বলবাহুল্য ব্যক্তি মানুষের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথও 'বিভীষিকাময় পন্থা' বা 'সন্ত্রাসবাদের' আশ্রয় গ্রহণকে 'পতন' বলেই মনে করতেন। 'চার অধ্যায়' গল্পটি এই ঘটনার সূত্র ধরেই লেখা।

বস্তুত হিংসা ও অহিংসার প্রশ্নে—উদ্দেশ্যে ও উপায়ের সামঞ্জস্য বিধানে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর মতে ছিল সম্পূর্ণ সঙ্গতি। তাঁদর মত-পার্থক্যের যে সূক্ষ্ম ভাবরেখা তা রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক। বস্তুত রাজনীতির কাজে ধর্ম ও নীতিকে অনাবশ্যক বোধ করার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত যুক্তিগুলিই গান্ধিজীর গৃহীত পন্থায় প্রযুক্ত। গান্ধিজী যেন তাঁরই মানস নায়কের প্রতিরূপ, সে কারণে রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে ঘোষণা করলেন—"আমরা গান্ধী মহারাজের শিষ্য" আর গান্ধিজীও বললেন তাঁকে, 'গুরুদেব'—যিনি জাগ্রত প্রহরীর মত সদা অনিমেষ দৃষ্টিপাতে রক্ষা করেছেন সত্যকে, ধর্মকে।

জীবনের শেষ দিকে এসে দুজনে হলেন সহকর্মী—গান্ধিজী যখন হরিজন আন্দোলন করছেন তখন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—চণ্ডালিকা, শুচি, প্রথম পূজা।

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠর চিন্তার সাজুয্য আরও বহুতর ক্ষেত্রে বহুভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। এখানে সংক্ষেপে যা বলা গেল তার শেষ কথাটি প্রথমে যা বলেছি তারই অনুরূপ। গান্ধিজীবনের মহত্তম অধ্যায়ের শেষ কয়েক বৎসর—রবীন্দ্রনাথ তা দেখেননি—কিন্তু এবারও ভবিষ্যতের পদধ্বনি বেজেছে তাঁর মধ্যে—খৃষ্টের উদ্দেশে লেখা শিশুতীর্থে সেই বাণী রেখে গেছেন—সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি, ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি, প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব।

কালজ্ঞ ক্রান্তদর্শী কবির আশায় আলোকিত এই ব[illegible] একাধারে অতীত ও ভবিষ্যতের কথা বলছে।

নব জাতক (৬ষ্ঠ বর্ষ) দ্বিতীয় সংখ্যা

ফ্যাসিস্ট রীতি

ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়ের বিশ বৎসর পার হওয়ায় সোভিয়েট দেশ-গুলিতে গত বছর একটি উৎসব হয়ে গেল। কিন্তু পরাজয় হয়েছে কিনা সেটাই আলোচ্য।

রাশিয়ায় কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠার সময় স্ট্যালিনের বজ্রমুষ্টি মানুষের বিচিত্র ইচ্ছার বহু অভিব্যক্তিকে কঠিনভাবে চেপে ধরেছিল সন্দেহ নেই। তা ছাড়া লৌহ-যবনিকার ওধারের সংবাদ কঠিন আবরণের ফাঁক দিয়ে যেটুকু গড়িয়ে এসেছে তা থেকে সত্য নির্ণয় করা যায়নি। যে সব বর্ণনা বিপক্ষের গল্প কাহিনীতে পড়া গেছে—তাও প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। তবু সত্যমিথ্যা মিশ্রিত বহু রোমাঞ্চকর কাহিনীর সংগে জড়িয়ে যাওয়ায় কমিউনিজমের মানবিক মহৎ আবেদনও অনেকখানি ব্যর্থ হয়েছে—মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই আতঙ্ক আজও অনেক মানুষকে এমন অন্ধ করে রেখেছে যাতে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত সে কমিউনিস্ট নামটা শুনলেই ভয়ে কাঁপছে। অথচ ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থানে ইয়োরোপের উপর যে তাণ্ডবলীলা হয়ে গল তার পূর্ণ পরিচয়, ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বীভৎস রূপের অনেক প্রত্যক্ষ পরিচয়, পাওয়া সত্ত্বেও সে সম্বন্ধে আমেরিকা ও আমেরিকার বাহুবন্ধ দেশগুলিতে বেশী আতঙ্ক দেখা যায় না—বস্তুত ফ্যাসিজিমের পদধ্বনি তারা শুনতেই পায় না কিংবা শুনেও শোনে না। যেমন পশ্চিম জার্মানীতে নাজি শক্তির পুনরুত্থানে এরা ভীত নন বরং সহায়ক। কিন্তু ভিয়েৎনামে পাছে কমিউনিস্ট প্রভাব বাড়ে সেজন্য সাতসমুদ্র পার হয়ে তাঁরা গদাহাতে অবতীর্ণ।

আমাদের দেশেও জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যেকার দেওয়াল নিয়ে যে ধারণা তা অনেকাংশে পশ্চিম জার্মানীর অনুকূল। পূর্ব জার্মানী থেকে অনেকে পালিয়ে পশ্চিম জার্মানীর সুখ-সৌভাগ্যের দিকে ছুটে আসছেন বলেই পশ্চিম জার্মানীর নাজি সংরক্ষণ ভূমিকা ভুললে চলবে না। আজকে সমস্ত পৃথিবী জুড়েই সাধারণ মানুষের দৃষ্টি পড়েছে

ভোগ্যবস্তুগুলির দিকে—আজকের পূজনীয় দেবতা Consumar goods হচ্ছে সভ্যতার মাপকাঠি। পূর্ব জার্মানীতে শুনেছিলাম, ভালো ব্লাউজ পাওয়া যায় বলে পশ্চিমে যাবার জন্য কোনো কোনো মেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমেরিকার অর্থে পশ্চিম জার্মানী এখন ধনী। অস্বীকার করা যাবে না যে জার্মান জাতির তুর্দমনীয় কর্মশক্তির জোর সেই অর্থ সহ-যোগে আবার প্রভূত শক্তিমান হয়ে উঠেছে—তাতে ক্ষেভের কারণ থাকত না যদি না সেই সংগে তার সর্বনাশা জাতিগর্ব মানবমঙ্গল বিরোধী স্বার্থবুদ্ধি আবার ফ্যাসি শক্তির জাগরণের সম্ভাবনা সূচিত করত।

নাজিদের তুষ্কীতি সম্বন্ধে আমাদের অনেক খবরই জানা আছে—বিশেষত আইখম্যানের বিচারের সূত্রে সে বীভৎসতার খবর সারা পৃথিবী জেনেছে। ন্যাশানালিষ্ট স্যোসালিজিমের নাম নিয়ে যখন জার্মানীতে এর অভ্যুদয় হয় তখন ন্যাশানালিজম্ কথাটির দ্বারা অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছিল। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে যে ক্ষমতা তার সংগে সমগ্র জাতির যোগ কোথায়?

১৯৩২ সালে মডার্ন রিভিউতে ইটালীতে ফ্যাসিজিমের রূপ দেখে এসে E. H. ছদ্মনামে কেউ একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে বলা হয়েছিল, ঐ সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা তুলনা করলে ইটালীর জায়গায় ইণ্ডিয়া শব্দটা বসিয়ে নিলেই মিলে যায় এবং ডিক্টেটরের জায়গায় ইংল্যাণ্ড। সৎ নাগরিকদের কাছে ডিক্‌টেটরশিপ ও ফ্যাশিশক্তি হচ্ছে একটা আশ্রয়স্থল—মুসোলিনীকে ভক্তি অর্ঘ্য দেবার সময় লোকে রাশিয়ার দিকে দেখিয়ে তুলনা করে—যেন এক নূতন সেণ্ট জর্জ তাঁর দ্বিমুখী সৈন্য চালনা করে বলশেভিক ড্র্যাগনকে বধ করছে। তাদের কাছে ফ্যাসিজম্ হচ্ছে একটি ধর্ম যা বলশেভিক ভীতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে—এসব লোককে কিছুই বোঝানো যায় না।

"ভারতেও মুসোলিনী সম্বন্ধে যে সব সহানুভূতিপূর্ণ প্রবন্ধ পড়া যায় সেগুলিতে আরো বেশী ভাবিত করে। বিশেষত এখন যখন ভারতে ফ্যাসিস্ট শক্তির অনুরূপ রাজশক্তির সংগে মরণপণ যুদ্ধ চলেছে। ভারতে ইংরেজশাসন ফ্যাসিস্ট শক্তির মতই, যা সৈন্য ও পুলিসের

সাহায্যে চলেছে।

"ইটালিতে ফ্যাসিস্ট পার্টির শাসনে ঐ পার্টির অনুসরকরাই সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। তাদের জন্য চাকরী, তাদের জন্য সব রকম সুযোগ সুবিধা (ব্যবসায়ের পার্মিটের অবশ্য উল্লেখ নেই সেটা বর্তমানে যোগ করা যেতে পারে)। কোর্টে যদি কোন কেস হয়, তবে প্রতিপক্ষ ফ্যাসিস্ট হলে তার জয় সুনিশ্চিত। ইটালিয়ানরা বলে, 'ফ্যাসিস্টরা খায় আর আমরা ক্ষুধায় মরি।' ট্যাক্সের ভারে জনসাধারণ নিমজ্জিত, মাইনে কমছে কিন্তু দাম বাড়ছে, আর তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯২৫ থেকে ১৯১৮ এর মধ্যে মিলিটারীর খরচ চল্লিশ পার্সেন্ট বেড়ে গেছে। পুলিশের খরচ ফ্রান্সের দ্বিগুণ হয়েছে। লিরার মূল্যের বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। (বর্তমানের ভারতের অর্থনীতির সঙ্গে তুলনীয়) এ ধরনের পরিস্থিতিতে সরকারের সহযোগিতা করা সর্ব দিকে লাভজনক এবং সরকারবিরোধী পক্ষের প্রতি নিবিচারে দোষারোপ করার প্রবৃত্তি জন্মান স্বাভাবিক। ফলে বিরোধীপক্ষেও ঘৃণা ও প্রতিশোধ স্পৃহা বেড়ে ওঠে। অন্যদিকে গুপ্তচরবৃত্তি ও তার ফলে ঘুষের রেওয়াজ চালু হওয়ায় নিরাপত্তাবোধ, আস্থা ও সুবিচারের আশা একেবারেই চলে যায়।"

ঐ সংখ্যার মডার্ণ রিভিউতে বি. পি. এল. বেদি নামে আর একজন লেখকও নাৎসিদের সম্বন্ধে লিখছেন—

"নাৎসী শক্তি পরিষ্কার তিনটি দিক থেকে জোর পাচ্ছে—যুবশক্তি বুর্জোয়া ও প্রোলেটেরিয়েট। কি করে এই পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব ও বিরুদ্ধ স্বার্থের মানুষদের ন্যাশানালিষ্ট সোসালিজিমের গাড়ীতে জোতা হলো? এর ব্যাখ্যা শুধু এই যে, এ মুভমেন্ট একটা অন্ধ উত্তেজনা ও ভাবাবেগে পুষ্ট, আর বুর্জোয়াদের কাছে সোস্যালিজিমের দিক আর শ্রমিকদের কাছে সোস্যালিজিমের দিকের উপর জোর দেওয়ার কৌশল নাৎসী ন্যাশানাল সোস্যালিষ্টদের জানা আছে।"

সমস্ত নাৎসীভাবটিই বিদ্বেষের ভিত্তির উপর তৈরী। দেশের মধ্যে যে কোনো সময় অন্ধ বিদ্বেষ ও উদ্দীপনা জাগাবার চেষ্টায় যখন রাজনৈতিক ব্যক্তিরা কল্পিত বা তৈরী করা শত্রুর দিকে লেলিয়ে দেন জনগণক

তখন আজও যে অবস্থা আমরা মাঝে মাঝে দেখি নাৎসী ব্যাপারেও তাই ছিল। শ্রীবেদী লিখছেন—হ্যানোভারে একটি শিক্ষক আমায় কথায় কথায় বললেন যে, ছুটির ঘণ্টা পড়লে ছেলেরা রাস্তায় দুদলে বিভক্ত হয়ে মারামারি করে, একদল নাজি সাজে আর একদল কমিউনিস্ট! (এই উপমহাদেশের দুই রাজ্যে শুনেছি শিশুরা হিন্দু মুসলমান সেজে দাঙ্গা করার খেলা করেছে)। নাৎসী শক্তি কোথা থেকে এত জোর পেল সেই প্রসঙ্গে শ্রীবেদী আরো বলেছেন—নাজিদের প্রথম হাতিয়ার হলো বৈরীভাব—মার্কস বিরোধী, ইহুদী বিরোধী, ফরাসী বিরোধী উদ্দীপনা। বুর্জোয়া মালিকরা হিটলারের মধ্যে তাদের সেই রক্ষককে দেখেছে বলশেভিকদের কাছ থেকে যে তাদের ত্রাণ করবে। দেখেছে যে, সে বিদ্রোহ দমনের ক্ষমতা রাখে। মধ্যবিত্তরা দেখছে বিদেশী শক্তির কাছে অপমানের দীনতা সে দূর করবে, জাতীয়তার জাগরণ ঘটাবে। চাষীরা তাকে চাষের উন্নতির জন্য মান্য করে আর বুদ্ধিজীবীরা মনে করে হিটলার দুর্নীতি দূর করবার শক্তি ধরে, এদিকে বিভ্রান্ত জনগণ তাকে নির্যাতিত জার্মানীর মুক্তিদাতারূপে মানে—"

উপরোক্ত মনোভাবগুলি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে—এগুলির অনিষ্টকর পরিণতি সম্বন্ধে ভারতে আজও আমরা সম্পূর্ণ অবহিত নই। অন্ধ জাতীয়তা, মিথ্যা সম্মান-মোহ, কমিউনিস্ট ভীতি ও পরজাতি ঘৃণা এখনও বিষাক্ত পরিস্থিতি ঘটিয়ে তুলতে সমর্থ। দুর্নীতির দিকে চেয়ে আজও এদেশে কাউকে কাউকে আমরা বলতে শুনি "আমাদের একজন ডিক্টেটর না হলে হবে না।" অথচ ফ্যাসি শক্তির বীভৎসরূপ আমাদের অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়।

শোনা যায় জার্মানিতে নাজিরা তাদের পার্টির প্রচারের জন্য অর্থ—হেনরি ফোর্ডের কাছ থেকে পেয়েছিল—তিনি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে জার্মানীতে এই শক্তি জাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁরই ইন্ধনের আগুনে একদিন সারা পৃথিবীতে দাবানল জ্বলেছিল। আজ হেনরি ফোর্ড নেই, কিন্তু তাঁর বংশধরেরা আছেন এবং পশ্চিম জার্মানীতে নাজিদের প্রভূত সাহায্য করছেন তাঁরাই এবং সেই একই পুরণো কারণে। অর্থাৎ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এই লোভী বণিকদের কোনো শিক্ষাই দেয়নি।

পশ্চিম জার্মানীতে ইহুদী নিধন যজ্ঞের হোতা অনেক নাজীই আজো উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত আছে—এমন কি ফাইন্যাল সলিউসন অভ দি জুইশ কোশ্চেন—অর্থাৎ ইহুদী সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা নির্দ্ধারণ হয়েছিল যে গোপন সভায় সেই সভায় ডাঃ কিনগার নামে এক উৎসাহী গেষ্টাপো উপস্থিত ছিলেন আজও তিনি এক বিচারকের পদ অলংকৃত করে বেঁচে আছেন।

একটি বিচারকের কাহিনী কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল। এঁর নাম ডাঃ গানসার, ইনি পশ্চিম জার্মানীতে আজও মাননীয় একজন বিচারপতি।

যুদ্ধবন্দীদের প্রতি নাৎসী অত্যাচারের অজস্র কাহিনী ও কনসেনট্রেসন ক্যাম্পের বর্ণনা শুনে শুনে ও ছবি দেখে দেখে অভ্যস্ত হওয়ায় বোধহয় আজ আর মানুষকে এসব তেমনভাবে স্পর্শ করে না। এই বীভৎস লীলার নায়করা যেন সবই একরকম নামহীন পরিচয়হীন একটা পৈশাচিকতার প্রতীক। বর্তমান গল্পটির সেদিক দিয়ে বিশেষত্ব এই যে ঘটনাটি একটি ব্যাক্তিবিশেষের ক্রূরতার নিদর্শন। ইউক্রেনিয়ার লাভোৎ শহরের উত্তরপূর্ব দিকে একটি ছোট শহরের নাম রুডি। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে এই শহরের উপর দিয়ে দ্রুত ধাবমান বিজয়ী ফ্যাসিস্ট সৈন্য এগিয়ে চলেছিল—আর তাদের পিছন পিছন চলেছিল সাস্ট্রাপপন অর্থাৎ Killing Squad (জল্লাদের দল)। দ্রুতগামী সৈন্যদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের এগোতে হচ্ছিল বলে অসাবধানে অনেক ইহুদীও রক্ষা পেয়ে যাচ্ছিল। প্রথম ধাক্কায় যারা রক্ষা পেয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল হিস মামুদ, তার স্ত্রী ও তিনমাসের একটি শিশুপুত্র। ইহুদিদের জন্য নির্দিষ্ট 'ডেভিডের হলদে তারকা' চিহ্ন ধারণ করে আধপেটা র‍্যাসান খেয়ে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছিল তারা। শিশুটির যখন ১৮ মাস বয়স হয়েছে এমন সময় ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে খবর এল যে সমস্ত ইহুদীকে ইহুদীদের পাড়ায় অর্থাৎ 'ঘেট্টো'তে যেতে হবে। অন্যান্য সব ঘেট্টোতে ইহুদীদের কী হচ্ছে সে খবর ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এইভাবে একত্র করার অর্থই হচ্ছে নিকাশ করার আগের অবস্থা। নিজেদের যা হয় হোক ছেলেটার প্রাণ রক্ষা হোক এই ভেবে মামুদ দম্পতি আন্না-জুয়ারুস নামে একটি ইউক্রেনীয় কুমারীর হাতে ছেলেটিকে সমর্পণ করে ঘেট্টোয় চলে গেল। সহৃদয়া আন্না বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ছেলেটিকে পালন করতে লাগল। এরপর মামুদ ও তার স্ত্রীর কি হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনো খবর নাজি রেকর্ডে পাওয়া যায় না। কয়েক মাসের মধ্যেই ওদিককার সমস্ত ঘেট্টোই পরিষ্কার হয়েছিল কাজেই তাদের কি হয়েছিল অনুমান করা দুষ্কর নয়

ছেলেটি আরো কয়েক মাস বেঁচে ছিল। কঠিন জার্মান পাহারার মধ্যেও বেচারী আন্না পরম যত্নে শিশুটিকে প্রতিপালন করছিল। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে কি করে বেরিয়ে পড়ল যে একটি ইহুদী বালক ঘেট্টোর বাইরে আছে। খোঁজ করা হলো, আন্না ধরা পড়ল, বন্দী হলো। শিশুটি চিরদিনের মত অদৃশ্য হয়ে গেল। ১৯৪৩ সালের ২০শে জুলাই লাভোতে একটি স্পেশাল কোর্টে আন্নার বিচার হলো। সাধারণত পোলিশ, ইউক্রেনিয়ান প্রভৃতি 'নীচু জাতের' মানুষদের সামান্য অপরাধেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। চুরী বা 'উঁচু জাতের' জার্মানদের মুখে মুখে উত্তর ইত্যাদির জন্যও মৃত্যুদণ্ড হতো। সে স্থলে ইহুদীকে আশ্রয় দেওয়া তো ভয়ানক অপরাধ, তা হোক না কেন সে কয়েক মাসের শিশু।

যে সব বিচারকরা এই মৃত্যুদণ্ডাদেশ নির্বিচারে দিয়ে যেত মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে দু-একজনের কথা জানা যায় যাদের মনে কখনো কখনো বিবেকের সাড়া জেগে উঠত। এদের সংখ্যা নগণ্য—তবু এই রকমই একজন সেদিন লাভোভের কোর্টে বিচারপতির আসনে ছিলেন—নাজিদের নথিপত্রে তাঁর নাম পাওয়া যায়নি। তবে তিনি এক অভূতপূর্ব কর্ম করলেন—তিনি আন্নাকে মুক্তি দিলেন। তাঁর এমন সাধ্য ছিল না যে নাজিদের তৈরী বর্বর আইনের তিনি বিরোধিতা করেন, তিনি শুধু আইনের ফাঁক খুঁজে পেলেন। ১৯৪১ সালের ১৫ই অক্টোবর নাজিদের প্রচারিত একটি ঘোষণায় বলা হয়েছিল "যে ইহুদী বিনা অনুমতিতে

ইহুদী এলাকা থেকে চলে যাবে, তাকে যে স্থান দেবে বা লুকিয়ে রাখবে সেই আশ্রয়দাতারও মৃত্যুদণ্ড হবে।" বিচারক এই আইনের বাক্যার্থ গ্রহণ করে আন্নার দোষ খণ্ডন করলেন তিনি বললেন—

প্রথমত আন্না জুয়ারুস্ ছেলেটিকে লুকিয়ে রাখেনি। প্রকাশ্যভাবেই নিজের বাড়িতে রেখেছিল। দ্বিতীয়ত ঐ শিশুটি ইহুদী এলাকা 'ছেড়ে আসেনি' কারণ সে কখনো ইহুদী এলাকায় যায়ইনি। তৃতীয়ত অনুমতি নেবার প্রশ্ন ওঠে না কারণ কয়েক মাসের শিশু অনুমতি নিতে পারে না।

আন্না ছাড়া পেল। কিন্তু এই বিচারের কাগজপত্র ক্রাকোভ নামক স্থানে নাজি কর্তৃপক্ষের জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্টের হাতে পৌঁছল। সেখানে তখন যোসেফ গানসার ছিলেন, এর পূর্বে যিনি নাজি বিচার বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মচারী হিসাবে বার্লিনে কাজ করতেন এবং সে সময়ে তাঁকে উচ্চতর পদে উন্নীত করবার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। গানসার ঐ ফাইল দেখে অগ্নিমূর্তি হলেন! ১৯৪৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তিনি একটি প্রচণ্ড আইনের তর্ক তুলে পূর্বের সহৃদয় বিচারকের যুক্তি নাকচ করে দিয়ে দণ্ড বহাল রাখলেন। তাঁরই নির্দেশে আন্নাকে আবার বন্দী করা হলো। তাকে ক্রাকোভে আনা হলো। দণ্ডাদেশ সঙ্গে সঙ্গে পালন করা হলো।

ইহুদী শিশুটি ও তার ধাত্রী আন্না ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছে কিন্তু ডাঃ যোসেফ গানসার আজও বাহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। তাঁর এখন বয়স ৬১ বছর। তিনি পশ্চিমজার্মানীর মিউনিখে জার্মান পেটেন্ট কোর্টের প্রধান বিচারপতি।

নাৎসী রাজত্বের নারকীয় বহু সহস্র কাহিনীর মধ্যে এই একটি কাহিনীতে আমরা নাৎসী মনোভাব তখন ও এখন কি রকম ছিল ও কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তার পূর্ণ ছবিটি পাচ্ছি। এবং আশ্চর্য এই যে এই মনোভাবকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করছে সেই ডলার যা একদিন নাৎসি রাজশক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়েছিল। তারচেয়েও আশ্চর্য কথা এই যে ইহুদীরাও যেন নাৎসী মতবাদের ভীষণতা বুঝতে পারেনি। তাদের রাগ কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর পড়েছে; যেমন,

আইখম্যানের উপর তারা সে ক্রোধ প্রকাশ করেছে। কিন্তু এই মানুষগুলি যে একটা একটা সর্বনাশা মতবাদের ক্রীড়ণক মাত্র তা তারা বুঝেছে কিনা সন্দেহ। তাহলে ইসরাইলে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে এত হার্দ্যভাব দেখা যেত না। ইহুদী মনস্তত্ত্ব আমরা জানি না। কিন্তু ভারতীয় মনস্তত্ত্ব আমাদের বুঝতে চেষ্টা করতেই হবে। ভারতীয় ব্যবসাদার সংবাদপত্রগুলো তো ফ্যাসিস্ট নীতি বা দুর্নীতির বাহন হতে রাজি বলেই মনে হয়। পুলিশি রাজত্ব, বিনা বিচারের রাজত্ব, যুদ্ধ স্পৃহা, জাতি বৈরীতা, আত্মম্ভরী দর্প ও নিরন্তর বিদ্বেষের উস্কানী এর যে কোনোটাই সম্ভবপর কোনো ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে সে কথা আমাদের মনে পড়ায় কি ? নাকি আমরাও কমিউনিজম ও পাকিস্তানের আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে ফ্যাসিজম্‌কে ডেকে আনতে চাই ? একথা মানতে হয় যে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহু ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও কমিউনিজমের মতবাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ মানুষের আশার বাণী আছে—কিন্তু ফ্যাসিজমে আছে শুধু মৃত্যুর পরোয়ানা।

জীবনের বাণী

গান্ধিজী বলেছেন তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। তাঁকে জানতে হলে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার কারণ তিনি কর্মময় পুরুষ। বহুবিধ তত্ত্ব কথার অবতারণা না করে তাই তাঁর কর্মের সঙ্গে পরিচয় হওয়াই তাঁকে জানবার উপায়। বর্তমানে অল্পবয়সী মানুষরা গান্ধিজীর জীবন ও কর্মের সঙ্গে পরিচিত নয়। কতগুলি উড়ো গুজব দেশের আবহাওয়ায় ভেসে বেড়ায় তার থেকে এলোমেলো ইচ্ছে মতো জোড়া তালি দেওয়া খবর সংগ্রহ করে মতামত দেওয়া ইতরজনের চির-কালের অভ্যাস। গান্ধিজীর সম্বন্ধেও এর অন্যথা হয়নি। যেমন, তিনি চরকা কাটতে বলতেন যা এ যুগে অচল। অহিংসার কথা বলতেন তাও যুগোবিরোধী। দ্বন্দ্ব যার অপর নাম কলহ এবং যার পরিণাম খুনোখুনি সেই মহৎ পরিণামই এ যুগের মানুষের লক্ষ্য, কারণ বন্দুকের নল ছাড়া নাকি জনকল্যাণ ঘটবে না। গান্ধিজী সে ক্ষেত্রে অহিংস উপায়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টিত ছিলেন বটে কিন্তু সেই চেষ্টার কোনো ফল ফলেনি। ফললেও খুব সামান্য। সে ফল কারু কারু মতে গ্রহণীয় নয়, কারু কারু মতে কুফল। স্বাধীনতা একলা গান্ধিজী আনেননি অর্থাৎ তাঁর নির্দেশিত পথে তাঁর চালিত সৈনিকেরা আনতে পারেনি। এনেছে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদীদের ইতস্তত বিক্ষিত গোলাগুলি, বর্মায় আই.এন.এ-র যুদ্ধ, নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদি। অর্থাৎ যেখানে যে ছিটেফোঁটা রক্তপাত হয়েছে সেইগুলিই সংগ্রাম এবং বিপ্লব, সত্যাগ্রহ নয় এই আজ অনেকের মত।

তাছাড়া বাংলাদেশে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে গান্ধিজী ছিলেন বাঙালী বিদ্বেষী। তিনি সুভাষ বোসকে পছন্দ করতেন না, তাছাড়া তিনি মুসলমানদের বাড়িয়ে তুলেছিলেন, এমন কি হরিজনদেরও। এতগুলি অভিযোগে অভিযুক্ত করেও তাঁকে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারছি না। আমরা দিলেও পৃথিবীর নানা দেশে নানা ভাবে

তাঁর চিন্তার স্বীকৃতি আসছে। বস্তুত গান্ধিজী নূতন কিছুই বলেননি। তিনি শাশ্বত কতগুলি মানবসত্য কর্মে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যগুলি তাঁর পূর্বে আরও অনেক মনস্বী ব্যক্তি বলেছেন। কিছু কিছু কর্মেও প্রতিফলিত করেছেন। কিন্তু গান্ধিজীই বোধহয় আধুনিক জগতে একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে অহিংস সংগ্রামের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এবং সেই চেষ্টাতে তাঁর প্রতিপক্ষকেও প্রভাবিত করেছিলেন। আধুনিক যুগে বহু যুদ্ধ, যুদ্ধের পরে শান্তি চুক্তির বর্ণনা পড়া গেছে কিন্তু ভারতে বিপুল সাম্রাজ্য ত্যাগ করে ইংরেজ যখন চলে যায় তখনকার পরিস্থিতি ও আবহাওয়া জগতের অন্য কোথাও কখনও সৃষ্ট হয়েছিল কিনা জানি না। সম্প্রতি একটি সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী মহাশয় লাল কেল্লার ভিতরে পতাকা বদলের দৃশ্যটি বর্ণনা করেছিলেন—রাত্রি বারোটার সময় ১৫-ই আগষ্ট সুরু হবে। সেই সময় দিল্লীর লালকেল্লার উপরে উড্ডীয়মান ইউনিয়ন-জ্যাক নামিয়ে আনা হলো। বিপুল বৃটিশ সাম্রাজ্যের দোর্দণ্ডপ্রতাপের প্রতীকরূপে যে পতাকা সারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তখনও উড়ছে, যে পতাকাকে নামিয়ে আনার জন্য ভারতের স্বাধীনতাকামী অগণিত মানুষ লাঞ্ছনা, কারাবরণ ও মৃত্যুদণ্ড পেয়েছে, সেই পতাকা মধ্যরাত্রে নামিয়ে আনা হবে। বিনা রক্তপাতে আলোচনার মাধ্যমে চুক্তিপত্র সই হয়ে গেছে। ইংরেজরা চলে যাবে। রাত্রি বারোটার সময় লালকেল্লায় দুই পক্ষের নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়েছেন। একধারে মাউন্টব্যাটেন আর উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীবৃন্দ, অন্যদিকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ নেহেরুকে অগ্রণী করে অপেক্ষা করছে। ঘড়িতে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন তাঁর পার্শ্বস্থ কোনো সৈনিককে আদেশ করলেন পতাকা নামিয়ে নিয়ে আসতে, সৈনিক দৃঢ় পদে এগিয়ে গেলো, উড্ডীয়মান ইউনিয়ন-জ্যাক তার সম্মান গৌরব ও আনন্দের বস্তুকে স্যালুট করলো, তারপর ধীরে ধীরে পতাকাটি নামিয়ে নিয়ে সযত্নে ভাঁজ করে চুম্বন করে বক্ষে ধারণ করে নিজ দলের মধ্যে ফিরে এলো।

এরপর ভারতীয় জনগণের পক্ষে জওহরলাল নেহেরু ভারতের জাতীয় পতাকাটি উড়িয়ে দিলেন। একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্যে বিরাট একটি ঐতিহাসিক ঘটনা শান্তভাবে, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ভদ্রভাবে ঘটতে পেরেছিল তা গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথের জন্যই।

করণীয় কাজ অপ্রিয় হলেও তা ভদ্রভাবে করাতে যে মনুষ্যত্বের প্রকাশ সে কথা গান্ধিজীর কর্মক্ষেত্রে এ যুগে গান্ধিজী দেখাতে পেরেছিলেন। বর্তমানকালে রাজনৈতিক মতবিরোধ মানুষকে যে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে চলেছে তাতে কোনো নীতিরই সার্থকতা থাকবে না। দেশের স্বাধীনতা মানুষের জন্যই। সেই মানুষই যদি নষ্ট-ভ্রষ্ট-হিংস্র হয়ে ওঠে তাহলে স্বাধীনতা নিষ্ফল হয়ে যাবে এই কথার তাৎপর্য আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে আমরা গান্ধিজীর জীবন থেকে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি—এই ঘটনাগুলি অধিকাংশ পিয়ারীলালের গান্ধিজীবনী, মীরা বেনের আত্মকথা, হরিজন পত্রিকা প্রভৃতি পুস্তক ও পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

হিটলারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য মিত্রশক্তি যেদিন নর্মাণ্ডির উপকূলে উপস্থিত, যার এগার মাস পরে জার্মানির পরাজয় সম্পূর্ণ হলো তার ঠিক এক মাস পূর্বে ৫ই মে ১৯৪৪ সালে বম্বের ইনস্পেক্টার জেনারেল অব প্রিজনস্ কর্ণেল ভাণ্ডারী সন্ধ্যাবেলা অর্থাৎ নিতান্ত অসময়ে পুনার আগা খাঁর প্রাসাদের বন্দী শিবিরে যেখানে গান্ধিজী কঠিন পাহারায় বন্দী ছিলেন সেখানে এলেন এবং বললেন যে পরের দিন বিনাশর্তে তিনি তাঁর দলবল সহ মুক্তি লাভ করবেন।

বিস্মিত গান্ধিজী প্রশ্ন করলেন "ঠাট্টা নাকি?"

ইনস্পেক্টার জেনারেল উত্তর করলেন—"না, খাঁটি সত্য, আপনি যতদিন না সুস্থ হন ততদিন এখানে থেকে বিশ্রাম করতে পারেন কিন্তু কাল সকাল ঠিক ৮টায় গার্ডরা চলে যাবে। তারপর দেখুন, আর ফিরে আসবেন না। চিন্তায় ভাবনায় আমার চুলগুলি সব পেকে গেছে।

এতক্ষণে প্রথম ধাক্কা কেটে গেছে। গান্ধিজী হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু আমি যদি পুণায় কয়েকদিন থেকে যাই তবে আমার

রেল ভাড়ার কি হবে ?”

আপনি যখনই পুনা ছাড়বেন রেলভাড়া পাবেন। ৮ই আগষ্ট ১৯৪২ সালে বৃটিশ গর্ভনমেণ্টের বিরুদ্ধে ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনের জন্য বন্দী হওয়ার কুড়ি মাস পরে গান্ধিজীর জেল জীবন শেষ হলো। এই তাঁর শেষ বন্দীত্ব।…

গান্ধিজী বার বার সরকারকে অনুরোধ করেছেন যেন তাঁকে আগা খাঁর প্রাসাদ থেকে কোনো একটি সাধারণ জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বৃহৎ বাড়ীটির প্রহরায় রয়েছে যে সশস্ত্র বাহিনী তার ব্যয় সরকারকে বহন করতে হচ্ছে তাঁরই জন্য, এ চিন্তা গান্ধিজীর অসহ্য হতো। “এ টাকা তো আমারই” তিনি বলতেন, কারণ এ টাকা ভারতের অগণ্য গরীব জনসাধারণের আর তাছাড়া—আমার জন্য পাহারা রাখবার দরকার কি ? ওরা তো জানে যে আমি পালিয়ে যাব না। প্রাসাদে সারারাত ধরে যখন গোছগাছ চলছিল গান্ধিজী তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বিনিদ্র বসে রইলেন। এরা কি তাঁকে তাঁর অসুস্থতার জন্য ছেড়ে দিচ্ছে ? সত্যাগ্রহীর পক্ষে জেলে এসে অসুস্থ হয়ে পড়া তাঁর কাছে অপরাধ।

সত্যাগ্রহী অহিংস আন্দোলনের দৃষ্টান্ত

৯ই আগষ্ট ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রথম বর্ষপূর্ত্তি দিনটি কিভাবে পালিত হবে ? মারপিট কোনো রকমেই করতে দেওয়া হবে না। বাছা বাছা কয়েকটি লোক নিয়ে নিজেদের ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। বম্বের পঁচিশজন নাগরিক পুলিশ কমিশনারকে জানাল যে, পাঁচ মিনিটের জন্য তারা চৌপাটিতে লোকমান্য তিলককের মূর্ত্তির সামনে গিয়ে নীরবে প্রার্থনা জানাবে তার জন্য অনুমতি চাই। (এর সঙ্গে লিংকনের স্ট্যাচুর কাছে মার্টিন লুথার কিং যে বিরাট পদযাত্রা পরিচালনা করেছিলেন তা তুলনীয়) যাত্রার পূর্বাহ্নে গান্ধিজী বিজ্ঞপ্তি দিলেন যদি কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের এই সামান্য প্রতীকী অধিকারে বিঘ্ন ঘটায় তবে অপরাধ তাদেরই হবে। অনুমতি প্রত্যাখ্যাত হল…৯ই আগষ্ট

সাড়ে পাঁচটার সময় পঁচিশ জন সত্যাগ্রহী পতাকা নিয়ে গান করতে করতে তিলকের স্ট্যাচুর কাছে গ্রেফতার হলেন। এই প্রতীক সারা ভারতবর্ষ দেখল এবং মাত্র ২৫ জন কারাবরণ করলেও সহস্র লোকের মানসিক সংযোগ ঘটল। পরের ২৬শে জানুয়ারী সেবাগ্রামে বিভিন্ন কর্মী শিবির থেকে বেরিয়ে গ্রাম পরিষ্কার দিবস পালন করবেন স্থির করলেন। তাঁরা ঝুড়ি, বালতী, ঝাড়ু ইত্যাদি নিয়ে সৈনিকের মত শ্রেণী-বদ্ধ হয়ে অগ্রসর হলেন। পুলিশ বাধা দিল, বলল, শ্রেণীবদ্ধভাবে মিছিল যেতে দেওয়া হবে না। সত্যাগ্রহীরা এই অন্যায় আদেশের কাছে মাথা নত করতে পারেন না, আবার কায়িক বল প্রয়োগও তাদের নীতি নয়। অতএব তারা বসে পড়লেন। অবশেষে পুলিশকে হার মানতে হয়েছিল। গান্ধিজী উপাসনা সভায় বললেন যে, যদি সত্যাগ্রহীরা মাথা গরম করত ও মারামারি করত তাহলে পুলিশ বন্দুক ছুঁড়ত। তিলকের মন্ত্র স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার অহিংস উপায়েই সাধিত হবে।

কয়েকটি ঘটনা

"আমি কোনো সত্যাগ্রহীর কাছ থেকে এরকম কথা আশা করি না যে ইংরেজ মাত্রই খারাপ। ইংরেজ হলেই সে খারাপ হবে এ কখনও হতে পারে না। যেমন অন্য সব জাতের মধ্যে, তেমনই ইংরেজের মধ্যে ভাল মন্দ দুই-ই আছে। ইংরেজের যদি সদ্‌গুণ না থাকত তবে তারা আজ যে অবস্থায় উন্নীত হয়েছে তা হতে পারত না। আমাদেরও অনেক দোষ আছে। অনেক লোকে বলে যে যাদের কোনো নৈতিক বোধ নেই তাদের সঙ্গে সত্যাগ্রহের যুদ্ধ চলে না। আমি তাদের সঙ্গে তর্ক করতে চাই না।

আমাদের যদি ধৈর্য থাকে তবে পাষাণ হৃদয়ও গলবে। সত্যাগ্রহী জীবন ত্যাগ করে তবু কর্ত্তব্যচ্যুত হয় না, এরই অর্থ হচ্ছে—do or die—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। ৩৪ মাস বন্দীদশার পর কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্যরা সবাই মুক্তি পেয়েছেন। তাঁরা সিমলা চলেছেন ভাইসরয়ের আহ্বানে কনফারেন্সে যোগ দিতে। কাল যারা বন্দী ছিল আজ সেই

জয়ী বীরদের জন্য স্পেশাল ট্রেন, এরোপ্লেন, মিলিটারী গাড়ী প্রভৃতি রাজকীয় ব্যবস্থা হয়েছে। এর সঙ্গে তুলনীয় পরাজিত জার্মানির অবস্থা হিংস্র সংগ্রামের পরিণতি হিসাবে শান্তির পূর্বে বা শান্তির সূচনায় সে কি বীভৎসতা!

নেতাদের জন্য শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ীর ব্যবস্থা ছিল। গান্ধিজী তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি তৃতীয়শ্রেণীতে যাবেন।

এই দলের সঙ্গে একজন আমেরিকান জার্নালিষ্ট ভ্রমণ করছিলেন। ম্যালেরিয়ায় ভুগে রোগজীর্ণ, গান্ধিজীর শরীরের অবস্থা দেখে সেই আমেরিকান জার্নালিষ্ট মিঃ প্রেষ্টন গ্রুভার তাঁকে একটি ছোট্ট চিঠি লিখে পাঠালেন—"দ্বিপ্রহরে প্রখর রৌদ্রের সময় আপনার পক্ষে কংগ্রেসের জন্য নির্দিষ্ট ঠাণ্ডা ট্রেনের কামরায় যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত নয় কি—একটু যাতে ঘুমিয়ে নিতে পারেন। গত ২৪ ঘণ্টা আপনি একদম ঘুমাতে পারেননি। রাস্তার প্রত্যেক স্টেশনে প্রচুর লোক জড়ো হওয়ায় আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটছে। সিমলাতে একেবারে বিধ্বস্ত ক্লান্ত অবস্থার পৌঁছে কি লাভ? আমরা আমেরিকায় বলে থাকি নিজেকে একটু থামান। (Give yourself a break)"

উত্তরে মহাত্মাজী তাকে লিখলেন "আমার স্বাস্থ্যের জন্য আপনার উদ্বেগপূর্ণ চিঠির জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমাকে প্রকৃতির এই স্বাভাবিক গ্রীষ্মে গলে যেতে দিন। ভাগ্যের মতনই নিশ্চিতভাবে এই উত্তাপকে অনুসরণ করবে স্নিগ্ধ শীতলতা। আমি তা উপভোগ করব। এখন আমাকে সত্যকার ভারতভূমির পরিচয় নিতে দিন।"

বিবাহ সম্বন্ধে

হরিজন সেবক সংঘ—১৯৩২ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুসমাজ থেকে অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক একেবারে মুছে ফেলা। গান্ধিজী এই সংঘের একটি মিটিংয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"হরিজন সেবক সংঘের সেবকরা কি তাদের মন থেকে অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ দূর করতে পেরেছে? তাদের মুখের বাক্যের সঙ্গে কি কর্মের মিল

হয়েছে ?"

এর উত্তরে একটি সদস্য জিজ্ঞাসা করেন—"বাক্য ও কর্মের সংহতি সাধন সম্বন্ধে বিচারের মাপকাঠি আপনার কি ?"

গান্ধিজী, "আপনার বিবাহ হয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে আপনার অবিবাহিত পুত্র বা কন্যা আছে ? তাদের জন্য বর বা বধূ নির্বাচনে হরিজন পাত্র পাত্রী খুঁজুন এবং যেন ধর্ম কার্য করছেন এইভাবে বিবাহ দিন। তাহলে আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাব।"

এর কিছুদিন পরে আশ্রমে এক নাস্তিক ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের কন্যার সঙ্গে তাঁর ছাত্র এক নাস্তিক হরিজনের বিবাহ দিয়েছিলেন, এবং পরে ঘোষণা করেছিলেন—এখন থেকে যে সকল বিবাহ হরিজনের সঙ্গে নিষ্পন্ন হবে সেই গুলিতেই তিনি আশীর্বাদ পাঠাবেন।

১৯২২ সালে খিলাফৎ আন্দোলনের সময় বিবাহ বিষয়ে বা হিন্দু আচার সম্বন্ধে গান্ধিজীর মতামত এতটা উদার ছিল না। তখন তিনি বলেছিলেন—সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য একত্রে আহার বা বিবাহের কোন প্রয়োজন নেই অর্থাৎ যে যার নিজের আচার ও সংস্কার সম্পূর্ণ বজায় রেখেও পরস্পর সম্প্রীতি রক্ষা করতে পারবে। ক্রমে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতের ঐক্যের পক্ষে হিন্দু সমাজের জাতি-ভেদের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাগুলি দূর না হলে সর্বভারতীয় ঐক্য অসম্ভব।

ভবিষ্যতের ছায়া

১৯৪৪ সালে গান্ধিজী ও জিন্নার মধ্যে একটি সাক্ষাৎকারের প্রশ্নে হিন্দু মহাসভার যুবক সভ্যবৃন্দ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তারা বাপুজীকে জিন্নার সাথে সাক্ষাৎ করতে দেবে না। বাপুজীর কুটিরটি ঘিরে তিনটি বহির্নির্গমনের পথই তারা আটক করে রইল। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানালেন যে, গোলমাল হতে পারে এবং পুলিশ তাহলে প্রতিবিধান করতে বাধ্য হবে। বাপুজী বলেছিলেন যে যদি ওরা গাড়ীতে যেতে না দেয়

তবে তাঁরা পায়ে হেঁটেই ওয়ার্ধা স্টেসনে যাবেন। রওনা হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ডি. এস. পি. এলেন এবং বললেন যে, তিনি পিকেটারদের বুঝিয়ে যখন এঁটে উঠতে পারেননি তখন তাদের গ্রেফতার করেছেন। পিকেটার-দের নেতা ধর্মোন্মত্ত, অত্যুৎসাহী ও একরোখা। তাতে বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। সে লোকটিকে তল্লাস করাতে তার কাছ থেকে একখানি বড় ছোরা বেরিয়েছিল। পুলিশ অফিসার হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে, "তোমাকে গ্রেফতার করাতে তো তুমি শহীদ হবার সুযোগ পেলে।" যুবক নেতাটি দৃপ্তভাবে উত্তর করলেন—"না, যখন গান্ধিজীকে হত্যা করা হবে তখনই কেউ শহীদ হবে।"

"আচ্ছা লীডারদের নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করে নিতে ছেড়ে দাও না কেন?" যেমন ধর—"হাসতে হাসতে পুলিশ অফিসারটি বললেন "সাভারকার এসেই তো এই কর্মটি করে যেতে পারেন।" উত্তরে যুবকটি বলল, "গান্ধিজীর পক্ষে সেটা বড় বেশী সম্মানের হবে। ঐ জমাদারই সে কাজের জন্য যথেষ্ট।"

জমাদার বলে সঙ্গের যে লোকটিকে সে নির্দেশ করেছিল তার নাম হচ্ছে—নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে। এর সাড়ে তিন বছর পরেই ঐ ভয়ানক ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়েছিল। (পিয়ারীলাল)

গান্ধিজী ও ঈশ্বর

একজন নাস্তিক হরিজন যুবকের সঙ্গে গান্ধিজীর বিতর্কের উল্লেখ করছি। যুবক বললেন, তিনি মানবতায় বিশ্বাস করেন কিন্তু ঈশ্বরে নয়। গান্ধিজী বললেন,—মানবতার দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন কিন্তু তা ঈশ্বরের বিকল্প হতে পারে না। ঈশ্বর আছেন কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সীমিত···আপনি ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণায় সন্তুষ্ট নন। সহজ কারণেই যারা নিজেদের ঈশ্বর বিশ্বাসী বলে তাদের জীবনের মধ্যে ঈশ্বর মূর্ত্ত হয়ে ওঠেন না। তিনি আরও বললেন যে, তোমার উচ্চাশা পরিপূর্ণ হবে যদি তোমার শক্তি ও ক্ষমতার সঙ্গে ঈশ্বরে জলন্ত বিশ্বাস থাকে। তাহলে জীবনের যা বিস্বাদ তা কেটে যাবে। যদি ঈশ্বরে

বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা না করে তাহলে যখনই কোনো পরাজয় আসবে তখনই তুমি হতাশ হয়ে পড়বে। এই আশ্রমে যে সব মানুষ আছেন তারা ছাড়াও এখানে যে শক্তি ও আদর্শ রূপ নিচ্ছে তা হয়তো তোমাকে এটুকু বিশ্বাস দেবে যে, তুমি বলতে পারবে ঈশ্বর আছে, ঠিক যেমন তুমি বলতে পারো, সত্য আছে। যুবকটি উত্তর করলেন, "আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে 'সত্য' মিথ্যার প্রতিবাদরূপে আছে"।

গান্ধিজী বললেন—"এই যথেষ্ট। দ্রষ্টারা ঈশ্বরকে বর্ণনা করেছেন এই নয় এই নয় বলে। সত্য তোমাকে এড়িয়ে যাবে, যা কিছু সত্য আছে তার সবের একত্রিত ফল রূপেই সত্যের মূর্ত্তি···তোমার মন বিশ্লেষণাত্মক কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে যার বিশ্লেষণ হয় না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে যে ঈশ্বরকে আমি বিশ্লেষণ করতে পারব সে ঈশ্বরে আমার মন ভরবে তাই আমি আপেক্ষিক জিনিসের পেছনে পরমের সন্ধান চাই, যার আর কোনো তুলনা নেই তাতে আমার মনের শান্তি আসে।"

রোমাঁ রোলাঁর একটি পত্র

গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরবার পথে গান্ধিজী ফ্রানসে রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময়কার অভিজ্ঞতার বর্ণনা রোমাঁ রোলাঁ একটি পত্রে এইরূপ লিখেছিলেন ··

অল্প আগেই (গান্ধী আসার) আমি বেশীরকম বুকে সর্দি বসানোর কর্মটি করেছিলাম, অতএব আমার বাড়ীর তৃতীয় তলায় ভিলা অলনাতে যেখানে আমি ঘুমাই সেইখানে প্রতি প্রভাতে গান্ধিজী আমার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার জন্য আসতেন···

সন্ধ্যা সাতটার সময় দোতলার বসবার ঘরে প্রার্থনা হতো। আলো কমানো থাকত। ভারতীয়টি কার্পেটের উপরে মাটিতে বসতেন। কয়েকটি বিশ্বাসী লোকের ছোট একটি দল তাঁকে ঘিরে থাকত। তিনটি মন্ত্রগুচ্ছ উচ্চারিত হতো—একটি গীতার শ্লোক, দ্বিতীয়টি সংস্কৃত শাস্ত্র থেকে গৃহীত একটি শ্লোক, গান্ধিজী যার অনুবাদ করেছিলেন, তৃতীয়টি রাম সীতার অবলম্বনে একটি ধর্মসঙ্গীত। মীরার গভীর আবেগপূর্ণ

ভজন গীত হতো।

রাত্রি তিনটার সময় গান্ধিজীর আরেকটি প্রার্থনার সময়। যে জন্য লণ্ডনে থাকাকালে তিনি তার পরিশ্রান্ত অনুচরদের জাগিয়ে দিতেন —যদিও তিনি নিজে রাত্রি একটার আগে শুতে যাননি। এই দুর্বল আকৃতির কৃশকায় ব্যক্তিটি ক্লান্তিহীন এবং তাঁর ভাষায় 'পরিশ্রান্ত' কথাটি লেখা নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি জনতার দ্বারা প্রশ্নে প্রশ্নে উৎপীড়িত হয়েও শান্তভাবে, মুখের রেখার একটু পরিবর্তন না ঘটিয়ে উত্তর দিয়ে যেতে পারেন, যেমন দিলেন লুসান ও জেনেভায়। একটি টেবিলের উপর অবিচলিতভাবে বসে শান্ত ও পরিষ্কার স্বরে তিনি তাঁর ছদ্মবেশী ও প্রত্যক্ষ শত্রুদের (জেনেভায় যার অভাব ছিল না) প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সেই উত্তরে এমন রূঢ় সত্য ছিল যা তাদের নিস্তব্ধ করে দিয়েছিল। রোমান বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা, যারা প্রথমে তাঁকে অত্যন্ত ধূর্তভাবে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল, তিনি চলে যাবার পর তারা রাগে কাঁপতে লাগল···তিনি জাতীয়তাবাদী অস্ত্রসজ্জা, ক্যাপিটাল ও লেবার দ্বন্দ্বের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন।

তাঁর মন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে কর্মের মধ্যে এগিয়ে চলে, তিনি কখনো থামেন না। কাজেই দশ বছর আগে তিনি যা বলেছেন তা দিয়ে যদি কেউ তাঁর বিচার করতে যায়—তবে সে ভুল করবে কারণ তাঁর চিন্তার নিত্য বিবর্তন ঘটছে। এর একটি বিশেষ ও পূর্ণ নিদর্শন দেখাচ্ছি।

সত্যই ঈশ্বর

লুসানে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ঈশ্বর বলতে তিনি কি বোঝেন? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রতি যে সমস্ত গুণ আরোপ করা হয়েছে তার মধ্যে মহত্তম গুণের যেটি অল্প বয়সেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন, সেটি হচ্ছে 'সত্য'। কারণ ঐ কথাটিতেই প্রধানভাবে তাঁর সত্ত্বার বর্ণনা রয়েছে। তিনি বললেন, "ঈশ্বরই সত্য কিন্তু দুবছর আগে আমি আর এক পদ অগ্রসর হয়েছি। এখন আমি

বলি সত্যই ঈশ্বর, কারণ নাস্তিকরাও সত্যের শক্তির প্রয়োজনকে অস্বীকার করে না। সত্য আবিষ্কারের আগ্রহের জন্য নাস্তিকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে দ্বিধা করেনি এবং তাদের দিক থেকে তারা ঠিকই করেছে"...

রোমাঁ রোলাঁ লিখছেন—এই কথা থেকেই প্রচ্যের এই ধর্মাত্মার সাহস ও চিন্তার স্বাধীনতা তুমি বুঝতে পারবে।

তবু প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজির উত্তর দিতে তিনি অপ্রস্তুত হননি। তাঁর নিজের রাজনীতি হচ্ছে একটি কথাও গোপন না করে তাঁর মনের কথা সকলের কাছে খুলে বলা...

এই কয়দিনের সব কথাই বলা হলো কেবল বলা হয়নি যে সব আগন্তুক আধপাগলা ভবঘুরে জাতীয় মানুষের আক্রমণ আমাদের দুটি বাড়ীর উপর দিয়ে বয়ে গেল। টেলিফোন কখনও থামেনি।

ফোটোগ্রাফারেরা প্রত্যেক ঝোপের আড়াল থেকে এক সঙ্গে লক্ষ্য ভেদ করে চলেছিল। দুধওয়ালার সঙ্ঘ আমাকে জানিয়েছিল যে "ভারতের রাজা যতদিন আমার সঙ্গে ভ্রমণ করবেন ততদিন তারা তাঁর খাওয়া দাওয়ার ভার নেবে"...

কোনো কোনো ইটালিয়ন মহাত্মাজীকে অনুনয় করে লিখেছিল—আগামী ৭ তারিখ জাতীয় লটারির দশটি লাকি নম্বর জানাতে।

অহিংসা ও পশুহত্যা

আমাদের দেশে যারা সনাতন ধর্মের নির্দেশে জীবহত্যার বিরোধী তাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটা গোঁড়ামি আছে, অর্থাৎ তারা মানবতার কারণে যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটাকে না দেখে, অন্ধ বিশ্বাস বা শাস্ত্র নির্দেশে চলে। গান্ধিজী গোঁড়া জৈনদের মধ্যে বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখানকার সমস্ত আবহাওয়াতে এই সনাতন অহিংসার চর্চা প্রচলিত। এটাও অসম্ভব নয় যে,—এই আবহাওয়াই তাঁকে অহিংসা সম্বন্ধে এত মনোযোগী ও আগ্রহী করেছিল। অনেকে গান্ধিজীকে গোঁড়া হিন্দুও মনে করেন কিন্তু যুদ্ধে প্রতিপক্ষ সামনে গরু নিয়ে

অগ্রসর হলে যে হিন্দু রণে ভঙ্গ দেয়, তিনি সে প্রকারের হিন্দু নন। তিনি যে যুক্তি এবং বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে সনাতন শাস্ত্র থেকে বিশেষ কতগুলি নীতি গ্রহণ করেছিলেন সে কথা মীরা বেনের বর্ণিত দুটি ঘটনা থেকে বোঝা যাবে।

আহমেদাবাদের আশ্রমে গোঁড়া পন্থী অহিংসবাদীর অভাব ছিল না। তারা সকলে গান্ধিজীকে তাদের মত মনে করতেন কিন্তু কার্যকালে অন্যরূপ দেখা গেল। আহমেদাবাদে এক সময় চারিদিক ঘেয়ো কুকুরে ভরে গেল। এক একটা কুকুরের রোঁয়া সম্পূর্ণ উঠে গেছে, তারা এখানে সেখানে, বাজারে, অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াত আর গা চুলকে চুলকে অসম্ভব যন্ত্রণা ভোগ করে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছিল। তাদের সংখ্যাও ক্রমশই বাড়ছিল এবং কিছু কিছু পাগলও হচ্ছিল। এই সব কুকুর নিয়ে একটা বিশেষ সমস্যা দাঁড়াল। মিউনিসিপ্যালিটি এদের গুলি করতে সাহস পায় না কারণ জনতা ক্ষেপে উঠবে। তখন আম্বালাল সারাভাই প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গান্ধিজীর নির্দেশ নিতে এলেন। আশ্রমে প্রবল বিতর্ক হল। গান্ধিজী গুলি করবার মতেই সায় দিলেন। প্রবল ধিক্কার ও প্রতিবাদ উঠল। গান্ধিজী শান্তভাবে সেগুলি বুঝিয়ে দিলেন। সমস্যা মিটল।

তারপরে এল আরও কঠিন পরীক্ষা। আশ্রমে একটি বাছুর অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, সে উঠতেও পারে না, দাঁড়াতেও পারে না। চার পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে থাকতে তার বেড্‌সোর দেখা দিল। সে খায় না, মাছিরা অবিরত তাকে বিরক্ত করে, তার জীবনটা এক দুর্বিষহ যন্ত্রণা। কিন্তু কি করা যাবে? তাই বলে তো গোহত্যা করা যায় না। গান্ধিজী মনে মনে ভাবলেন যে, একে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়াই সত্যকারের অহিংসা। কিন্তু আশ্রমবাসীদের এই কাজের উপযুক্ততা প্রথমে বোঝান চাই। প্রচণ্ড তর্কের ঝড় উঠল। অনেকেই বাপুর যুক্তি মেনে নিলো কিন্তু দু চারজন প্রচণ্ড আপত্তি জানালেন। তখন বাপু বললেন বেশ, তাহলে তোমরা গিয়ে ওর সেবা কর। বেচারারা খড়ের গাদার উপর বসে অবিরত মাছি তাড়াতে লাগলেন ও খাওয়ানোর

চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনো ফল হল না। বাছুরটির যন্ত্রণা কমল না। সে কিছুই খেল না। অবশেষে তাঁরা সাশ্রুনয়নে গান্ধিজীর কাছে এসে তাঁর মতে অনুমতি দিলেন।

গান্ধিজীর নির্দেশে আম্বালাল সারাভাই পারিবারিক চিকিৎসককে নিয়ে এলেন। বাপু গো-শালায় ঢুকলেন, পিছনে গো-পালক ও মীরা বেন। ডাক্তার বিষপূর্ণ ইনজেকস্‌ন নিয়ে প্রস্তুত। বাপু নীচু হয়ে গোবৎসের ডান পাখানা ধরলেন; ডাক্তারের শলাকা বিদ্ধ হলো। একটি কাঁপুনি দিয়ে তার ইহলীলা শেষ হলো। কেউ কোনো কথা বলল না। বাপু একটি কাপড়ের টুকরা দিয়ে গোবৎসের মুখ ঢেকে দিলেন, তারপর নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

নোয়াখালি ভ্রমণ

গান্ধিজীর নোয়াখালি ভ্রমণের সময় তাঁর প্রধান কাজ ছিল সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা, এই চেষ্টার পথে প্রথমেই প্রয়োজন হচ্ছে ভীত ব্যক্তিদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। সাহস ও আত্ম-বিশ্বাস সকল অস্ত্রের চেয়ে বড়।

গান্ধিজী

গান্ধী শতবার্ষিকী বৎসরে গান্ধী সম্বন্ধে প্রচুর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে সাময়িক পত্র পত্রিকার প্রবন্ধগুলিতে নব মূল্যায়নের বিশেষ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। তবে সংখ্যায় এধরনের প্রবন্ধ সামান্যই। এ ছাড়া প্রচুর বইও নানা জনে লিখেছেন, সেগুলির বেশীর ভাগই স্তুতিমূলক, বিশ্লেষণাত্মক নয়।

দেশের মধ্যে স্পষ্টতই দুটি ভাগ দৃশ্যমান, একদল গান্ধীভক্ত রূপে গান্ধীপূজার উপাচার উপকরণের সমাবেশে ব্যস্ত আর একদল গান্ধীর শত্রু রূপে ঐ নামের সকল চিহ্ন লোপ করতে উগ্রমূর্তি ও সশস্ত্র। এই দুই পক্ষেরই একটি সাধারণ ধর্ম আছে, সে হচ্ছে যুক্তি বিচারের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এবং উচ্ছ্বাসপ্রবণ আবেগময়তা। হয় ঈশ্বরোপম উপাধিযুক্ত করে মূর্ত্তি বানিয়ে পূজা করব, নয়ত লাঠি মেরে মূর্ত্তি ভেঙ্গে তার উপযুক্ত প্রতিবিধান করব। বলাবাহুল্য এই দুটি মনোভাবের কোনটিই রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্যোতক নয়। এবং এর দ্বারা গান্ধীকে বাড়ানোও যায় না কমানোও যায় না বা তাঁর কীর্তিকে উজ্জ্বল কিংবা মলিন করা যায় না। কেবলমাত্র এই কর্মগুলির দ্বারা কর্তার চরিত্র প্রকাশ পায়, যে চরিত্র মানবোচিত গুণসম্পন্ন নয়, যে চরিত্র জান্তবভাবে নিয়ন্ত্রিত।

বস্তুত যাঁরা নিজেদের গান্ধীবাদী বলেন এবং যাঁরা তাঁর বিরোধী, তাঁরা প্রত্যেকেই তাদের বক্তব্য উপস্থিত করতে গান্ধিজীর উক্তি ও কার্য-কলাপ উদ্ধৃত করেন। শুধু গান্ধী নয় যে কোন বড় নেতা, লেখক বা ধর্ম প্রচারকের ভাগ্যই এই যে, তাঁদের নিজের উক্তিকেই প্রসঙ্গচ্যুত উদ্ধৃতির দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়।

যাঁরা গান্ধী বিরোধী তাঁরা অবলীলাক্রমে যে সব অভিযোগ করে থাকেন বর্ত্তমানে তা কেবল গালাগালিতে পর্যবশিত হলেও কেউ কেউ যুক্তিতর্কেরও অবতারণা করেন ও ঐতিহাসিক দলিলও উপস্থিত করেন মুখে মুখে। বলাবাহুল্য ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত নিয়ে বিতর্ক সাধারণের মুখে

অর্থহীন বিতণ্ডা মাত্র। ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন, উড়ো গুজবে নির্ভর গালগল্প নয়। বর্ত্তমানের বালখিল্যের দল যাঁরা বই পুড়িয়েই গান্ধী নীতিকে 'খতম' করবেন তাঁরা যে ইতিহাসের পাঠ ঠিকমত নিয়েছেন এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। গান্ধিজী পুঁজিপতির পোষক ছিলেন কিনা, বা উপযুক্ত আধুনিক ভাষায় 'মালিকের দালাল' ছিলেন কিনা, প্রতিক্রিয়াশীল কিনা, প্রাগৈতিহাসিক হিন্দু কিনা, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর দান কত পার্সেন্ট, সুভাষ বোসের বা কত, নৌবিদ্রোহীদেরই বা কত, সে সব অঙ্ক কষা একমাত্র গবেষকের কাজ। সাধারণের পক্ষে তা অবান্তর আলোচনা।

আমরা যাদের সমগ্র গান্ধী রচনা ও কর্মের ইতিহাস করতলগত নয় তারা ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীর দোষগুণের কাহিনী বাদ দিয়ে তাঁর দু একটি মূল নীতিতেই তাঁর যে পরিচয়, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সমগ্র মানব সমাজের কাছে অর্থবহ—সেইটুকুই মাত্র আলোচ্য মনে করি। এইপ্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, যে কোন মানুষ দীর্ঘদিন ধরে একটি কাজে লিপ্ত থাকলে অভিজ্ঞতার সংঘাতে সেই জীবন্ত সচল মানুষের ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে, যাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—'এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম জনমান্তর।' তাই কোন সময়ে উক্ত দু'চারটি উক্তি দিয়ে চলমান পরিবর্ত্তনশীল জীবনকে পূর্ণরূপে চিহ্নিত করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমানে সহযোগী পত্রিকায় স্বনামধন্য বি. টি. রণাদিভে 'যাঁরা লেনিন ও গান্ধীর তুলনা করেন' সেই সমস্ত 'বাচাল'দের লক্ষ্য করে লিখছেন—

—"ধর্ম সম্পর্কে দৃষ্টিকোণে গান্ধী ও লেনিনের মধ্যে যে ধরনের মত পার্থক্য রয়েছে তার মতো বিপরীতমুখীতা ও অসাদৃশতা আর দ্বিতীয়টি নেই। গান্ধী ছিলেন গোঁড়া হিন্দু এবং শতাব্দী জুড়ে চালু কুসংস্কারগুলোর প্রত্যেকটিতে বিশ্বাসী। যদিও সময় সময় জাতীয় আন্দোলনের স্বার্থে নিজের ধর্ম-বিশ্বাসগুলোকে নতুন ব্যাখ্যায় সজ্জিত করতেন তবুও মনে মনে তিনি চিরকারই গোঁড়া হিন্দু। তাঁর অল্প বয়সে তিনি নিজেকে

'সনাতনী' বলে বর্ণনা করতেন। বৈদিক কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা, গো-রক্ষা ও মূর্ত্তিপূজা-এর সবকটাই তিনি মেনে নিয়েছিলেন। প্রথম দিককার দিনগুলোতে যখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় নেতা হিসেবে গান্ধীর বিকাশ ঘটেছে, সেই সময় তাঁর বক্তব্য ছিল—'আমি নিজেকে 'সনাতনী হিন্দু' বলি কারণ (১) আমি বেদ, উপনিষদ ও পুরাণে বিশ্বাস করি এবং হিন্দু শাস্ত্রের নামে যা কিছু আছে অর্থাৎ 'অবতারবাদ' ও 'পুনর্জন্ম-বাদেও' বিশ্বাস করি, (২) আমি এমন বর্ণাশ্রম ধর্মেই বিশ্বাস করি যা আমার ধারণা অনুযায়ী খাঁটি বৈদিক ধরনের, আজকের মতো সাধারণের মধ্যে চালু কাঁচা ধরনের নয়। (৩) আমি গো-রক্ষায় বিশ্বাস করি আরো ব্যাপকতর অর্থে, জনপ্রিয় অর্থে নয়, এবং (৪) আমি পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাসী নই।'

···অপরপক্ষে 'লেনিনের কাছে জনগণের পক্ষে ধর্ম হলো আফিং—মার্কসের এই আপ্তবাক্যই ধর্ম সম্বন্ধে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণের কষ্টিপাথর। মার্কসবাদ সর্বদাই মনে করে যে, বর্তমান সমস্ত ধর্ম ও গির্জা এবং প্রত্যেক ধর্মীয়-সংস্থা বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার যা শুধুমাত্র শোষণকেই রক্ষা করে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে বোকা বানায়।—(কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ১৫, পৃঃ ৪০৩)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ধর্ম শোষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, তাই তাকে উপেক্ষা করা চলে না। 'সমাজতন্ত্র ও ধর্ম' গ্রন্থে লেনিন লিখেছেন, ধর্ম হলো মানসিক অত্যাচার করার এমন একটি শক্তি যা, পরের জন্য অবিরত কাজ করতে করতে ক্লান্ত, অভাবগ্রস্থ, বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোর ওপর পাথরের মত চেপে বসে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই-এর সময় বন্য মানুষগুলোর দুর্বলতা যেমনভাবে শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর সময়ও তেমনি। শোষিত শ্রেণীর দুর্বলতা পরের জন্মে আরো সুন্দর-জীবন লাভের বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়। যারা সারা জীবন পরিশ্রম করেও অভাবে দিন কাটায়, ধর্ম তাদের শেখায়—পৃথিবীর বুকে অনুগত ও ধৈর্যশীল হতে এবং স্বর্গীয় পুরস্কার লাভের আশায় সান্ত্বনা পেতে···ধর্ম হলো জনগণের কাছে আফিং। ধর্ম এমন একটা আধ্যাত্মিক মদ যাতে

পুঁজির দাসেরা নিজেদের মানবিক সত্ত্বাকে ডুবিয়ে দেয়।

আপাতদৃষ্টিতে দুজনের এই মতপার্থক্য অলঙ্ঘনীয় ও বিপরীত কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার ফলাফল বিচার্য। রাশিয়াতে লেনিনের মত কি প্রকারের ফলপ্রসূ হয়েছে তার সঙ্গে গান্ধীর তুলনা করা চলে না, তার তুলনা হবে ভারতের জনগণের সম্পর্কে—কারণ এর মধ্যে স্থান কালগত অবস্থার বিপুল পার্থক্য রয়েছে। রাশিয়ার অবস্থা ছিল এক ধাপ এগিয়ে—সেখানে মুক্তিযুদ্ধ কোন বিদেশী শাসনের কবল থেকে ছাড়া পাবার যুদ্ধ নয় এবং সেখানে ধর্মাচরণ জীবনের প্রত্যেক কর্মে গ্রথিত নয়। স্নান খাওয়া মৈথুন বিহার প্রতি পদক্ষেপে যেখানে বিচিত্র ধর্ম-কর্মের জালে জনগণ আবদ্ধ, সেখানকার অবস্থার সঙ্গে রুশ দেশের জার শাসিত জনগণের কুসংস্কার ও মূঢ়তা যতই প্রবল হোক তার তুলনা চলে না। সে সব দেশে ধর্মকর্ম একটি বহিরঙ্গ কর্ম, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বদ্ধ তার সামান্য প্রভাব। ভারতের মানুষের তা সমগ্র জীবনের টানা পোড়েনে বোনা। এই পরিস্থিতিতে তৎকালীন কোন সহৃদয় জননেতা এক মুহূর্তেই সে বুনট ছিঁড়ে ফেলতে পারেন না। তাছাড়া গান্ধিজী তো ছিলেন ঐ জনতারই একজন—তাঁর চিন্তা ভাবনা সংস্কার তো এই দেশের মাটিতেই গঠিত। তা অন্য কোন দেশ থেকে আহৃত নয়। এই দেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসের ফল যে জনমানস গান্ধীও তারই অন্তর্বর্তী ছিলেন সন্দেহ নেই—কিন্তু এই গান্ধী পরিবর্ত্তিত হয়ে চললেন —ক্রমে সেই পরিবর্তন আনতে হল তাঁর নিজেকেই।

যেমন গীতাঞ্জলির ঈশ্বরমুখী কবি রবীন্দ্রনাথ বলাকার পর থেকেই মানুষের দিকে মুখ ফেরালেন, তেমনি অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কোথায় গেল মহাত্মার বর্ণাশ্রয় ধর্ম, কোথায় বা গেল গো হত্যা নিয়ে মাথা ব্যথা। (অপরপক্ষে মার্কস নির্দেশিত একটি বিশেষ দার্শনিক মত লেনিন গ্রহণ করে কর্মে প্রয়োগ করলেন) একারণে দুজনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পৃথক। জীর্ণ পুরাতন সংস্কার ধ্বংস করে যুগোপোযোগী কর্মের যে সূচনা গান্ধিজী করেছেন তা তো আজ চল্লিশ বছর পরেও লেনিনের নামে যাঁরা গান গাইছেন তাঁরা করছেন না। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধিজার দুর্দমনীয়

অভিযান ভাইকং-এ মন্দিরদ্বারে সত্যাগ্রহ, অবশেষে মন্দিরের দ্বার উন্মোচন এগুলো অবশ্যই সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুগামী নয়।

ধর্ম সংস্কার ও অনুষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে লেনিন বা মার্কস যাই বলে থাকুন কার্যত এদেশে তার প্রয়োগ কেউ করেননি। এমন কি এখনও খোদ রাশিয়াতে গ্রীক চার্চে পূজার্চনা চলছে—উজবেকিস্তানে নামাজ পড়া হচ্ছে—যদিও কাল প্রভাবে তার আগ্রহে অবশ্যই ভাঁটা পড়েছে। এ কোনো অস্বাভাবিক কথা নয়, সমস্ত মানুষকে এক মুহূর্তে তার সকল পূর্বতন সংস্কার থেকে উৎপাটিত করা মানেই জবরদস্তি করা। যাঁরা মানবদরদী একাজ তাঁরা সহজে করেন না। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সেনাপতি এমন কোনো অস্ত্র যদি ব্যবহার করেন যা ধর্মের চেয়েও প্রাণঘাতী তবে তা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় কি না সে তর্কই গান্ধীর মূল্যায়নের প্রথম সূত্র। অর্থাৎ উদ্দেশ্য কি উপায়ের মালিন্য দূর করতে পারে?

গান্ধী যে সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী সে হিন্দু ধর্ম বলতে কি বোঝায় সেটা প্রথমে নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম শব্দটি প্রায়শই দ্বৈত অর্থে ব্যবহার থাকে—কারু কাছে আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ, সন্ধ্যা পূজা ফুল পাতা গঙ্গাজল মূর্তি নানা বিগ্রহ, ক্রুশ বা পীরের দরগা। কারু কাছে কতগুলি শাশ্বত নীতি যা সর্বজনের গ্রহণযোগ্য।

ধর্ম অর্থ যা মানুষের ভিত্তি যা তার সমগ্র চরিত্রকে ধারণ করে রাখে, লোভে ক্ষোভে ক্রোধে মাৎসর্যে স্খলিত হতে দেয় না। বলাবাহুল্য এই দ্বিতীয় অর্থে ধর্মকে কেউ আফিং বলে না। যে ধর্মের কথা সনাতন শাস্ত্রবাণীতে বলা হয়েছে—ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ—ধর্মকে রক্ষা করলে তবেই ধর্মও রক্ষা করে, সে বিবেকানন্দ কথিত ভাতের হাঁড়ির ধর্ম নয়।

দ্বন্দ্বের রাজনীতির প্রশ্নে তখন এত বিতর্ক উত্তাল হয়নি তবু ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনীতির নৈতিক দিকের শূন্যগর্ভতার প্রতি লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ ১৩০৯ সালে অর্থাৎ ১৯০২-তে লিখেছিলেন "কিন্তু এরূপ উপদেশ শুনা যায় যে প্রকৃতির নিয়ম বিরোধ অতএব বিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বাহির যদি আমার বিরুদ্ধ হয় তবে আমিও

তাহার বিরুদ্ধ না হইলে বাঁচিতে পারিব না। এই জন্য শিশুকাল হইতে ভিন্ন জাতির সহিত বিরোধভাবের একান্ত চর্চাই প্যাট্রিয়টিক সাধনা। হিন্দু জাতি সেই পোলিটিক্যাল বিরোধভাবের চর্চাকেই সকল সাধনার অপেক্ষা প্রাধান্য দেয় নাই বলিয়াই নষ্ট হইয়াছে।

পূর্বোক্ত কথাটি যদি একান্তই স্বীকার করিতে হয় তবে সেই সঙ্গে একথাও বলিব আত্মরক্ষাই মানুষের অথবা লোক সম্প্রদায়ের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম নহে। ধর্মে যদি আশা করে তবে তাহাতেই মাথা পাতিয়া দিতে হইবে।" একথা বোঝা কঠিন নয় যে এ ধর্ম আফিং নয়—এবং একথাই রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধিজী প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের উভয়ের এই বিশ্বাস ছিল যে—

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কুশল লাভ করে। শত্রুদিগকে জয় করিয়া থাকে—কিন্তু সমূলে বিনিষ্ট হইয়া যায়।… সাময়িক লাভ হলেও পরিণামে সমূলে বিনাশ ঘটে।

ধর্মকে আফিং, এল-এস-ডি, ভাং এসব কেউ বলতে পারে না কেউ বলেওনি। গান্ধিজী নিজে কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন তা তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষের দিকে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। গান্ধিজীর ধর্ম কোনো একটি বহিরঙ্গ বস্তু নয়, কোনো নিদিষ্ট স্থানে পূজা দিয়ে কোনো নিদিষ্ট দিনে স্নান করে, কোনো নিদিষ্ট মন্ত্র আউড়ে তার শেষ হতো না। বস্তুত তিনি যে কখনো কোনও মন্দিরে পূজা দিয়েছেন বা উপযুক্ত তিথিতে স্নান করতে গিয়েছেন এসব আমরা শুনিনি—। তাঁর ধর্ম তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মের মধ্যে প্রবহমান একটি পরম শক্তি—যে শক্তি ক্রমে ক্রমে প্রচলিত মত বিশ্বাসের খর্পর থেকে তাঁকে উত্তরণ করে নিয়ে গেল এক অখণ্ড জীবন বোধের মধ্যে যা কোনো শাস্ত্রনির্ভর মতবাদের খোঁয়াড় নয়, সে শাস্ত্র ধর্মেরই হোক, দর্শনেরই হোক বা রাজনীতিরই হোক, তা যথার্থই প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত।

আমরা জানি বাংলা দেশে বিশেষ করে গান্ধীর প্রতি একটি অশ্রদ্ধার

ভাব প্রথম থেকেই আছে। যখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তাঁর প্রভাব পরিব্যাপ্ত তখন বাংলা দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর আসন প্রশস্ত নয়। এর অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ বাংলা দেশের Sophistication।

ইংরেজের কাছে বাঙালী প্রথম অধুনিকতার পাঠ নিয়ে যে যুক্তিবাদে বিশ্বাসী হয়েছে, তার নব জাগরণের ক্ষেত্রে বহু মনীষীর দান একটা নূতন যুগের সূচনা করেছে যা অন্যত্র বিরল। অজ্ঞাত। যেমন গান্ধিজীর হরিজন আন্দোলনের বহু পূর্বেই বাংলা দেশে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে জাতিভেদের মূলে আঘাত করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনে ঠাকুর পরিবারে ডোম পাচকের পক্ক অন্নে কারু কোন সংশয় আসেনি। তাছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলন, অহিংস বা সহিংস অর্থাৎ আবেদন নিবেদনে নম্র (যেমন তৎকালীন ইংরেজী ভাষী কংগ্রেসে) বা আন্দোলনে চঞ্চল এবং উদ্ধত (যেমন বঙ্গ ভঙ্গ রোধের সময়ে ও বোমা বিস্ফোরণে) এ সমস্তেরই বাংলা দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধিজীর আগমণের বহু পূর্বেই পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

গান্ধিজী পদে পদে নাড়া খেয়ে যে পথে গিয়েছেন যেমন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে গিয়ে তিনি দেশের মানুষের কথা চিন্তা করেছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অবস্থা চিন্তা করে তাকে ভাবতে হয়েছে মুসলমানদের কথা হরিজনের কথা স্ত্রী জাতির কথা, কৃষকের কথা —অর্থাৎ স্বাধীনতা যে মানুষের জন্য—সকল স্তরের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য একথা বোঝা মাত্রই তাঁর কাছে একথাও স্পষ্ট হয়েছে যে এদেশে মানুষের বন্ধনরজ্জু কেবল ইংরেজের হাতেই নেই—তা আছে সমাজের হাতে শাস্ত্রের হাতে, শোষণের হাতে। কুসংস্কারের জালে বেষ্টিত মূঢ় মানুষ লাঞ্ছিত হচ্ছে নানাভাবে। স্বাধীনতা তাই এদের কাছে শুধু একটা বুলি মাত্র। যার কোন সার নেই। গান্ধিজীর পূর্বে একথা রবীন্দ্রনাথও চিন্তা করেছেন, কর্মেও প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর গ্রামীণ কর্ম-পরিকল্পনায় তা বিশদভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ঐ ধরনের সর্বাঙ্গীন পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনায় তা বিশদভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

ঐ ধরনের সর্বাঙ্গীন পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা তখনকার দিনে আর কেউ করেননি। তবে বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি এবং ধ্যানী, কর্মী নন, তাই তাঁর চিন্তাকে ভারতব্যাপী কর্মরূপ দেবার শক্তি তাঁর ছিল না।

যাহোক এই সব কারণে বাঙালীর মন অনেকটা এগিয়ে ছিল, এমন কি আজ যাকে সেকুল্যার ভাব বলা হয়—সে ভাবনাও ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম ভাবনায়, সমাজসংস্কার চেতনায়, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় নানভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। বিদ্যাসাগর একটি কুঠার হাতে বেরিয়ে পড়েছিলেন এই নিশ্চিদ্র নির্বুদ্ধির অরণ্যের উৎপাটন করতে। বলাবাহুল্য—এগুলো বিপ্লব নয়, সংস্কার। সেজন্য এদের শোধনবাদী বলা চলে কিনা জানি না কারণ তখনও এদেশে মার্কসের খবর পাওয়া যায়নি; যা হোক এ নিয়ে আমরা স্পষ্টই দেখতে পেলাম যে, এই ধরনের যুক্তিবাদী চিন্তার সূত্র ধরে, এক সর্বাঙ্গীন মুক্তি আন্দোলনের প্রবাহ সমাজের মূলে আঘাত করল—মেয়েদের মুখের ঘোমটা খুলল, জাত বিচার, খাওয়া-ছোওয়ার ধর্মের ভিত্তি নড়ে গেল। এমন কি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগল ও প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা হতে লাগল। যাঁরা উগ্রপন্থী তাঁরা ১৯০৫ সালে বোমা তৈরী করলেন।

অতএব একথা সত্য যে, গান্ধিজী আসবার বহু পূর্বেই আধুনিক চিন্তার উদ্দাম প্রবাহ বাংলাদেশে বহু লোককে প্রচলিত মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ও প্রচলিত সমাজের আমূল পরিবর্তনের কথা ভাবিয়েছে।

তাদের কাছে অর্থাৎ সেই শিক্ষিত ক্ষুদ্র জনসমাজের কাছে গান্ধিজীর আচরণ যুক্তিবিরোধী পশ্চাৎমুখী বলে কখনো কখনো মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ গান্ধিজী সত্যই ছিলেন বিশ্বাস-নির্ভর, বিশ্লেষণাত্মক যুক্তির চেয়ে তিনি অন্তরস্থ নির্দেশকেই (intuitive) মানছেন, একথা বলতে তিনি দ্বিধা করতেন না। যদিও অনেক সময়ই সে নির্দেশ এসেছে তাঁর অবচেতন মনের গভীরে স্থিত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থেকে তাতে সন্দেহ নেই। যা হোক শিক্ষিত বাঙালী মন ততদিনে রোমান্টিক রাজনীতিতে ভরপুর, ইংরেজ তাড়াবার পরিকল্পনা নিয়ে যখন কতিপয় তরুণ দুঃসাহসী অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে তখন তাদের ভাগ্যে নীরব ও গোপন প্রশংসা

ছাড়া আর কিছু জোটেনি। কারণ সে চেষ্টা সমগ্র দেশকে স্পর্শ করেনি। দেশের লোকই তাদের ধরিয়ে দিয়েছে, তাদের নিজেদের মধ্যে গুপ্তচর ঢুকেছে—পরস্পর পরস্পরের প্রতি হিংস্র হয়েছে—হিংস্র উপায় গ্রহণের ফলে চরিত্র ভ্রষ্টতার সেই সূত্রপাত লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' লিখেছিলেন। আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, দল ভ্রষ্টতা প্রভৃতির মধ্যে তার উৎকট রূপ ক্রম প্রসারিত হতে দেখতে পাচ্ছি।

এমন সময়ে গান্ধী এমন একটি বাণী নিয়ে এলেন, এমন একটি পথ দেখালেন যার মধ্যে উদ্দাম উচ্ছ্বাস নেই, যা প্রতিদিনের জীবনে নিরলস কর্মের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়ে একটি বিশেষ জীবনরূপ গঠনের নির্দেশ দিল। রাজনীতি তার সমগ্র জীবন থেকে বিচ্যুত কতগুলি ঘটনা সংগঠন মাত্র নয়। যা তার জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোত জড়িয়ে তার সমস্ত সত্ত্বাকে একটি বিশেষ রূপ দেবে। নিজের হাতে কাটা খদ্দর হলো তাদের ইউনিফর্ম, ঐ একটি বস্তু সাম্য ভাবনাকে অসংখ্য সাধারণ লোকের জীবনে একটি বাস্তব সত্য হয়ে উঠতে সহায়ক হলো।

কোথায় ইংরেজকে খেদিয়ে দেওয়া, আর কোথায় চরকা কাটা, হরিজনকে মন্দিরে ঢোকান, হিন্দু মুসলমান ঐক্য নিয়ে মাথা ঘামান। স্বভাবতই এই নিরুপদ্রব রাজনীতি, তরুণের উন্মাদনার উপর ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু তিনিই একমাত্র যোদ্ধা যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চরিত্র বলকে কায়িক বলের চেয়ে অর্থাৎ অস্ত্রের চেয়ে মানুষকে বেশি মূল্য দিয়েছিলেন। কাজেই গান্ধী নীতিতে হৃদয়হীন ক্রূরতা, মিথ্যা, হত্যা, চাতুরী ও প্রবঞ্চনার স্থান নেই। তাঁর কাজকে একসঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও যথার্থ মুক্তির জন্য প্রস্তুতি বলা যেতে পারে। সেই প্রস্তুতিই তিনি সমগ্র ভারতের অগণিত সাধারণের জন্য করছিলেন, যার ফলে তিনি শিক্ষিত, বিদগ্ধ নাগরিকবৃত্তি সম্পন্ন মানুষের কাছে কখনো কখনো পশ্চাৎমুখীরূপে প্রতিভাত হতে বাধ্য।

তিনি সত্য সত্যই সেই অগণ্য মূঢ় জনতার একজন হয়ে তাদের হৃদস্পন্দনে কান পেতেছিলেন। সেই গ্রামীন সরল ধর্মভীরু ভারতীয়

জনতাকে দাঙ্গাবাজ করে তোলার চেয়ে তাদের বিবেকবান ও সৎবুদ্ধি সম্পন্ন করার পরিকল্পনা তাঁর কাছে মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক ছিল—বলা বাহুল্য এই কারণেই তিনি জনতার অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছিলেন। তিনি জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়েই তাকে 'এক যুগ থেকে অন্য যুগে' নিয়ে চলে- ছিলেন—তাই মূঢ় জনতার ভাষা মাঝে মাঝে তার মুখে শোনা গেছে, যার যুক্তিহীনতা শিক্ষিত মানুষকে বিরূপ করতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এইখানেই মাঝে মাঝে তাঁর মতবিরোধ হয়েছে তা সত্ত্বেও সুভাষ বোসের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানিতে কবির অভিজ্ঞ মন গান্ধীর যে মূল্যায়ন করেছে নাবালকের দেশব্যাপী তাণ্ডব দিয়ে সে সত্যকে মুছে দেওয়া যাবে না।

সুভাষ বোস কোনো প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—

"...আপনি নিজে সম্প্রতি মহাত্মাজীর অন্ধ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন —অন্ততপক্ষে আপনার লেখা পাঠ করিলে সেরূপ ধারণা মানুষ স্বভাবত পোষণ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় মহাত্মাজীর সমালোচনা আপনি বরদাস্ত করিতে পারিবেন কিনা আমি জানি না"

এর উত্তরে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

স্নেহভাজনেষু

Bernard shaw-কে আমি ভালমতো জানি, তোমার বইয়ের পূর্ব ভাষণ লেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে আমি সাহস করিনে। করলেও ফল হবে না, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমার পাণ্ডুলিপিখানির এককপি তুমি নিজেই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেখতে পার। এতদিনে সংবাদপত্র যোগে নিশ্চয় তিনি তোমার পরিচয় পেয়েচেন।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা তোমাকে বলা আবশ্যক বোধ করি। মহাত্মা গান্ধী অতি অল্পকালের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের মনকে এক যুগ থেকে আর এক যুগে নিয়ে যেতে পেরেছেন। কেবল একদল রাষ্ট্র- নীতিকের নয়, সমস্ত জনসাধারণের মনকে তিনি বিচলিত করতে পেয়েছেন—আজ পর্যন্ত আর কেউ তা পারেনি। এর পূর্বে ভারতবর্ষের

এখানে ওখানে ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে দুর্বল রকমের রাষ্ট্রনৈতিক সুড়্‌সুড়ি লেগেছিল মাত্র। মহাত্মাজীর চরিত্রের মধ্যে এই একটা প্রবল নৈতিকশক্তিকে ভক্তি যদি না করতে পারি তবে সেইটেকেই বলব অন্ধতা অথচ তাঁর সঙ্গে আমার স্বভাবের, বুদ্ধির ও সঙ্কল্পের বৈপরীত্য অত্যন্ত প্রবল। মনের দিকে, কল্পনার দিকে, ব্যবহারের দিকে তিনি আর আমি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর জীব। কোনো কোনো বিষয়ে তিনি দেশের ক্ষতি করেছেন—কিন্তু দেশের নির্জীব চিত্তে হঠাৎ যে বল এনে দিয়েচেন একদিন সেটা সমস্ত ক্ষতিকে উত্তীর্ণ হয়ে টিঁকে থাকবে। আমরা কেউই সমস্ত দেশকে এই প্রাণশক্তি দিইনি। শান্তিনিকেতন: ইতি—১৭ আগষ্ট ১৯৩৪

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানব চেতনায় বিজ্ঞানের অভিঘাত

আমি প্রথমেই এই সভার উদ্যোক্তাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এই বিদ্বৎমণ্ডলীর মধ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য।

আমি এখানে শিখতেই এসেছি—শেখাতে আসিনি। বিজ্ঞানের ছাত্রী নয় বলে "Science and the boundaries of knowledge : the prologue of our cultural past" আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে এই দীর্ঘ শিরোনামাটি আমাকে কিছুটা বিভ্রান্তই করেছিল। 'বিজ্ঞান ও জ্ঞানের সীমারেখা'-এর অর্থ কি বিজ্ঞানের জ্ঞানের পরিধি? অর্থাৎ বিজ্ঞান কতটা জানতে পারে? এমন কি কোনো সীমা আছে যার পরে যুক্তিবদ্ধ চিন্তা-ভাবনা পৌঁছয় না? অর্থাৎ যেখানে যুক্তি দিয়ে সত্যকে পাওয়া যায় না? (ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন)

এ প্রশ্নের কে উত্তর দিতে পারে এক মাত্র যিনি সর্বকাল ও সমগ্র অস্তিত্বের দ্রষ্টা তিনি ছাড়া (spectator of all time and existance—Plato)। তিনি কি দার্শনিক? কোথায় গিয়ে মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত হয়?

আজ বিজ্ঞানের জগতের দিকে তাকালে আমাদের মনে প্রথমই যে ভাব জাগে তা বিস্ময়—পরম বিস্ময়। মানুষের জ্ঞানের ব্যাপকতা ও গভীরতার ব্যাপ্তি আমাদের বিস্ময়ে ভরে দেয়। বিজ্ঞান মানুষকে নিয়ে গেছে বস্তুকণার অভ্যন্তরে, আমরা চিনেছি বস্তুর স্বরূপকে। আবার আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে মহাবিশ্বের বিরাট বিশালতায়। বিজ্ঞানের প্রসাদেই মানুষ দেখেছে অদৃশ্য জগতকে। শুনেছে শ্রবণাতীত শব্দকে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তিকে বহুদূর অতিক্রম করে গেছে বোধশক্তি। অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণের দ্বারা এক বিরাট গোপন জগতের অর্থ মানুষের কাছে উদঘাটিত হয়েছে।

যখন আমি বর্তমানে আলোচনা সভার বিষয়বস্তুর সংজ্ঞাটি শুনলাম, বেদ থেকে একটি বাক্য আমার মনে এল—'কো বেদঃ'—কে জানে?

সৃষ্টিকর্তাই কি সম্পূর্ণ জানেন ?

একটি ধারণা চলিত আছে যে বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নেই। কিন্তু মানুষের চরিত্রের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতা অনুস্যূত হয়ে আছে। মানুষের সমস্ত কর্মেই আত্মার প্রকাশ। সে কারণেই সে কখনই সম্পূর্ণ বস্তুবাদী হতে পারে না। বিজ্ঞানের যে সমস্ত আবিষ্কারের ফলে মানুষ এত সব উপভোগ্য বস্তু পেয়েছে তার প্রত্যেকটির পিছনেই মানুষের শুধু শরীর নয় মনের কাজও আছে। অনাদিকাল থেকে মানুষের মন সত্যের সন্ধানী। সেটা বস্তুগতই হোক বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারই হোক। মানুষের চেতনার যে অংশ ক্রমাগতই জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে চাইছে, তার এই আকাঙ্খা কেবলমাত্র জৈব ও শারীরিক জীবনে আবদ্ধ থাকতে পারে না। অন্য সমস্ত প্রাণীর মতনই একদা মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল কেবলই বেঁচে থাকা এবং উৎপাদন করা। পরে তা নানাদিকে বিবর্তিত হয়েছে। তার বুদ্ধি এবং যুক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার আবেগ এবং নানা মানসিক অনুভূতিও গড়ে উঠেছে। তার শিল্প সৃষ্টির ক্ষমতা এবং তার নৈতিক চেতনাও কোন অংশেই তার জৈবিক চেতনার চেয়ে কম নয়। এই নৈতিক চেতনার বা বিবেকের শক্তি এত বেশি যে, তা মানুষকে তার জৈবিকসত্ত্বা থেকে উপরে উঠবার ক্ষমতা দিয়েছে। সেই ক্ষমতাতেই তার মনুষ্যত্বের পূর্ণতা। অবশ্য বিজ্ঞানও মানুষের এই চিত্তশক্তিরই প্রকাশ।

বিজ্ঞানের কাছ থেকে মানুষ যে উপকার পেয়েছে তা সংখ্যাতীত। শুধু যে অনেক জিনিসপত্র তৈরি হয়েছে তাই নয়, মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাকে অযুক্তি থেকে যুক্তির পথে, অন্ধ বিশ্বাসকে যুক্তিবদ্ধ চিন্তার দিকে নিয়ে গেছে। বিজ্ঞান মানুষকে সঙ্কীর্ণ কুসংস্কারের বন্ধন থেকে, অর্থহীন আচার বিচারের মোহ থেকে, মুক্তি দিয়েছে। যে সমস্ত আচার, বিচার, কুসংস্কার, বিশেষ ভৌগলিক সীমানার মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে পৃথক করে দিয়েছে জগতের বিস্তীর্ণ মানব চিত্ত-ভূমি থেকে। আমরা ভারতবর্ষের এই পরিবর্তনটি হয়তো পাশ্চাত্য সমাজ থেকে বেশি বুঝতে পারি। এক শতাব্দী আগেও বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার ইচ্ছা এদেশে

কমই ছিল। আমাদের মন কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, গুরু পুরোহিত ও শাস্ত্র বচনের দ্বারা পিষ্ট ছিল। গুরু-পুরোহিতরা অনেক সময়ই শাস্ত্রকে নিজেদের সুবিধা অনুসারে ব্যাখ্যা করতেন। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিখুঁতভাবে সত্যের সন্ধান মানুষের সামাজিক সম্বন্ধগুলো বিস্তৃত করেছে। মানুষে মানুষে যোগ অনেক বেশি সম্ভব হয়েছে। ফলে তার মনুষ্যত্ব বিকাশের বেশি সুযোগ হয়েছে।

এইসব কথা চিন্তা করলে আমরা ভাবতে পারি না যে বিজ্ঞান কেবল বস্তুবাদী বা materialistic। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন কি সীমারেখা আছে যাতে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি বাধা পাবে, এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা সত্যিই বিপজ্জনক। দেড়শ বছর আগেও কে কল্পনা করতে পারত আজকের অভাবনীয় বিচিত্র আবিষ্কারগুলোর কথা, মনে হয়, মানুষ যেন স্রষ্টার সাথে পাল্লা দিয়ে এমনই গতিতে চলেছে ইতিহাসে যার নজির নেই। এমন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও কোথাও কোন নজির আছে কি না সন্দেহ। কত যুগ লেগেছে নেবুলাকে শক্ত হয়ে মাটিতে পরিণত হতে। এই টগ্‌বগে পৃথিবীকে শান্ত হতে কত যুগ কেটে গেছে। আরও কত যুগ লেগেছে প্রকৃতির প্রাণ সৃষ্টি করতে। কত কোটি বছর লেগেছে স্রষ্টাকে কুৎসিত, প্রকাণ্ড জীবগুলিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে। তার পরে মানুষ পরম মহিমায় আবির্ভূত হয়েছে এবং ফুলের সৌন্দর্যকে দেখতে পেয়েছে।

কিন্তু মানুষের যুক্তিবদ্ধ চিন্তা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সে সবকিছু খুব দ্রুত জানতে পারছে। তার নৈতিক চেতনা যেন এই গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না।

বিজ্ঞান আজ আমাদের অসংখ্য উপভোগ্য বস্তু উপহার দিচ্ছে। বিগত দিনের সম্রাটরাও যা পাননি আজ একজন দরিদ্র বা সামান্য লোকও তা পেতে পারে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ভৌগলিক সীমাও মুছে গেছে এবং দূরের মানুষ কাছে এসেছে। এই অবস্থায় আমরা তো অনেক কিছুই আশা করতে পারতাম—? সংকীর্ণ সংস্কারবদ্ধ চিন্তা দূর হবার ফলে—দ্রুতগামী যানবাহনের দ্বারা দেশে দেশে দূরত্ব কমে যাবার

ফলে এক নূতন সভ্যতার আবির্ভাব হবে; মানুষের মনের উদারতা বাড়বে, মহত্তর আদর্শের কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা ক্রমে ক্রমে কমে যাবে।

বহুকাল আগে যখন মানুষের বুদ্ধি এত যুক্তিনির্ভর ও বিশ্লেষণাত্মক হয়ে ওঠেনি তখন তার চেতনায় পশুত্বের ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য একটি আবেগ সৃষ্টি হচ্ছিল। যদিও প্রত্যেক প্রাণীর প্রধান স্পৃহাই তার জীবনলিপ্সা—তাই তার নিজের প্রাণ ও শরীর বাঁচাবার ও বাঁচবার জন্যই আঘাত খেলে প্রত্যাঘাত করবার ইচ্ছাই স্বাভাবিক ছিল, তবু সে ক্রমে উপলব্ধি করল যে কেবল শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখাই মানবজীবনের মূল লক্ষ্য নয়। এই বোধের ফলেই সে 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁতের' অর্থাৎ বদলা নেওয়ার চিন্তা থেকে অনেক দূরে চলে এল এবং তখন সে বলতে পারল শত্রুকে ক্ষমা কর। শত্রুকে ক্ষমা করা সোজা কথা নয়, এই নীতি গ্রহণ করলে তা অবশ্যই প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ—শত্রুকে হনন না করলে সে নিজে বাঁচবে কি করে? কিন্তু এই নূতন মানুষ, অনুভব করল তার অমরত্ব কেবল তার শরীরটাকেই বাঁচিয়ে রাখার উপর নির্ভর করে না—তা নির্ভর করে বহু মানবের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করার মধ্যে। সে বুঝতে পারল যে সমগ্র মানবসত্তার সে একটি অংশ এবং মানবজাতির এক ভবিতব্য। এই সত্যটি বুঝতে পারলে তবেই সে অমরত্ব লাভ করতে পারে। এই শরীরটুকুই তার সমগ্র অস্তিত্ব নয়। সে তার চেয়ে অনেক বড়। বুদ্ধ বলেছিলেন, যে মানুষ এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে তেমনি প্রেমের চোখে দেখতে পারে যে চোখে এক পুত্রের জননী তার পুত্রকে দেখে, সে মানুষ ব্রহ্মে বাস করে—তার ব্রহ্ম বিহার—(ব্রহ্ম শব্দটির ইংরাজি অনুবাদ হয় না এ ক্ষেত্রে হয়ত বলা যায় অনন্ত)।

দুঃখের বিষয় এই যে, বিজ্ঞান মানুষের উপর অমিত শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করলেও মনুষ্যত্বের প্রধান গুণগুলিকে বাড়িয়ে তুলতে পারেনি। তার চরিত্রের ভিত্তিটাই দৃঢ় করতে পারেনি—বাড়াতে পারেনি তার ন্যায় বুদ্ধি, তার বিবেকের শক্তি এবং সেই সহজাত চেতনা, যা দিয়ে

সত্যের প্রকৃতি বা মানুষ কি হয়ে উঠতে চাইছে তা বুঝতে পারে। অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাইরে যা কিছু তা রইল বিজ্ঞানের সীমার বাইরে।

অবশ্য বিজ্ঞান আমাদের কাছে বহু দিগন্ত উদ্ঘাটিত করেছে এবং তার জ্ঞান, যে জ্ঞান ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়, সে জ্ঞানের পরিধি আমাদের পূর্বপুরুষেরা কল্পনাও করতে পারতেন না। কিন্তু অন্য একটি দিক আছে যা সেভাবে উৎকর্ষ লাভ করেনি। আমরা অনেক জেনেছি কিন্তু জ্ঞানী হইনি। অসংখ্য তথ্য একত্রিত করলেই সত্যজ্ঞান জন্মায় না। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে গুহাহিত হয়ে যে অনুভবের শক্তি (intuitive power) আছে এবং যে সর্বব্যাপী প্রেম সমস্ত মানবজগতে পরিব্যাপ্ত আছে সেই সব হৃদয়বৃত্তির সংযোগ না হলে কোন তথ্য জ্ঞানে পরিণত হয় না।

এই ক্ষতির জন্য অবশ্য আমরা বিজ্ঞানকে দায়ী করতে পারি না। বিজ্ঞানে নৈতিকতার প্রশ্নই নেই। আমরা দায়ী করতে পারি বিজ্ঞানের শক্তিতে উৎপাদিত বা বিজ্ঞানের সন্তান 'টেক্‌নলজিকে'। এই টেক্‌ন-লজিই বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে এমনভাবে ব্যবহার করছে যাতে আমাদের লোভের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এক সর্বগ্রাসী লোভ বিজ্ঞানের বিপুল বিদ্যাকে অধিকার করে ক্রমাগতই স্ফীত হয়ে উঠছে।

পরমাণবিক শক্তি ও অন্যান্য ধ্বংসকারী শক্তি তাদের অতিকায় ও বীভৎস বল নিয়ে যেভাবে দর্পিত হয়ে উঠেছে তাতে সাধারণ মানুষ একেবারে সম্পূর্ণ বিনাশের ভয়ে আতংকিত হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানের বিপুল শক্তির সাহায্যে আমরা পৃথিবীর গহ্বরে আমাদের লোভী হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সমস্ত ধনরত্ন আহরণ করে আনছি এই প্রজন্মের সুবিধার জন্য, ভোগের জন্য। আমরা আমাদের জমিকেও নানাভাবে নিংড়ে নিচ্ছি, তার সমস্ত শক্তিকে আমাদের ভোগে লাগিয়ে ফুরিয়ে ফেলছি। মানুষের পেট ভর্তি করবার জন্য আমরা মুরগীকে দিয়ে প্রতিদিন বড় বড় ডিম পাড়াবার কৌশল আয়ত্ব করেছি—ঐ মুরগী কোনোদিন মোরগ দেখবে না শুধুই ডিম উৎপাদন করবে। গরুও কোন দিন বলীবর্দ দেখবে না কিন্তু এত দুধ দেবে যাতে তার প্রভু দুধে স্নান করতে পারে। অবশ্যই

এতে বিজ্ঞানের ক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে এবং আমরা অনেক খেতে পারছি, প্রকৃতির মাতার সম্পদ স্বেচ্ছাসুখে ভোগ করতে পারছি। কিন্তু আমরা যে প্রকৃতি থেকে আনন্দের অংশটুকু নিংড়ে ফেলছি তাতে কি সন্দেহ আছে?

মানুষ তার যন্ত্রচক্ষু ও যন্ত্রকর্ণ দিয়ে অনেককিছু দেখেছে ও শুনেছে যা শুধু পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে সে পারত না। সে জেনেছে molecule-এ molecule-এ কি বন্ধন, এটম ও এটমে কি ঐক্য, যা দিয়ে এই বিপুল বিচিত্র পার্থিব জগৎ গড়ে উঠেছে। কিন্তু সে কি তার চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে কি ঐক্য তা জানতে পেরেছে, তার মানুষের সমাজে সমাজে মানুষে মানুষে যে জটিল সম্পর্ক তার মধ্যে কোনো ঐক্য আনতে পেরেছে? যদি আমরা একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সংঘবদ্ধ মানবসমাজ গঠন করতে না পারি তাহলে বিজ্ঞান আমাদের কতটুকু কাজে লাগল। বিজ্ঞানের ক্রমাগত অপব্যবহারের ফলে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধগুলি ক্রমাগত ভেঙ্গে যাচ্ছে, তার মূলেই আঘাত পড়ছে।

বিজ্ঞানের গভীর জ্ঞান কিন্তু মানব জীবনে সামঞ্জস্য আনতে কোনো সাহায্য করেনি।

আমাদের মধ্যে কি সেই বোধ জন্মেছে যে ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা ক্ষমা, মানুষে মানুষে সহযোগিতা ইত্যাদি নৈতিকবোধের মধ্যেই মানব জীবনের পূর্ণতা? এই জাগতিক ও মানবিক সত্তার মধ্যের ব্যবধানই আমাদের সত্যকারের অগ্রগতির বাধা।

বিজ্ঞান তার দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছে কিন্তু সে কি মানব চেতনার বা চৈতন্যের অপার রহস্যকে জেনেছে?

হয়ত কোনো সময়ে কোনো বিশেষ মুহূর্তে মানুষ সত্যের আভাস পেয়েছে,—দেখতে পেয়েছে বা জেনেছে এমন কিছু যা যুক্তির পথে বা বিচার বিতর্কে নয়, যা এসেছে যেন অকস্মাৎ একটি উপহারের মত। এবং সেই কারণেই তা বাহ্যিক কোনো প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। এই রকম জ্ঞানের কথাই আমাদের প্রাচীন প্রাজ্ঞরা বর্ণনা করেছেন অবাঙ্‌মানস-

গোচর বলে—যা বাক্য ও মনের অতীত, বা যাকে বিদ্যা বুদ্ধি দিয়েই পাওয়া যায় না—ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।

মানব চেতনায় বিজ্ঞানের অভিঘাত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের অতীতের ইতিহাস বা সংস্কৃতির আলোচনা করতে হয়।

ভৌগলিক ব্যবধানের দ্বারা বিভক্ত হওয়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে সংস্কৃতি বা 'কালচার' কথাটির অর্থে পার্থক্য হয়েছে। যে সভ্যতা ভারতে চীনে গ্রীসে রোমে বা ঈজিপ্টে গড়ে উঠেছিল তা যেন ভিন্ন ভিন্ন পর্বত চূড়ার মত দাঁড়িয়ে আছে—তাদের উচ্চতার মধ্যে পার্থক্যও আছে। ভারতে আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীরা ছিলেন অন্তর্মুখী। যখন তাঁরা কিছুই জানতেন না যে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষ কত কি জানতে পারবে তখন তাঁরা তাঁদের সহজাত বুদ্ধি ধ্যান ও অন্তর্শক্তি দিয়ে সত্যকে জানতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অমরত্ব এবং অণুকণার রহস্য অণুধাবণ করেছিলেন যখন তাঁরা স্রষ্টাকে বলেছিলেন অণুর মধ্যে অণু ও বৃহতের মধ্যে বৃহৎ—অণোরয়নীয়ান্ মহতো মহীয়ান—কিংবা যখন শ্রীকৃষ্ণের ব্যাদিত মুখের মধ্যে অর্জুন ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই এক সঙ্গে দেখেছিলেন। তাঁরা বোধহয় বোঝাতে চেয়েছিলেন যে স্থান এবং কালের যে চেতনা, যে বোধ মানুষের মধ্যে আছে সেটাই স্থান কালের একমাত্র বা সত্যকার প্রকৃতি নয়।

আইনস্টাইনের চিন্তাধারার সঙ্গে বা আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কোনো চিহ্নমাত্র যখন জানা ছিল না তখন, সেই প্রায় চার হাজার বছর আগেই সেই প্রাচীন প্রাজ্ঞরা বলেছিলেন আমাদের এক যুগ ব্রহ্মার এক মুহূর্ত মাত্র।

ইভলিওশনের তত্ত্ব আমাদের বলেছে কিভাবে ক্রমে ক্রমে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জড় থেকে জীবন, এবং ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে চৈতন্যসম্পন্ন মানুষে এসে পৌঁছেছে—এই বিবর্তনের ধারায় কোনো ছেদ নেই। জড় এবং জীবন যেন এক অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা—এই ধারার সম্পূর্ণ ছেদ কখনই হতে পারে না। কিন্তু কোনো কোনো দেশের ধারণা আছে যে মানুষের আত্মা অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে একেবারে পৃথক। জড়বস্তুর সঙ্গে

ঐক্যের কথাই ওঠে না। কিন্তু ভারতীয় মনীষীরা বলেছিলেন সব কিছুর মধ্যেই প্রাণ স্পন্দ্যমান—সর্বং প্রাণমং এজতি কিংবা তিনি এক ছিলেন বহু হলেন—একমেবা বহুস্যাম—আমি এক ছিলাম, বহু হব। এই একটি বাক্যই ক্রমবিবর্তনের মূল কথা মনে করায়। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় এই ভাবটি আছে—

যখন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা
আমি এলাম ভাঙল তোমার ঘুম
শূন্যে শূন্যে উঠল ফুটে আনন্দ কুমকুম
আমি এলাম তাইতো তুমি এলে
···আমার মুখে চেয়ে আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

এই 'তুমি' কে তা আমরা জানি না। এটা নিশ্চয়ই মানুষেরই একটি বড় প্রতিচ্ছবি নয়। ইনিই তিনি যিনি যুগ যুগ ধরে অস্তিত্বের অর্থ উদঘাটন করে চলেছেন মানুষের চেতনায়।

এই সহজাত বুদ্ধি রঙ্গীন হয়েছে মানুষের কল্পনা, দর্শন কবিতা ইত্যাদির রঙ-এ—কারণ এগুলোও তার চেতনারই অঙ্গ।

তর্ক যুক্তি ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা যত বেড়েছে ততই মানুষের চেতনায় সত্যকে অনুভব করবার শক্তি এবং আরো অনেক সূক্ষ্ম বোধ পলাতক হয়েছে। যখন মানুষ বলেছিল 'একই বহু হলেন' সেই সঙ্গে সে আরো বলেছিল বিশ্বের সবকিছুই ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত তাই ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর, অন্যের ধনে লোভ কোনো না। কারণ লোভ আমাদের অস্তিত্বের অসীম মূল্য থেকে সরিয়ে নিয়ে মনটাকে পার্থিব জিনিসের দিকে ধাবিত করে।

আজকের দিনের মানুষের পক্ষে এই দুটি চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া মাত্র সম্ভব নয়। সে অবশ্যই জানে যে জগতে যত বস্তু আছে তা নৃত্যশীল অণু-পরমাণুর সমষ্টি মাত্র, তবু এইসব চিন্তার অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে না। যখন মানুষ শুধু বুদ্ধিতে নয় অনুভবেও

বুঝতে পারে যে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যের গভীর অবিভাজ্য ঐক্য তখনই সে বুঝতে পারে যে অন্যকে আঘাত করলে তার নিজেকেও আঘাত করা হয়।

বিজ্ঞানের বিপুল শক্তির উদ্ভবের ফলে মানুষের চৈতন্য থেকে অন্য শক্তিটি স্খলিত হয়ে গেছে। আর বিজ্ঞানও শুদ্ধ থাকতে পারেনি। ক্রমাগতই নূতন নূতন ভোগ্যবস্তু বানানর কাজে লেগেছে—অসংখ্য ভোগ্যবস্তু বানিয়ে বানিয়ে মানুষের লোভ ক্রমাগতই বাড়িয়ে তুলেছে। যার ফলে জ্ঞানের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে।

মানুষের চেতনার যে দুটো দিক আছে, তার জৈবিক সত্তা পার্থিব বস্তু নিয়ে কারবার করে কিন্তু তার আত্মিকসত্তাও বর্তমান এবং সত্য। মানুষের চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গেই তার মধ্যে একটি বোধ জন্মেছে যে, কোনো পরাশক্তি আমাদের চালনা করে চলেছে। এই বোধ যুক্তি তর্ক দিয়ে সে পায়নি—এ বোধ প্রত্যক্ষ। তার নৈতিক চেতনাও এই বোধেরই অঙ্গ—সে আমাদের বলে যে আমাদের আদর্শগত জীবনে আমরা কেবল নিজের স্বার্থ চিন্তা না করে সমগ্র মানবের চিন্তা করব। স্বার্থশূন্যতাই মানুষের সমাজের প্রধান ঐক্য বন্ধন। আজকে বিজ্ঞানের প্রভাবে মনের চেতনার এই অংশটা বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। ব্যক্তি মানুষের পক্ষে এবং জাতীয় চেতনায়ও এই চিন্তা অবরুদ্ধ। যখন আমরা দেখি যে আর্থিক সুবিধার জন্য এপারথেইড অনেক সভ্য দেশ সমর্থন করছে—বা হাইজ্যাক করা নীরিহ মানুষকে খুন করা দ্ব্যর্থহীন ভাবে সকলেই নিন্দা করছে না, তেল বা অন্য কোন বস্তু পাবার আশায় এক বৃদ্ধা নারী তার নিজের দেহরক্ষীদের দ্বারা নিহত হচ্ছে—তবু এসব কাজ সকলের দ্বারা নিন্দিত হচ্ছে না, আমাদের আশঙ্কা হয় যে বিজ্ঞান তার বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার নিয়েও মানুষকে এ গুরুতর ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান মানব মনের সেই দিকটায় পৌঁছতে পারছে না যেখান থেকে শান্তি প্রেম ও শুভবুদ্ধি প্রবাহিত হচ্ছে। যেখানে অন্য মানুষের মঙ্গল চিন্তাই প্রাধান্য পায়।

কীটের মত লোহী লোহী দংশন দিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলটাই

কুরে কুরে ফেলা হচ্ছে এবং ক্রমাগত আণবিক শক্তির অস্ত্রের পাহাড় বানিয়ে আমরা সম্পূর্ণ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছি। বিজ্ঞানের ক্রম-বর্দ্ধমান সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে অন্য কোনো পথে আমাদের সত্যসন্ধানকে চালনা করতে হবে।

বহুযুগের সাধনায় মানব চেতনার জন্ম হয়েছে তা তার ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবার জন্য নয় বরং সেই সব ভাবনাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা যা মানুষের আন্তর্নিহিত সত্ত্বাকে প্রকাশ করে সত্য শিব ও সুন্দরের বিচিত্র প্রকাশে।

Unesco দ্বারা ভেনিসে একটি আলোচনা সভা ১৯৮৬ সালে ছয় ও সাত মার্চে আহূত হয়—ঐ সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—Science and the boundaries of knowledge—the prologue of our cultural past. এই সভায় সতের জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তার মধ্যে নোবেলপ্রাইজ বিজয়ী একজনও ছিলেন। পনেরটি দেশ থেকে বক্তরা আহূত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে মৈত্রেয়ী দেবী নিমন্ত্রিত হন এবং সেই বিদ্বৎসভায় তিনিই একমাত্র নারী উপস্থিত ছিলেন।—প্রকাশক

জাতীয় জাগরণে রামানন্দের দান

অর্ধশতাব্দীর বেশি যাঁর কর্মময় জীবন একটি বৃহৎ জাতির রূপায়ণে সাহায্য করেছিল তাঁর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে ও বলতে যে চর্চা ও জ্ঞানের প্রয়োজন তা আমার নেই। 'জাতীয় জাগরণে রামানন্দের দান' —গবেষণার বিষয়বস্তু হবার মতই ব্যাপক বিষয়। এবং হওয়া উচিত। যে সময়ে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী একটি সদাজাগ্রত যুক্তিবাহী চিন্তার প্রকাশে অবিরত সচেষ্ট ছিল সে সময়টা ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা স্মরণীয় কাল—দেশে তখন দীর্ঘদিনব্যাপী এক অভূতপূর্ব দ্বিমুখী যুদ্ধ চলছিল---একদিকে যুদ্ধ পুরানো সংস্কাররীতি, অযৌক্তিক কুপ্রথা ও অতীতের পুঞ্জীভূত জঞ্জালের সঙ্গে আর একদিকে যুদ্ধ বিদেশী শাসনের সঙ্গে। মন্থর শাসন ও ইংরেজের শাসন—এই দুমুখী লড়াইয়ে যিনি একজন প্রধান যোদ্ধা তাঁর জীবনের যথোপযুক্ত আলোচনা সেই সময়ের ইতিহাসের বুনটে গ্রথিত করেই হতে পারে। সে কাজ তিনিই করতে পারবেন যাঁর সে সময়কার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা আছে। অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের চেয়েও দুটি প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে রামানন্দের জীবন ও চিন্তা আরো গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে। দেশে যখন যেখানে যে আন্দোলন হয়েছে, সভা হয়েছে, যে কেউ অত্যাচারিত হয়েছে, যে কোন অন্যায় হয়েছে আবার যে কেউ মহত্ত্ব দেখিয়েছে, এবং বিদেশে তার যা কিছু প্রতিক্রিয়া হয়েছে, প্রত্যেকটি ঘটনাই রামানন্দের যুক্তিশাণিত লেখনীতে বিশ্লেষিত হয়েছে, তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছে, তাঁর দেশপ্রেমকে জাগ্রত করেছে। জাতীয় জীবনে তাঁর দানের ইতিহাস তাই ভারত ইতিহাসের একটি বিরাট ও বিশেষ সময়ের সঙ্গে একই বুনটে বোনা হয়ে রয়েছে। আশাকরি এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কোনো ইতিহাসবিদ্ করবেন।

আমি ইতিহাসবিদ্ও নই, রাজনৈতিক কর্মীও নই। তৎকালীন

রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে কোনো পর্যায়েই যুক্ত হবার সৌভাগ্য আমার হয়নি—সেজন্য পরম শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে কিছু বলবার বিশেষ কোনো অধিকার আমার নেই। তথাপি যে আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং আমিও সাহস করে তাঁর সম্বন্ধে দুকথা বলতে এসেছি তার একটি কারণ তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত গভীর স্নেহ সম্পর্কের অধিকার। তাঁর দীর্ঘ-জীবনের অনেকটা সময়ই আমার অজ্ঞাত। তাঁর জীবন সায়াহ্নে অল্প সময়ের জন্য, আমার অল্পবয়সে তাঁকে আমি দেখেছিলাম। সেই দেখা হারিয়ে যায়নি, আমার জীবনে আজও নানা-ভাবে তা মূল্যবান হয়ে রয়েছে। উপকারী পরমাত্মীয়ের মতই আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন—এই বিশেষ যোগ্যতা ছাড়া তাঁর বিষয়ে আলোচনা করবার আর কোনো যোগ্যতা আমার নেই।

রামানন্দের কর্ম ও চরিত্রের একটি বিশেষ দিক নারী জাগরণে তাঁর সক্রিয় সহায়তা—যে সময়ে তিনি কলম ধরেছিলেন সে সময় শুধু ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বেই নারীর ইতিহাস শুরু হয়নি। সাফ্রেজেট্স আন্দো-লনেরও বহুপূর্ব থেকেই এদেশেও নারীমুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং তা হতে পেরেছে এঁদের মত যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত কিছু মানুষের জন্যই। আমার উপর ভার ছিল যে আমি এই বিশেষ দিকটির কথাই আলোচনা করব কিন্তু রামানন্দের জীবনে এই কাজ তাঁর সমগ্র জীবন-চেষ্টার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে যুক্ত—কোনো ভাবাবেগের দ্বারা বিচলিত হয়ে তিনি এ কাজে নামেননি—সমগ্রভাবে জাতীয় জাগরণের প্রসঙ্গে, যুক্তিবাদের প্রয়োগে, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এক অবশ্য প্রয়োজন বলেই তিনি জেনেছিলেন। বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ণ বা সতীদাহ নিবারণের মত কোনো বিশেষ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত একটি প্রচেষ্টা এ নয়। বহু পুরাতন সংস্কার-জীর্ণ জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এবং যুক্তিবাহী চিন্তার অনিবার্য পরিণতি হিসাবেও তিনি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সত্যকে সমর্থন করেছিলেন—তাই শুধু ভারতে নয় যেখানেই মেয়েদের কোনো শুভ প্রচেষ্টা, কোনো আন্দোলন হয়েছে তা রামানন্দের সমর্থন লাভ করেছে। বর্তমান যুগে যে সাম্যভাব বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ

করেছে তার মূলে যে কথাটি প্রধান ও প্রথম প্রতিপাদ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে—সেটা হচ্ছে মানুষ মূলত এক। দেশ জাতি বর্ণ ও আকৃতির বৈষম্য সত্ত্বেও। শিক্ষা সংস্কৃতি সংস্কার ও সমাজব্যবস্থার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও। নারী ও পুরুষের শারীরিক পার্থক্য সত্ত্বেও। মানুষ হিসাবে যে ঐক্য—তা তার অনৈক্যের চেয়ে সত্য। অনৈক্য বাহ্যিক। ঐক্য অন্তর-জীবনের। এই মানব সত্যকে উপলব্ধি করা, স্বীকার করা ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টাই এ যুগের একটি বিশেষ প্রচেষ্টা। এই যুগবাণীর উদ্বোধক যে সমস্ত মানুষকে আমরা জানি তাঁদের মধ্যে রামানন্দ যে একজন অতি বিশিষ্ট মানুষ, এতে সন্দেহ নেই। এখানে ১৯১৭ সালের মডার্ন রিভিউর সম্পাদকীয় থেকে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি। Dr. Alfred Golds borough Mayer-এর 'ফিজি দ্বীপের ইতিহাস' নামক বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে রামানন্দ বলেছেন: "কোনো কোনো সভ্যজাতির নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা-বশত আদিম বা বন্যজাতি বা অন্য সভ্য ও অপেক্ষাকৃত কম সভ্যজাতিকে নিজেদের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন মনে করেন। সম্ভবত এই ধারণা একটি অহঙ্কৃত কুসংস্কার মাত্র। ডাক্তার মেয়ার আমাদের দেখিয়েছেন যে সভ্য মানুষ ও বন্য মানুষের মধ্যে পার্থক্য তার মানসিক শক্তির পার্থক্য নয়। পার্থক্য ঘটেছে যে বস্তুর উপর সেই শক্তির প্রয়োগ করা হচ্ছে তারই জন্য। তিনি বলেছেন, এলজেব্রার কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য যে রকম বুদ্ধির দরকার, অরণ্যের ভিতর অনুসরণ করে ক্যাঙ্গারুকে ধরে ফেলবার কৌশলেও তেমনি বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ। সত্য কথা বলতে কি জঘন্যতম হীন মানুষ সুদূর আফ্রিকার ঘন অরণ্যে, অস্ট্রেলিয়া বা নিউগিনিতে নেই। তারা আছে সভ্যদেশের বড় বড় শহরের দুর্বৃত্তদের মধ্যে।" 'তাহলে সভ্য মানুষের সঙ্গে বর্বর মানুষের পার্থক্য কোথায়' রামানন্দ এই প্রশ্ন করে ঐ বই থেকেই তার উত্তর দিচ্ছেন, —'এই পার্থক্য প্রধানতই এইখানে যে সভ্য মানুষরা অগ্রসর হচ্ছে। তাদের চিন্তার ধারা ও জীবনধারা ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু savage বা আদিম বৃত্তি সম্পন্ন মানুষ অতীতকে আঁকড়ে ধরে একই

জায়গায় স্থির থাকতে চাইছে। ধর্মের দ্বারা পবিত্রীকৃত প্রথার বন্ধনে তাকে অসহায়ভাবে বদ্ধ হয়ে পড়তে হচ্ছে। আদিম মানুষের জগৎ সংস্কার ও প্রথার দুঃস্বপ্নের শাসনে শাসিত হচ্ছে।' ...এমন কি আমাদের মধ্যেও প্রত্যেক প্রগতির চেষ্টাই সমাজের দ্বারা প্রতিহত বাধা-গ্রস্ত হয়ে থাকে। সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এই যে প্রধান পথ, প্রথার বন্ধন ছাড়িয়ে, বুদ্ধির জাগরণে অন্ধকার থেকে আলোতে, অসত্য থেকে সত্যে পৌঁছবার পথ, সেই পথই রামানন্দ তাঁর শক্তিশালী পত্রিকাগুলির মাধ্যমে নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন।

রামমোহন রায়ের প্রতিভার প্রস্ফুরণে বাংলা দেশে মানবতাবাদী বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন যদিও অনেক আগেই শুরু হয়েছিল এবং সেই আন্দোলনের ফলেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও শিক্ষিত বাঙালীর জাতীয় জীবনে ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছিল, আবার সেই সঙ্গে তার পাশে পাশেই একটা মূঢ় স্বজাত্য অভিমান কিছু লোককে পশ্চাদ্‌মুখী করে তুলেছিল। দেশপ্রেমের ছদ্মবেশে প্রতিক্রিয়াশীল বিপরীতমুখী চিন্তা শিক্ষিত সম্প্রদায়কেও বিভ্রান্ত করছিল। যে ভাবের প্রতি কটাক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'ঘরেতে বসি গর্ব করি পূর্বপুরুষের, আর্য তেজদর্প ভরে পৃথিবী থর থর।' সেই পুরানো ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা প্রবাসীর সমসাময়িক কয়েকটি মাসিকপত্রের মধ্যে দেখা গেলেও রামানন্দ সম্পাদিত প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ-র দীর্ঘ জীবনের সমস্ত গতিই ছিল সামনের দিকে। পরাধীন দেশের পত্র-পত্রিকার প্রধান কাজ যেমন স্বাধীনতার লিপ্সাকে বাড়িয়ে তোলা—তেমনি অনগ্রসর দেশের সর্বতোমুখী উন্মেষের সাহায্য করা।

ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার মুক্তির আন্দোলনের প্রভাবে রামানন্দের সম্পাদিত পত্রিকার চিন্তাধারা এদিক থেকে সমসাময়িক অন্যান্য পত্র-পত্রিকার চেয়ে স্বভাবতই কিছুটা এগিয়েছিল কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজেরও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী থেকে মুক্ত হওয়ার কৃতিত্ব তাঁর নিজেরই। রাম-মোহন রামানন্দের আদর্শ পুরুষ ছিলেন একথা আমরা শুনেছি, বস্তুত রামমোহনকে যুক্তিবাদী মানুষ মাত্রেই আদর্শ পুরুষ বলে গণ্য করতেন।

বর্তমানে সমস্ত ভারতই তাঁকে নবযুগের উদ্বোধক বলে জানে। কিন্তু তাঁর দ্বারা ক'জনের জীবন প্রভাবিত হয়েছে? পুরানো মূল্যবোধকে নূতন পরিস্থিতিতে নূতন অর্থে বার বার পূর্ণ করতে পারাতেই যথার্থ রামমোহনের প্রতিভার সার্থক চিত্রণ হতে পারে। যাঁরা যুগের পরিবর্তন করেন তাঁদের কার্যের অন্তর্নিহিত অকথিত উপদেশ এই থাকে যে যুগে যুগেই সেই প্রয়াসকে নূতন করে প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু জগতে তা কদাচিৎ ঘটে। তাই আজ যাঁরা নূতন চিন্তার বাহক, কাল তাঁরাই গোঁড়া রক্ষণশীল হয়ে পড়েন, প্রগতির প্রতিবন্ধক হন। রামানন্দের জীবনকর্মের মধ্যে রামমোহনের প্রভাবের সার্থকতা এই যে তাঁর চিত্ত-বৃত্তিকে চির সজাগ চির সজীব করে রেখেছিল। দেশের সর্ববিধ সমস্যাকে যুগোপযোগী সমাধানের সামর্থ্য দিয়েছিল। যুক্তিনির্দিষ্ট তথ্যনির্ভর প্রত্যয়কে কখনো অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা পরাভূত হতে দেয়নি। প্রত্যেক সমস্যা বা প্রয়োজনকে যুক্তির প্রয়োগে যথাযথভাবে দেখা ভারতীয় আবেগপ্রবণ চরিত্রের বিশেষত্ব নয়। তাই কখনো পশ্চাদ্‌মুখী দেশাত্ম অভিমান কখনো উন্মার্গগামী অতিনব্যতার খেয়ালের ঝোঁক আজও নানাভাবে নানাক্ষেত্রে জীবনকে সত্যভ্রষ্ট করছে—কিন্তু গভীর ও সত্য দেশপ্রেম যুক্তি ও তথ্যের বিচারের দ্বারা চালিত হলে যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণের পটভূমি সৃষ্টি করতে পারে তা রামানন্দের কর্মময় জীবনে একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ রয়ে গেছে।

তিনি এক জায়গায় লিখছেন—'কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে এ বৎসর আমাদের সর্বপ্রধান স্বদেশী ঘটনা কি ঘটিয়াছে তাহা হইলে আমরা কি উত্তর দিব? চুড়ি ভাঙ্গা নয়, বিলেতি কাপড় পোড়ানো নয়। জাতীয় দলের সহিত মোকদ্দমায় পূর্ববঙ্গের গভর্নমেণ্টের পরাজয়ও নয়, এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়াদি স্থাপনও নয়। সর্বপ্রধান স্বদেশী ঘটনা বিজ্ঞানা-চার্য জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভিদের সাড়া (Plant Response) নামক গ্রন্থ প্রকাশ।' এর অর্থ এমন নয় যে স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মগুলির মূল্য তিনি দেন না—শুধু তার চেয়েও মূল্য দেন দেশের মধ্যে সক্রিয় চিত্তশক্তির বিকাশকে। তিনি লিখছেন—'জ্ঞানে, মানসিক

শক্তিতে যত আমরা স্বাধীন হইব সেই পরিমাণে আমাদের সর্ববিধ পরাধীনতা কমিয়া আসিবে।' কথাটি শুনতে যত সহজ মনে হয় উপলব্ধি করা তত সহজ নয়। দেশের মানুষই যে দেশ, সেকথা তখন বা আজ পর্যন্ত আমাদের নেতৃবৃন্দ যদি ঠিকমত বুঝতে পারতেন তবে বর্তমান অবস্থা অন্যরূপ হতো। মানুষের এত অনাদর হতো না। তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের সহায়করূপে শিক্ষাকেও স্থগিত করা হয়েছে। কোনো কোনো প্রসিদ্ধ নেতা শিল্প ও সাহিত্যের চর্চাকেও পরাধীন দেশের পক্ষে বিলাসিতা বলেছেন—রবীন্দ্রনাথও বিদেশ গমনের জন্য তিরস্কৃত হয়েছেন। দেশে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন চলেছে তখন অন্য সব কাজ ছেড়ে সকলেরই তাতে যোগ দেওয়ার স্বপক্ষে স্বভাবতই অনেকে স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। কিন্তু দেশের মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টাও যে স্বাধীনতা আন্দোলনেরই একটা দিক এ কথা যে ক'জন জ্ঞানী বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামানন্দ অন্যতম। দেশ বলতে যে দেশের মানুষ এ কথাটা তো আজও আমাদের কাছে সত্য হয়ে ওঠেনি। আজ দৃষ্টিভঙ্গি কিছু বদলেছে, দেশ বলতে আমরা সিসটেম বুঝছি—ইস্‌ম বুঝছি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্যই সমস্ত চেষ্টাকে উৎসর্গ করছি। নবীনের চেতনাকে ডগমার দ্বারা আচ্ছন্ন করছি। এ সমস্ত দেশের জন্য করছি, যে দেশ অনেকেরই কাছে নিবিকল্প ভাবের ছায়ামূর্তি, মাত্র প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের ও শক্তির পূর্ণ বিকাশের মধ্যে বিধৃত বাস্তব সত্য নয়। রামানন্দ দেশের মানুষের সৃজনীশক্তি, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার বিকাশে সাহায্য করাকেও পরাধীনতার শৃঙ্খল খোলার একটি পথ মনে করতেন বলেই তাঁর পত্রিকার পাতা সর্বদা শুধু জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি শক্তিধরদের কাজেই উৎসর্গিত থাকত তা নয়, সাধারণ মানুষের অনেক প্রয়াসও তাঁর পত্রিকায় স্থান পেয়ে তাদের অনুপ্রাণিত করত। ফলে তিনি সৃষ্টি করেছেন লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও সমাজকর্মী। তাঁর পত্রিকার প্রশ্রয়ে ও আশ্রয়ে একটি একটি করে মানুষ পূর্ণতার পথে

এগিয়েছে। বস্তুত রামানন্দ লেখক সৃষ্টি করতেন, যে মানুষ আত্ম-প্রকাশের পথ জানে না, তিনি তার পথ খুলে দিতেন, এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব কিন্তু এখানে তার স্থান হবে না। শুধু লেখক নয়, পাঠকও সৃষ্টি করেছেন রামানন্দ—আজকাল যেমন শুনি পাঠকরা নাকি সিনেমা স্টারদের ছবি ছাড়া পত্রিকা কেনে না—উদ্ভট ও অশ্লীল গল্প পড়তে চায়, তবেই বই বেশি প্রচার হয়। তাই সেগুলির চাষের ফলাও কারবার ছাড়া পত্রিকার উপায় নেই। নিজের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি এমন অবজ্ঞা ও এমন দায়িত্বহীনতা সে যুগে কোনো সম্পাদকই হয়ত করতেন না। বিশেষ করে 'প্রবাসীর' পাঠকগোষ্ঠি, যারা 'বিবিধ প্রসঙ্গ' পড়বার জন্য তেমনি আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতেন যেমন আগ্রহে হয়ত আজকের পাঠক থান ইট মার্কা উপন্যাসের জন্য থাকেন। সত্য বলতে কি প্রবাসীর পাঠকদের নিয়ে একটি সংবেদনশীল, উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন, সুস্থরুচি ও রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। বাংলা দেশের জীবনে এত দীর্ঘদিন ধরে সুসংস্কৃত পাঠক মন গড়ে তোলার কাজ আর কোনো সম্পাদক করেছেন কিনা সন্দেহ।

সাধারণত তথ্যের সঙ্গে রসের সম্পর্ক একটু দূর, কিন্তু রামানন্দের তথ্যসমৃদ্ধ রচনা যুক্তিশাণিত বুদ্ধির দীপ্তিতে, কৌতুক উজ্জ্বল ভাষা ও হাস্যরসের অভিষেকে, 'বিবিধ প্রসঙ্গের' পাতায় পাতায় কঠিন রাজনৈতিক আলোচনাও সুখপাঠ্য করে রেখেছে। সেই রসজ্ঞের দৃষ্টিই তাঁকে করেছে শিল্পকলার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। রবিবর্মার বিলিতি ধাঁচে আঁকা দেবদেবীর ছবি ছাড়া তখন দেশের মানুষের কাছে আর কোনো শিল্পমূর্তি নেই। রূপের সন্ধানে ঠাকুরবাড়ির মহাশিল্পীরা যখন চারিদিকে খুঁজে ফিরছেন, খুঁজে ফিরছেন দেশকে, তার স্বপ্নকে, তার বাণীকে, কখনো ধর্মে, কখনো সঙ্গীতে, কখনো চিত্রকলায়—তখন ভারতীয় চিত্রকলার উজ্জীবনের কাজে, ভারতের শিল্পসত্তার আবিষ্কারের কাজে, রামানন্দের সহায়তার কথায় অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'রামানন্দবাবুর কল্যাণে আমাদের ছবি আজ ঘরে ঘরে—এই যে ইণ্ডিয়ান আর্টের বহুল প্রচার, এ এক তিনি ছাড়া আর কারুর দ্বারা সম্ভব হত না।' আজকাল

অতিনব্যদের মুখে এমন কথাও শুনি যে Indian art এর revival এর প্রচেষ্টা ছিল কবর খুঁড়ে পুরানো মৃতদেহ বের করা—এটা পশ্চাদ্‌-মুখীনতা। বস্তুত তাঁরা তখনকার অবস্থাটা ভাবেন না। যে দেশ নিজের বুঝবার মন, দেখবার দৃষ্টি সমস্তই হারিয়ে অনুকরণের ময়ূরপুচ্ছে কৃত্রিম সজ্জায় সাজতে চাইছে, নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যই তাকে কান পেতে শুনতে হয়েছিল, অনুসরণ করতে হয়েছিল নিজ দেশের ইতিহাসের ধারার, যে ধারা অবজ্ঞা ও অপমানের মরুভূমিতে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। এঁদের চেষ্টায় ও সাধনায় যে তুলনাহীন সৌন্দর্য ভারতের বিস্মৃত অতীত থেকে বর্তমানের জগতে উপস্থিত হল তার চিরন্তন শিল্প মূল্যের উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল সমগ্র দেশের সম্মান। কোনো এক বয়সে রবীন্দ্রনাথও রবিবর্মার ছবির আদর করতেন কিন্তু চির নূতনের সন্ধানী কবি এসে দাঁড়ালেন শিল্পীদের পাশে, যখন তাঁদের তুলিতে নূতন জীবনে উজ্জীবিত হচ্ছিল চিরন্তন ভারত, আর দেশ শুদ্ধ লোক কোলা-হল সহকারে ধিক্কার দিচ্ছিল। অর্থাৎ ভারতীয় চিত্রকলা ভারতীয় হলেও সে সময়ের ভারতীয়ের কাছে ছিল অভূতপূর্ব ও আকস্মিক। এখানে হয়ত একথা উঠতে পারে যে রামানন্দের এই শিল্পানুরাগ অকৃত্রিম শিল্পানুরাগ নয়, দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি। এ অবিমিশ্র, নিখাদ, শিল্প-প্রীতি কি না? কিন্তু যখন অবনীন্দ্রনাথের মত শিল্পী এই ভারতীয় চিত্রকলার সাধনায় পূর্ণ প্রেরণা পেয়েছেন তখন একথা কিছুটা প্রমাণ হয় যে শিল্পও সমাজের সীমার বাইরে নয়। সন্দেহ হয় দেশের তৎকালীন অবস্থায় দেশপ্রেমের বন্ধন মুক্ত শিল্পের নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা হতে পারে কিনা। শিল্পের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ বিচারের প্রশ্নে এ একটি আলোচ্য বিষয় হতে পারে।

এর পর এলো আর এক যুগ যখন কবি এদেশে প্রথম বিমূর্ত শিল্পের যুগ পরিবর্তনকারী শিল্পীর ভূমিকা নিলেন। তখনও রামানন্দ সমান উৎসাহে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। এবং যেমন ভারতীয় শিল্পের সমালোচক-দের উত্তরে তার তত্ত্বটি বলেছিলেন—তেমনি রবীন্দ্রচিত্রকলার অরূপ মূর্তির তত্ত্বও সমালোচকদের জন্য ব্যাখ্যা করে লিখেছিলেন। সে লেখা-

গুলি পড়লে একথা বোঝা যায় যে তাঁর গতিশীল মন শিল্পের ক্ষেত্রেও এগিয়ে চলেছিল—অতি পরিণত বয়সেও দ্রুত এবং আমূল পরিবর্তনকে গ্রহণ করবার মত বিস্ময়কর সজীবতা তাঁর ছিল। নূতনকে তিনি ভয় করতেন না, এই জন্যই তিনি রবীন্দ্রনাথের চির সুহৃদ হতে পেরেছিলেন।

১৯২৬ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ প্রথম গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের রঙ্গমঞ্চে নৃত্যের উৎসাহ দিলেন তখন নিন্দার কোলাহলের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের ভ্রূকুটিও তীব্র হয়েছিল। তখনও এই পক্কশ্মশ্রু, বিজ্ঞব্রাহ্ম কবির সহায়ক হয়েছিলেন। 'প্রবাসী'তে নৃত্যরতা মেয়েদের ছবি নিয়মিত ছাপা হতো। কবি চিরকালই বাঁধন ছেঁড়েন—তাঁর সঙ্গীতে তাঁর জীবন বাণী,—'আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে—' তিনি স্রষ্টা, সংস্কারের বন্ধন, নিয়মের বন্ধন, ছিঁড়ে ছিঁড়েই তাঁর যাত্রা, কিন্তু প্রাচীন শিক্ষকের কাছে, বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে যুক্ত এবং পাঠকদের বিরূপতার সম্ভাবনা সত্বেও সম্পাদকের কাছে চিত্তের এমন মুক্তি কে আশা করতে পারে ?

এই সজীব সদাজাগ্রত অগ্রসর মন নিয়ে রামানন্দ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা হয়েছিলেন। তাঁর বহুবিচিত্র কর্মময় জীবনের ও বিচিত্র বিষয়ের রচনার মধ্যে মূল লক্ষ্য, মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বাধীনতা। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন :—'মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত না হইলে মানুষ স্বাধীন হইতে পারে না, ইহা যেমন সত্য, মানুষ স্বাধীন না হইলে তাহার শক্তি পূর্ণমাত্রায় উদ্বোধিত ও বিকশিত হইতে পারে না, ইহাও তেমনি সত্য।" তাই উভয় মুখেই পূর্ণ শক্তিতে চলেছিল তাঁর দীর্ঘ জীবনের কাজ। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে তাঁর চেয়ে আর কারো ব্যাপক যোগ থাকা সম্ভব ছিল না। মডার্ন রিভিউর মারফত বিশ্বের দরবারে ভারতের বক্তব্য পৌছে দেবার কাজ এমন নিখুঁত নিপুণতার সঙ্গে করাও আর কারু দ্বারা সম্ভব হতো না। ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক ভারতজিজ্ঞাসু ঐ পত্রিকার জন্য ব্যগ্র হয়ে থাকতেন। ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের যে বিকৃত ছবি, নিজেদের কার্যকলাপের যে যুক্তি,

জগতের সামনে কৈফিয়ত রূপে উপস্থিত করতেন, রামানন্দ তাঁর অকাট্য যুক্তির শাণিত ফলায়, কৌতুক হাস্যের তীব্র ঝলকে, তাকে বিদ্ধ করতেন। দীর্ঘদিন ধরে ধাপে ধাপে এই কাজ এগিয়ে গেছে। কোনো একটি ঘটনাও দৃষ্টিচ্যুত হয়নি। শুধু যে দেশের মধ্যেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তা নয়, ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, যেখানেই ভারতীয় লাঞ্ছিত হয়েছে সেখানেই তাদের সহায়রূপে অক্লান্ত ছিল মডার্ন রিভিউর কাজ। শুধু ভারতীয় কেন, যেখানে মানুষ লাঞ্ছিত হয়েছে সেখানেই অপমানিত মনুষ্যত্বের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন—মানুষের জয়গানেও তেমনি হয়েছেন অকুণ্ঠ। আমেরিকায় সেগ্রিগেশন আইন, কালারবার প্রভৃতির বিরুদ্ধে চলেছে তাঁর আপসহীন লড়াই। অতন্দ্র প্রহরীর মত জাতির স্বার্থকে, ভারতের স্বার্থকে ও মানুষের স্বার্থকে তিনি পাহারা দিয়েছেন। মডার্ন রিভিউর নোট্‌সগুলি পুনর্মুদ্রণ হলে সে কথা সকলে বুঝবেন।

১৯১৭ সালে ভাইসরয় কোনো বক্তৃতায় বলেছিলেন 'আমি ভারতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন ইত্যাদি ইত্যাদি···তবে আমি আবার বলছি যে ভারতের পক্ষে rapid progress এর চেয়ে steady progress মঙ্গলজনক, হঠাৎ পরিবর্তন মঙ্গলজনক নয়—step by step এগিয়ে যেতে হবে।' মডার্ন রিভিউ লিখলেন—'ভাইসরয় পাঞ্জাবে যা বলেছেন তা পেট্রগ্রাদে বললে মানাত—যদি একজন মানুষ স্থাণুবৎ থাকে তাকে দ্রুত দৌড়িও না, বলা বাহুল্য মাত্র। ঘোড়সওয়ারকে বলা যেতে পারে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটো না, ঘাড় ভেঙে পড়বে। কিন্তু যার ঘোড়াই নেই, অতএব ঘোড়সওয়ার হবার সম্ভাবনাই নেই, তার প্রতি এ ধরনের উপদেশ নিরর্থক। কিন্তু ভারত কি পৃথিবীর বাইরে? পৃথিবীর অন্যজাতের পক্ষে যা চলে, জাপান ও ফিলিপিনের পক্ষে যা চলে তা ভারতীয়দের পক্ষে চলবে না কেন? অর্থাৎ জাপানী ও ফিলিপিনোরা যদি স্বাধীনতার ধকল সহ্য করতে পেরে থাকে তবে আমরাই বা পারব না কেন?'

আবার লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের একটি বক্তৃতা লক্ষ্য করে লিখছেন—'ভারত

সচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড ভারি খাপ্‌পা হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি সাম্রাজ্য দিবসের ভোজে বলিয়াছেন—যাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে অনিষ্টকর বলে তাহারা একবার ভাবিয়া দেখিলে ভালো হয় ভারতবর্ষ ইটালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশের অধীন হইলে ভারতীয়দের কী দশা হইত! অর্থাৎ কিনা তাহা হইলে মজাটা টের পাইত। ভারতবর্ষের ভাগ্য কোনরূপ হইলে কেমন হইত ইহা কল্পনা ও অনুমানের বিষয় বটে, কিন্তু মজার কথাটা এই যে, ব্রিটনরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কেবল এই কল্পনাই করে যে, এই দেশ হয় ব্রিটন, নয় অন্য দেশের অধীন হইবে এবং আমরা অন্য কোনো দেশের অধীন হইলে আমাদের কি দুর্দশা হইত সেই দুর্দশা তারা কল্পনায় উপভোগ করে। তারা ভ্রমেও এরূপ কল্পনা ও অনুমান করিতে ভালোবাসে না যে ভারত স্বাধীন হইলে কি হইত। যখন রাশিয়া সম্রাটের অধীন ছিল তখন ভারতবর্ষকে রুশিয়া গ্রাস করিতে চায় এই জন্য রুশাতঙ্ক প্রচার করা হইত।...'

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার শাসন নীতি ও তাহার ফল, যেমন ফিলিপিনের স্বাধীনতা, ব্রিটেনের শাসননীতি ও তার ফলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ একথার উল্লেখ করেন ও রুশ শাসনের সম্ভবপর কি ভালো ফলও হতে পারত সেকথার বিশ্লেষণ করে বলেন—'এত কথা লিখিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে আমরা ইংরেজের অধীনতার পরিবর্তে অন্য কোনো জাতির অধীনতা বাঞ্ছনীয় মনে করিতাম বা করি। উদ্দেশ্য ইহাই দেখান যে ইংরাজেরা যে আমাদিগকে বলেন, ভারতবর্ষ তাহাদের অধীনতায় স্বর্গ সুখ ভোগ করিতেছে এবং অন্য কোনো জাতির অধীনে কোনো দিনই অধিকতর সুবিধা পাইত না তাহা ভুল। কিন্তু অন্য কোনো জাতির শাসন যদি ইংরেজ শাসন অপেক্ষা ভারতের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত, অনুমিত বা প্রমাণিত হয় তাহা হইলেও আমরা স্বাধীনতা চাই। কাহারও অধীনতা চাই না। 'দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে, স্বর্গ সুখ তায়, কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে নরকের প্রায়।—'

জাতীয় জাগরণের প্রেরণারূপে যাঁরা যুক্তিকে আশ্রয় করেছেন, যাঁদের মূল বক্তব্য জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ এক—তাদের দৃষ্টি-

ভঙ্গির যে পক্ষপাতশূন্যতা আশা করা যায় অধিকাংশ তথাকথিত সুসভ্য জাতিদের শাসকবর্গের মধ্যে তার প্রচুর ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে। তারই ফলে ইম্পিরিয়ালিজম, কলোনিয়ালিজম ও পরে ন্যাশনাল সোসালিজম দানবীয় মূর্তি নিয়েছে। বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত বর্তমান যুগের রাজনীতি ক্ষেত্রও এই অসাম্য ভাবনার দ্বারা কলঙ্কিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে, স্বাধীনতার স্পৃহার সঙ্গে সঙ্গে যে মানব ঐক্যের বোধ জন্মেছিল, তার ধারক ও বাহক মানুষরা সব দেশেই কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। রামমোহনের চিত্তের ঔদার্যে ভারতবর্ষে এই ভাবের জন্ম—রামানন্দের জীবনে তার পরিণতি বহু কর্মে সার্থক। যেমন আমেরিকায় নিগ্রো নির্যাতনের খবর, তার বীভৎস অমানুষিকতাকে তিনি বারবার ধিক্কার দিয়েছেন, জগতের সামনে প্রকাশ করেছেন, তেমনি ফিলিপাইনে স্বাধীনতার আরম্ভে আমেরিকাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বস্তুত যাঁরা স্বজাতির জাগরণের জন্য যথার্থ চিন্তা করেন, চেষ্টা করেন, তাঁদের অন্তর্নিহিত কথাটি সর্বদাই এই যে তা মনুষ্যত্বেরই উদ্বোধন। মানুষেরই জাগরণ। যে কাজ সর্ব মানবের মঙ্গলের প্রতিকূল তা কোনো বিশেষ জাতির মঙ্গলজনক বলে সাময়িক-ভাবে প্রতিভাত হলেও যথার্থ মঙ্গলজনক নয়। এই বোধই বিশ্ববোধ এবং এই বোধের ফলস্বরূপ যে জাতীয়তা তা মানবতার পরিপন্থী নয়—অন্য জাতীয়তার বিকটরূপ প্রকাশ পেয়েছে National Socialism-এ যেখানে জাতীয় কথাটাই কদর্য হয়েছে।

বর্তমানে সাম্যবাদের কথা আমরা অনেক শুনি কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সত্য সাম্যভাবনা ক্রমেই আমাদের মন থেকে সরে যাচ্ছে। আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশবাসীকে তো বটেই, নিজের দেশের মানুষকেও তাদের রাজনৈতিক মত অনুসারে একেবারে ভাগ করে ফেলেছি। এমন ভাগ যা প্রায় জাতিভেদের মত, যার মধ্যে মিলনসেতু বাঁধাই চলে না। তাই বর্তমানে যতকিছু আন্তর্জাতিক সভা-সমিতি, এমন উৎসবাদি হয়ে থাকে, তার কোনটাই পুরোপুরি আন্তর্জাতিক অর্থাৎ বিশ্বমুখী, মানবমুখী, নয়, তা দলমুখী, সংঘমুখী। সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে প্রত্যেক কাজ ও

ঘটনাকে তার নিজের মূল্যে বিচার করার যে দৃষ্টিভঙ্গি, তা না হলে যথার্থ আন্তর্জাতিক দৃষ্টি হয় না। সেই সাম্য দৃষ্টি দিয়ে রামানন্দ শুধু আমেরিকা বা রাশিয়ার নয়, বিশ্বের সব পরিস্থিতিকে দেখেছেন। তাই তাঁর স্বাদেশিকতা বিশ্ববিমুখ, আত্মকেন্দ্রিক নয়, চিরন্তন মানব মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ মানব হিতৈষণারই অঙ্গ।

নারীজাতির অকৃত্রিম সুহৃৎ রামানন্দ, বিশেষভাবে ভারতীয় নারীর সহায় ও মঙ্গলকামী হলেও, জগতে যেখানে যে নারী আন্দোলন হয়েছে তাই তাঁর সানন্দ অভিনন্দন পেয়েছে। নারীর ভোটাধিকারের সপক্ষে তিনি বহুভাবে লিখেছেন। তাঁর মূল কথা এই ছিল যে নারীরা ভোটাধিকার পেলে তাঁরা তাঁদের মত যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবেন। বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ হবে। যে সন্তানকে লালন করেছে সেই মাকে কামানে ছিন্নভিন্ন করবার কাজে কখনই সহায়তা করবে না। তাঁর এই আশা বিশ্বের নারীজাতি ঠিকমত সফল করেছেন বলে মনে হয় না। স্বাধীন শিক্ষিত মেয়েরাও যুদ্ধকামী হয়েছে। নাজি জার্মানিতে মানুষের চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ মেয়েরা ব্যবহার করেছেন।

রামানন্দ ভারতের নারীর প্রতি সদয়, স্নেহপূর্ণ, দুর্বল বাৎসল্যই দেখানান—দেশের অর্দ্ধেক শক্তির জাগরণে জাতির পূর্ণতা, সেই বিশ্বাসই তাঁকে মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাবলম্বনের কাজে সচেষ্ট করেছে। কন্যার পণ নিলে যে শুধু কন্যারই ক্ষতি তা নয়, যে পুরুষ পণ নেয় তার কাপুরুষতাও জাতিগত দুর্দশারই একটা ধাপ। রামানন্দ জীবনীতে শান্তা দেবী লিখেছেন: 'নারীরা বহুকাল তাদের স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত বলিয়া তাহাদের ছোট বড় কৃতিত্ব, সাফল্য ও দাবি দাওয়া, সকল বিষয়ের প্রচারের জন্যই তিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া যত চেষ্টা করিয়াছেন, পুরুষের জন্য তত করেন নাই···তিনি মনে করিতেন, যে দেশে নারী কেরোসিনে কাপড় ভিজাইয়া পুড়িয়া মরে, যে দেশে বধূকে তপ্ত লোহার ছেঁকা দেওয়া হয়, যে দেশে রাজা-রাজড়ারা বহু রাণী ও দাসী দ্বারা পরিবৃত, সে দেশ অধঃপতিত থাকিবে ইহা বিচিত্র নয়!'—'প্রবাসীর' প্রত্যেক সংখ্যায় মেয়েদের কথা কিছু না কিছু থাকত। তাদের পরীক্ষায়

কৃতিত্ব, শিল্পে, সাহিত্যে, নৃত্যে, গীতে যে কোনো কৃতিত্ব, স্ত্রী-কয়েদী, নারী মজুরদের সমস্যা, আত্মহত্যা ও নারী নিগ্রহের কোনো খবর তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। কে একজন লিখেছেন, রামানন্দের motto ছিল, মেয়েরা কোনো অন্যায় করতে পারে না। women can do no wrong. কথাটা মিথ্যা নয়। পণপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল অশ্রান্ত, পরিহাস-তীক্ষ্ণ, 'বিবাহটা কেনাবেচার ব্যাপার নয়, জীবনের মহত্তম অনুষ্ঠান, এই ধারণা না জন্মিলে শুধু আইনের দ্বারা বরপণ কুপ্রথার উচ্ছেদ হইবে না। যাহারা কন্যার বিবাহে কন্যা-শুল্ক লয়, বাঁকুড়ায় তাহাদিগকে পাঁঠি বেচা বলে—টাকা দিয়া বর ক্রয়কে সেইরূপ পাঁঠা কেনা, এবং যাহারা বরপণ গ্রহণ করে তাহাদিগকে পাঁঠা-বেচা বলা যাইতে পারে।' কিংবা 'শুনিয়াছি বঙ্গ সাহিত্য প্রেমের কবিতার জন্য বিখ্যাত, তবে বাঙালি অনেক যুবক বিবাহ বিষয়ে এমন অপ্রেমিক, অর্থপিশাচ, কাপুরুষ কেন? যিনি কেবল প্রেমের পাত্রীকেই চান, টাকা, মান, সম্পদাদি আর কিছুর দিকে দৃক্‌পাত করেন না, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রেমিক। নতুবা কেহ যদি প্রেমের কবিতা লিখিয়া বঙ্গের সমুদয় সম্পাদককে হয়রাণ করিয়া ফেলেন এবং বিবাহের সময় দরিদ্র শ্বশুরের নিকট হইতেও বাপ মাকে টাকা লইতে দেন, তাহা হইলে তাহাকে পুরুষাধম, অপ্রেমিক, কাপুরুষ বলা ভিন্ন উপায় কি?'

মেয়েদের নিগ্রহের সংবাদে রামানন্দ ধৈর্যহারা হতেন—'এরূপ ঘটনার কথা পড়িলে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে এবং বুদ্ধদেব প্রভৃতি জগতের সাধুশিরোমণিদের অহিংসার উপদেশ ভুলিয়া যাইতে হয়।' আর এক জায়গায় লিখছেন—'যুদ্ধের সময়েই হউক কিংবা শান্তির সময়ই হউক, নারীর উপর এই রকম অত্যাচার যখন আর হইবে না, তখন বুঝা যাইবে যে মানুষ পশুত্বের অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবত্ব লাভ করিয়াছে। নারীর নিঃশঙ্ক অবস্থায় কালযাপন সভ্যতার একটি মাপ-কাঠি।'...

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাকে অবলম্বন করে লেখা তাঁর সম্পাদকীয় উদ্ধৃত করছি—

'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেন ডাকাত দলের মেলে।
সুদূর কালের দারুণ ছড়াটিকে
স্পষ্ট করে দেখিনে আজ, ছবিটা তার ফিকে।
মনের মধ্যে বেঁধে না তার ছুরি
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি।
বিয়ের পথে ডাকাত এসে হরণ করল মেয়ে
এই বারতা ধুলোয় পড়া শুকনো পাতার চেয়ে
উত্তাপহীন। ঝেঁটিয়ে ফেলা আবর্জনার মতো—
দুঃসহদিন দুঃখেতে বিক্ষত
এই কটা তার শব্দ মাত্র দৈবে রইল বাকি
আগুন নেভা ছাই-এর মত ফাঁকি।
সেই মরা দিন কোন্ খবরের টানে
পড়ল এসে সজীব বর্ত্তমানে।'

রামানন্দ বলছেন: 'যে রকম খবরের টানে সেই মরা দিন সজীব বর্ত্তমানে এসে পড়ে, কবি তার একটা নমুনা এই কবিতাতেই দিয়েছেন—

ঐ যে অন্ধ কলু বুড়ির কান্না শুনি
ক'দিন হল জানিনে কোন গোঁয়ার খুনি
সমস্থ তার নাৎনীটিকে
কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন দিকে
আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে
যৌবন তার দলে গেছে জীবন গেছে চুকে।
বুক ফাটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।
শাস্ত্র মানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে
উপায় নাইরে, নাই প্রতিকার, বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ায় ছন্দে মিলে
ঢাকিয়া ঢাক বাজায় খালে বিলে।

সুন্দরীকে বিয়ে দিলাম ডাকাত দলের মেলে।
বঙ্গে 'বুক ফাটানো এমন খবর' শত শত শোনা কিন্তু সত্য সত্য বুকে বাজে টনটনানি কয় জনের?

যে কবি প্রাচীন খবরের সঙ্গে নূতন খবরের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, পুরুষের পুরুষকার ও নারীর নারীত্ব যাহাতে জাগে এমন বাণীও তিনি অনেক শুনাইয়াছেন, কিন্তু এখনও 'সজীব বর্ত্তমানে' সচেতন হইয়াছেন অল্প লোকই।" (বিবিধ প্রসঙ্গ)

ঐ বৎসরই ভাদ্রমাসে রামানন্দবাবু জনৈক নারীর অপমৃত্যু প্রসঙ্গে আবার লিখছেন: 'নারীর ইজ্জৎ ও প্রাণের মূল্য বাংলা দেশে, বোধ হয় সমগ্র ভারতবর্ষেই, খুব কম; যদিও পুস্তকে ও বক্তৃতায় তাহা অত্যধিক। সেই জন্য, যদিও নারী নিগ্রহের শুধু মকদ্দমাই বৎসরে অনেক শত হয় এবং অনেক হাজারের খবর পর্যন্ত প্রকাশ পায় না, তথাপি এ বিষয়ে এখনও বাঙালি হিন্দু সমাজের টনক নড়িয়াছে বলিতে পারা যায় না—এ বিষয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজের মনের ভাবতো বোধের অতীত না হইলেও বাক্যের অতীত। একটি বিষয়ে বাংলা দেশ সকলের উপরে টেক্কা দিয়াছে তাহা নরপিশাচদের দ্বারা দলবদ্ধভাবে একটি নারীর উপর অত্যাচার। এ বিষয়ে হিন্দু নরপিশাচদের কৃতিত্ব একেবারে নাই এমন নয়, কিন্তু যেমন ফুটবলে মুসলমান স্পোর্টিং এর বাহাদুরি খুব বেশি, সেইরূপ এই নারকীয় কার্যেও মুসলমান সমাজের পিশাচ প্রকৃতির লোকদের কৃতিত্ব অতুলনীয়।

'এখানে বলা আবশ্যক, এই মুসলমান সমাজেরই হাইকোর্ট জজ, পরলোকগত সৈয়দ আমীর আলি গত শতাব্দীতে এক সময়ে রাজসাহীতে নারীর উপর দলবদ্ধ অত্যাচারের একটা মামলা হওয়ায় এই দুর্বৃত্ততা নির্মূল করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করেন যে এইরূপ পৈশাচিকতার জন্য অপরাধীদিগকে ফাঁসি দিবার আইন হওয়া উচিত। তিনি এরূপ প্রস্তাবের নজীরও দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, একসময় অস্ট্রেলিয়ায় ল্যারকিন নামে অভিহিত গুণ্ডারা দলবদ্ধভাবে নারীনিগ্রহ করিত এবং অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের আইন হওয়ায় তাহা নির্মূল হয়।··· হাইকোর্টের

অন্যান্য জজেরা সৈয়দ মহাশয়ের প্রস্তাবে সায় না দেওয়ায় তদনুসারে কোনো কাজ হয় নাই। ...কয়েক দিন পূর্বে কলিকাতাতেই এক পুলিশ কোর্টে কয়েকজন আসামী এইরূপ মকদ্দমায় খালাস পাইয়াছে।' (বিবিধ প্রসঙ্গ)

এখানে রামানন্দবাবু আর একটি প্রশ্ন তুলেছেন—'একদিকে অত্যাচারিত নারীরা ও নারীরক্ষা সমিতি দরিদ্র, অন্যদিকে বড় বড় কৌঁসুলী লাগাইবার টাকা দুর্বৃত্তদের আছে বা তাহারা যোগাড় করিতে পারে। এবং ব্যবহারজীবীরাও বোধ করি তাঁহাদের প্রোফেশ্যনের কোনো অলিখিত নিয়ম অনুসারে, স্পষ্ট বদমায়েসদের পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাদিগকে বাধ্য মনে করে ? এ অবস্থায় আশার আলোকের সন্ধান কোনদিকে।'

আশার আলোর সন্ধান একেবারে যে নেই তা নয়—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রশ্নের ভিতরেই তার ইঙ্গিত দিয়েছেন—যে সমাজে প্রোফেশ্যনের অলিখিত নিয়ম অনুসারে, অর্থাৎ অর্থলোভে দুর্বৃত্তের সহযোগী হতে প্রতিষ্ঠিত ও মান্য ব্যক্তিরাও দ্বিধা করেন না—হাতের কলঙ্ক যে সমাজ-ব্যবস্থায় কাঞ্চন দিয়ে ধুয়ে ফেলা যায়, সেখানে এ ধরনের সামাজিক অপরাধের জন্য কতকগুলি অশিক্ষিত, অসধৃত চরিত্র লোককেই সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথায় এসে পৌঁছনো গেল, যে কথার আলোচনা আমি যেমন বুঝেছি তেমনি করতে চেষ্টা করব, তবে এ বিষয়ে আমার আলোচনায় ত্রুটি থাকা সম্ভব। অনেকে মনে করেন স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি হিন্দু-মহাসভার সঙ্গে যোগাযোগের ফলে সাম্প্রদায়িক ভাবকে প্রশয় দিয়েছিলেন। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখেন নাই। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এইখানে একদেশদর্শী ছিল। ঐ সময়কার সম্পাদকীয়, অর্থাৎ বিবিধ প্রসঙ্গ ভালো করে পড়ে আমার মনে হয় এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুল। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী ছিলেন না, তিনি সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছিলেন। যে সময়ে divide & rule policy-র

চক্রান্ত চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে, রামানন্দ জাতিগতভাবেই হোক বা সম্প্রদায়গতভাবেই হোক, সর্বদা Communal representation এর বিরুদ্ধে লিখে এসেছেন। তিনি জিন্না সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন। মুসলিম লীগের পাকিস্তান কল্পনার বিরোধিতা করেছেন কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করেননি। শিয়া, মোমেন, জামায়েৎ উলেমা প্রভৃতি লীগবিরোধী সমস্ত মুসলমানের বক্তব্য ও দেশপ্রীতির প্রচার করেছেন—তাঁর পত্রিকায় মুসলমান জাতির নানা দিক সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে—আরবী, ফার্সি সাহিত্য ও ভাষা আলোচনা হয়েছে। আধুনিক মুসলমান মেয়েদের কোনো কৃতিত্বের সংবাদ পেলেই তাকে সপ্রশংস অভিনন্দন জানিয়েছেন। সাহসপূর্বক ছবি সহকারে সে খবর ছাপাতেও দ্বিধা করেননি। কিন্তু ইংরেজের ইন্ধনে যে ক্রমবর্ধমান জাতিবৈরী মুসলিম লীগকে তার হাতিয়ার করেছিল, স্বাধীনতার পরিপন্থী সেই পশ্চাৎমুখী আন্দোলনের তিনি বিরোধী হয়েছিলেন। তাঁর মনে এ ধারণাও ছিল যে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ ও নানাপ্রকার কুপ্রথা, তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ঘটিয়ে তাকে আঘাত উপযোগী করে রেখেছে। যে দুর্বল তাকে সবাই মারে। দেবাঃ দুর্বল ঘাতকা। সেই দুর্বলতা দূর করবার জন্যই হিন্দুদের সংঘবদ্ধ চেষ্টার প্রয়োজন। সে কাজ হিন্দু মহাসভা করবে এই তাঁর ধারণা হয়েছিল। হিন্দু revival এর কোনো পশ্চাদ্‌মুখী আন্দোলনের তিনি সহায়ক হননি।

হিন্দু মহাসভার সংগঠনের প্রথম প্রস্তাবেই তিনি লিখছেন 'প্রাচীনপন্থী উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অস্পৃশ্যতা সমর্থক শাস্ত্রীয় এবং তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করিতে পারেন কারণ অস্পৃশ্য হইবার অসুবিধা, অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁহারা ভোগ করেন নাই। যুক্তি যাহাই হোক অস্পৃশ্যতার লেশমাত্র থাকিতে হিন্দু সংগঠন অসম্ভব।...'

আবার লিখছেন—'সব হিন্দুকে সামাজিক সমমর্যাদা দিবার প্রয়োজন থাকিবে, ন্যায়ের অনুরোধে থাকিবে, মানবিকতার অনুরোধে থাকিবে, হিন্দু সমাজের ভাঙ্গন ও সভ্য সংখ্যা হ্রাস নিবারণের জন্য

থাকিবে।...ঐ ভাঙ্গন নিবারণ করিতে হইলে বিবাহ যোগ্য বিধবা ও অন্য বিধবাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। তাহা বিবাহ যোগ্যাদের বিবাহ এবং অন্য বিধবাদের দায়াধিকারের সুবন্দবস্ত না করিলে হইবে না।'

অসবর্ণ বিবাহের অপরাধে কুষ্টিয়ার কোনো বিদ্যালয়েরর শিক্ষয়িত্রী কর্মচ্যুত হলে রামানন্দ তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে হিন্দু মহাসভাকে এর প্রতিকার করবার কর্তব্য স্মরণ করিয়েছিলেন। এ সব থেকে বোঝা যায়, রামানন্দ একটি সংঘবদ্ধ, যুক্তিনিষ্ঠ সমাজ সংগঠনের আশায় হিন্দু মহাসভাকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সে আশা অবশ্য সফল হয়নি, কিন্তু সে দায় তাঁর নয়।

১৩৩৫এ হিন্দু-মহাসভার নিয়মাবলীতে হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য নাকি ছিল:

১. হিন্দু সমাজের সব অবয়বের মধ্যে একতা বাড়ান এবং তাহাদের একই শরীরের অঙ্গ মানিয়া পর পর সংগঠিত করা।

২. ভারতে হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বী সমাজের মধ্যে সদ্ভাব উৎপন্ন করা এবং স্বশাসক এক সম্মিলিত ভারত রাষ্ট্র (লক্ষ্য করা যেতে পারে হিন্দু রাষ্ট্র নয়) প্রস্তুত করিবার জন্য তাহাদের সহিত মিত্রভাবে চলা।

৩. তথাকথিত নীচ জাতিদের অবস্থার সংশোধন ও উন্নতি করা। হিন্দু জাতির নারী সমাজের অবস্থার উন্নতি করা। গোবংশের উন্নতি করা, ইত্যাদি ইত্যাদি...এর মধ্যে এমন কিছুই নাই যা ভারতীয় অন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিকূল—তবে এই আদর্শর সাধনা হিন্দু মহাসভা কতটা করেছেন তা সন্দেহ। অন্তত গোবংশের উন্নতি কিছু করেছেন বলে মনে হয় না, তাহলে বর্তমানে সন্দেশ পরিস্থিতি এমন মারাত্মক হতো না।

শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের অযৌক্তিক ভুল বোঝাবুঝি দূর করবার ও মিলনের চেষ্টার তাঁর ত্রুটি ছিল না। বহু জাতীয়তাবাদী মুসলমানের বক্তব্য তিনি প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু এখানে একটি বিষয়ে আমার মনে ক্ষোভ হয় যে ভারতের জাতীয় জীবনের নব জাগরণের সূচনায় যত সমাজকর্মী কাজ করেছেন,

আজ পর্যন্ত কখনো হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে ভারতীয় নারীর মুক্তির চেষ্টা করেননি। এইখানে একটি প্রচণ্ড ও দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রয়ে গেছে। যাঁরা হিন্দু মুসলমানকে এক ভারতীয় জাতি বলে জেনেছেন, বিশ্বাস করেছেন, তাঁরাও যে কেন যখন হিন্দু সমাজের নারী জীবনের উন্নতির জন্য নানাবিধ সংস্কার চেষ্টায় প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করেছেন, ঐ বোরখা ঢাকা, অবহেলিত, অপমানিত নারী সমাজের কথা একেবারেই স্মরণ করেননি। যুক্তিবাদী কোনও শিক্ষিত মুসলমানও এ ধরনের সংস্কারের তেমন চেষ্টা করেননি। এ সম্বন্ধে রফি আহমেদ কিদোয়াইয়ের একটি মাত্র লেখা আমার চোখে পড়েছে। ভারতের নারী জাগরণ তাই অসম্পূর্ণ এবং এই অসম্পূর্ণতা যে সমগ্র জাতির একাত্ম হওয়ার পক্ষে এক প্রচণ্ড বাধা—তখনও ছিল, এখনও আছে তাতে সন্দেহ নেই। স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু ভগ্নীদের পাশে যে মুসলমান ভগ্নীরা তেমনভাবে দাঁড়াতে পারেন-নি, এ শুধু সংখ্যার ক্ষতি নয়। এ ক্ষতি তার চেয়ে মূলগত। আজও দেশগঠনের প্রশ্নে অবস্থা একই আছে।

আমার বক্তব্য শেষ করবার সময় এল কিন্তু এই দীর্ঘ কর্মময় জীবন প্রবাহের বহু ঘাটে পৌঁছন গেল না। গল্পের মত আকর্ষণীয়, উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মত রসপূর্ণ, অকাট্য যুক্তিতে বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর 'বিবিধ প্রসঙ্গের' বহু স্মরণযোগ্য প্রসঙ্গ বলা হলো না। শুধু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় যাঁর সমস্ত জীবন বহুধা শক্তিতে বিচিত্রভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিল, সেই স্বাধীনতা ও অহিংসার আদর্শ তাঁর কাছে কি রকম শুদ্ধ ও নিখুঁত ছিল তা তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে। এই কথাটি আজ ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার সাবধান বাণীর মত মনে হচ্ছে—'আমরা মনে করি যুদ্ধ না করিয়াও স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে। অকল্যাণের পথে না গেলে কল্যাণ হইবে না, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। ইহা ভীরুর পরামর্শ নয়—অন্যের প্রাণ আমি লইব না কিন্তু নিজের প্রাণ দিতে হইবে। মানুষ খুন না করিলেই যে অহিংসা হয় তাহা নহে। ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ, তাহাদের সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার ছলে বলে কৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বীর অনিষ্ট ও পরাজয় সাধন এ সমস্তই হিংসা।

যাহারা এই রকম আচরণ করে, তাহারা হিংসাপন্থী, তাহারা ভারতের স্বরাজ চায় না। ভারতীয় যে কোনো একটা দলের প্রভুত্ব স্বরাজ নয়।'

এ প্রবন্ধ শেষ করবার আগে, ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে তাঁর যে পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, সে কথা না বলে আমার স্মৃতিতর্পণ সম্পূর্ণ হবে না—সে তাঁর অসমান্য রবীন্দ্রানুরাগ। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে, এই পরিণতবুদ্ধি বিচক্ষণ পুরুষের রবীন্দ্রপ্রীতির মধ্যে মাতৃস্নেহের ভাব ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে কারু কোনো সামান্য ইঙ্গিতও সহ্য করতে পারতেন না। পক্ষীমাতা যেমন এতটুকু বিপদের সম্ভাবনা দেখলে পক্ষ বিস্তার করে ছুটে আসে, রামানন্দ তেমনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনী উদ্যত করে রবীন্দ্রনাথের প্রতি উদ্দিষ্ট সমস্ত উপদ্রবের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ যতই শক্তিমান পুরুষ হোন তিনি কবি, স্পর্শকাতর তাঁর মন। যে কঠিন বিরূপতা ও নির্বুদ্ধিতার সংঘর্ষে বারবার তাঁকে আসতে হয়েছে তাতে তাঁর এ আশ্রয় একান্ত প্রয়োজন ছিল। তিনি কদাচিৎ আত্মপক্ষ সমর্থনে বিতর্কে নামতেন। রামানন্দবাবুর সহায়তা না হলে তাঁর পেলব মন ঈর্ষাপরায়ণ রুক্ষ সমালোচনার ভোঁতা কুঠারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত।

ব্যক্তিগতভাবে আমার সামান্য জীবনে তাঁর স্নেহস্পর্শ ভোলবার নয়। এই দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ। তিনি রবীন্দ্রনাথের গল্প বলতে ভালোবাসতেন। তাঁর ছোটবেলার গল্প, নোবেল পুরস্কারের গল্প, শান্তিনিকেতনের গল্প, একটি বালিকার কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে একজন বিচক্ষণ সম্পাদক কালক্ষেপ করছেন, একথা আজকের দিনে কে ভাবতে পারে? তখনও রবীন্দ্রনাথকে নিকট থেকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, রামানন্দবাবুর স্নেহপূর্ণ চিত্তাভিষেকে নিষিক্ত এক জ্যোতির্ময় মূর্তি আমার মনের সামনে প্রকাশিত হচ্ছিল। তাঁর গল্প বলার মধ্য দিয়ে এক অজ্ঞাত জগতের বিস্তৃত দূর দিগন্তে সূর্যোদয়ের আশা আমার অস্ফুট, অপুষ্ট বালিকা মনকে বাক্য ও বুদ্ধির অতীত সৌন্দর্যের অভিমুখী করেছিল।

স্বার্থশূন্য নিষ্কাম আত্মার সম্পর্ক যে সম্ভব তা তাঁকে দেখে বুঝেছিলাম। প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে মানুষ্যত্বের এই শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যে কতখানি সৌভাগ্য, তা আজকের দিনে যেমন বুঝতে পারছি, এমন তখন বুঝিনি। আমার জীবনে তাঁর এই অসামান্য দান—এজন্য তাঁর কাছে আমি চির ঋণী।